ঈশ্বর দেবতা ও সৃষ্টি

বিপুল সাহা

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।। কলকাতা - ৭০০ ০৪৩

Ishwar Devta O Srishti
by
Bipul Saha Rs.100.00

Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
26B, Panditia Place
Calcutta - 700 029

সর্বস্বত্ব শ্রীমতী ভারতী সাহা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০১
পৌষ ১৪০৭

মার্জিত প্রকাশ

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং, ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লে-স
কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

গ্রন্থনায়
পলাশ দাস

১০০ টাকা

বাবা
স্বর্গত সুবল চন্দ্র সাহা

স্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম প্রকাশনায়

লেখকের নিবেদন

জগৎ ও সৃষ্টি নিয়ে মানুষের কৌতূহল চিরকালীন। বারবার এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ও তার উত্তর খোঁজা হয়েছে। যুগে যুগে নতুন জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়ে। আজো হচ্ছে। নানা জ্ঞানী ও গুণীজন করেছেন। তবু কি প্রশ্নের মীমাংসা হল?

সহস্রাব্দ শেষ হল বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে, মহাকাশ নিয়ে, অণুপরমাণু নিয়ে, জৈব রসায়ন ও প্রযুক্তি নিয়ে। সেসব কথা জানা ও জানানোর সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে বিশ্বাস, যুক্তি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভিপ্রায় ছিল। সাধারণের জন্য সহজপাঠ্য করার চেষ্টা ছিল বিশেষভাবে। সহৃদয় সেই পাঠকপাঠিকাদের দ্বারা বইটি গৃহীত হলেই পরিশ্রম সার্থক।

পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপিকা ঝরা বসু, অধ্যাপক সুনীল দাশ, অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত ও শ্রী নব দত্ত। নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি ডঃ দীপিকা হালদার, শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শ্রী দীপঙ্কর দাস, চিরদীপ হালদার, জয়ন্ত সাহা, পলাশ দাস ও প্রকাশক শ্রী সমীর নাথ মহাশয়ের কাছ থেকে। তথ্য ও ছবির জন্য অগ্রজগনের দ্বারস্থ হতেই হবে। পুস্তকপঞ্জিকায় তার উল্লেখ রইল — ঋণ স্বীকারের জন্য।

বইটি প্রকাশ করতে সংশোধন ও পরিমার্জনে সময়াভাব ঘটেছিল। যন্ত্রগণকটি আকস্মিক বজ্রপাতে বিকল হয়েছিল বলে। সৌভাগ্য লেখাটি স্মৃতিভাণ্ডার থেকে মুছে যায় নি। উদ্ধার করেছে সেসব গৌতম সরকার ও দীপক আচার্য। মনে হয় এতে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা ছিল না।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড — বিপুল সাহা
কলকাতা -৭০০ ০১০
২১শে পৌষ, ১৪০৭।

মার্জিত প্রকাশনায় লেখকের নিবেদন

রচনাটি যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়নি বলে আরেকবার গ্রন্থনায় হাত দিতে হল। ফলে কিছু মার্জনা এসেই পড়ল স্বাভাবিক রীতিতে। সাজসজ্জাও কিছু আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হল। গ্রন্থটি অতি অতি অল্পসংখ্যক পাঠকের দ্বারস্থ হতে পেরেছে। আরো অল্পসংখ্যক পাঠকের সমাদর লাভ করেছে। তবু লেখকের ক্লান্তি নেই এর উৎকর্ষ সাধনে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড — বিপুল সাহা
কলকাতা -৭০০ ০১০
অকটোবর, ২০১০।

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ৭

২. প্রথম পর্ব ঃ প্রাচীন সভ্যতায়

২.১ সুমের অক্কাদ ব্যবিলনে ১৩

২.২ প্রাচীন মিশরে ২১

২.৩ প্রাচীন গ্রীসে ২৭

২.৪ কান্নান ও অন্যান্য এলাকায় ৩৫

৩. দ্বিতীয় পর্ব ঃ প্রচলিত ধর্ম ভাবনায়

৩.১ ইরান চীন ও জাপানে ৪১

৩.২ ইহুদী খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মে ৫০

৩.৩ ঋকবেদের যুগে ৬২

৩.৪ উপনিষদের যুগে ৭৬

৩.৫ পুরাণকথায় ৮২

৪. তৃতীয় পর্ব ঃ বিজ্ঞান ভাবনায়

৪.১ বিজ্ঞান সম্পর্কে দুচার কথা ৯০

৪.২ জগত ও বিশ্ব ৯৫

৪.৩ জগতের উপাদান ১০৮

৪.৪ বিশ্বসৃষ্টি ১১৫

৪.৫ তারামণ্ডল ও ন'খ'ত্র সৃষ্টি ... ১২৯

৪.৬ প্রাণের সৃষ্টি ১৩৯

৪.৭ মানুষের আবির্ভাব ১৫৩

৫. উপসংহার ১৬৫

৬. পুস্তকপঞ্জী ১৯৬

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

পার্ল হার্বার
কার্গিল কাশ্মীর
বৈষ্ণোদেবী অমরনাথ দর্শন
কুমায়ুন ভ্রমণ
ধর্মভাবনা বিজ্ঞানভাবনা
সাগরে মন্দিরে নীলাচল
প্রলয় দানব সুনামি
হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ
অরূপ খাজুরাহো
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

ঈশ্বর দেবতা ও সৃষ্টি

১ । ভূমিকা

ঈশ্বর কে? দেবতা কে? সৃষ্টির রহস্য কি?

এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করেছেন, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-ন'খত্র যিনি সৃষ্টি করেছেন, আকাশ-জল-বাতাস থেকে সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, নদনদীনালা, দেশ-মহাদেশ, এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমরা সাধারণ মানুষেরা তাঁকেই ঈশ্বর বলে জানি। তিনিই স্রষ্টা। বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু জাত হয়েছে, যা কিছু বর্তমান, গ্রহ-ন'খত্র থেকে অণুপরমাণু পর্যন্ত সে সবই তাঁর রচনা। তিনিই স্রষ্টা। এই অরণ্য পাদপ বিটপী লতাগুল্ম তাঁর সৃষ্টি। পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, জলচর-স্থলচর-খেচর জীব, সে সবই তাঁর সৃজন। শ্রেষ্ঠ জীব এই মনুষ্যকুল, এও তো তাঁর রচনা। সকল জীব ও জড় তাঁরই জয় ঘোষণা করে। এ সবের তিনিই স্রষ্টা।

ঈশ্বর কি আদিতে একবারে সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন? একবার সৃষ্টির পর আর কি তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করেননি? এখনো কি তাঁর সৃষ্টিকার্য অব্যাহত নয়? সেই আদি সৃজনকালে তিনি সবকিছু রচনা করে প্রকৃতিজগতকে কি এক অমোঘ নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পেরেছিলেন? সৃষ্টির পরে যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঈশ্বর সেসব অবগত আছেন নাকি তারপর তিনি উদাসীন হয়ে গেলেন?

মহান ঈশ্বর সুন্দর। তাঁর সৃষ্টিও অবশ্যই সুন্দর। তিনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর সৃষ্টি ঈপ্সিত ল'খ্যে পৌঁছে যাবে? তাঁর ঈপ্সিত ল'খ্যটাই বা কি? আমরা ঈশ্বরকে স্রষ্টামাত্র নয় বলে জানি। তিনি একই সঙ্গে পালয়িতা এবং নিয়ন্তা। এই সৃষ্টি যেমন তাঁর হাতে, এর স্থিতিও তাঁর হাতে।

বিংশ শতক শেষ হল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ হল। আমরা নতুন শতকে নতুন সহস্রাব্দে চলে যাচ্ছি। লোকে বলে আমরা ঘোর কলিযুগের মধ্য দিয়ে চলেছি। দেশে দেশান্তরে মানুষের সমাজ ও প্রকৃতিজগতে যে দুর্দশা দেখা যাচ্ছে, তাতে ঘোর কলিযুগের রমরমাই চলছে। প্রবল প্রতাপে। চারিদিকে হানাহানি, মৃত্যু, শোষণ, নিপীড়ণ, বলাৎকার, চুরি ও ছিনতাই। মানুষই যেন মানুষের ভয়ঙ্কর এক শত্রু হয়ে উঠছে। সুযোগ পেলেই একজন আরেকজনকে নির্মমভাবে ঠকাতে ব্যগ্র। মানুষের

প্রয়োজনের শেষ নেই, তার চাহিদার শেষ নেই, তার লোভের শেষ নেই। প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে তছনছ করে ফেলছে পরিবেশ। কিছু মানুষ এ সব নিয়ে ভাবছে বটে কিন্তু অধিকাংশই ভাবছে না।

কি আশ্চর্য যে মানুষ মানুষকে পিটিয়ে মারছে! মারতে পারছে। কখনো অকারণে বা সম্পূর্ণ ভুল ধারণার বশে। এক এক সময় মনে হয় যেন আইন নেই সমাজ নেই শৃঙ্খলা নেই। নীতিহীনতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সকলে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিয়ে। দুর্নীতিবাজদেরই জয়জয়কার, সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণ, ড্রাগ মাফিয়াদের প্রবল দাপট। বধূহত্যা ভ্রূণহত্যা অস্পৃশ্যতা বর্ণভেদ চলছে। জাতিদাঙ্গা চলছে। ধর্মীয় নিপীড়ন চলছে। মৌলবাদ তো অন্ধ আবেগে হিংস্র ও দিশেহারা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, উগ্রপন্থা, বোমাবিস্ফোরণ বিমান-ছিনতাই আরো ছড়িয়ে পড়ছে। এর উপর আছে একমেবু বিশ্বের চোখরাঙানি কিংবা কয়েকটি দেশের দলবদ্ধ ধমকানি। আছে পারমাণবিক বোমা, পরিবেশ দূষণ, উন্নত দেশের আগ্রাসন এবং বুভু'খু' দেশের মিথ্যা গরিমা। একদিন উন্নত সমাজতান্ত্রিক ধারণা জগতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশ্বের এক অংশ তা গ্রহণ করেছিল। উত্তরকালে সেই সমাজতান্ত্রিক জগতের এমন পতন হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় নানা প্রশ্নচিহ্(জুড়ে গিয়েছে। সামনে নেই আর কোন নতুন মতাদর্শ।

দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীতে। এই বিংশ শতাব্দীতে। শতাব্দীর অহমিকা আহত করে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন সে সব। কত মানুষ মানুষকে মেরেছে? প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছিল ১ কোটি মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৫ কোটি ৫০ লাখ। ১ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয় বন্দীনিবাসে নানা হিংস্র উপায়ে যার মধ্যে অনেক নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিল। আহত হয়েছে কম করে ৮ কোটি মানুষ। অন্যান্য 'খয়'খতির কথা না হয় উহ্য রইল। শুধু দুটি আণবিক বোমা থেকে দুটি শহরের আড়াই লাখ মানুষকে নিমেষের মধ্যে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল কিছু মানুষের দ্বারাই। অসংখ্য বিকলাঙ্গ রোগগ্রস্ত মানুষের কথা তো বাদই দিলাম। তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? আরো কত যুদ্ধ হয়েছে এই শতাব্দীতে। এখনো হচ্ছে। কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে, লাওস-কম্বোডিয়ায়, বাংলাদেশে, ইরানে, ইরাকে, যুগশ্লাভিয়ায়, বসনিয়ায়, চেচনিয়ায়। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-কাশ্মীর-পাকিস্তানের মধ্যে। আফগানিস্তানে, শ্রীলঙ্কায় ও সিয়েরালিওনে।

মানুষের মানবিকতাবোধ ও ধর্মবোধ আজ বিপন্ন। সমাজ বন্ধন বড়ো শিথিল হয়ে পড়েছে। স্বার্থসিদ্ধিটাই প্রধান। ব্যক্তি স্বার্থ সর্বোচ্চ ল'খ্য। তারপর পারিবারিক স্বার্থ,

গোষ্ঠী স্বার্থ, শ্রেণিস্বার্থ, গর্বিত জাতিস্বার্থ, ধনীদেশের স্বার্থ। মানবিকতা নেই একেবারে তা নয়, তবে অনেক হিসেব কষে তার প্রয়োগ হচ্ছে। আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি, ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়।

এত সব ঘটনা আর দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর আছেন? তিনি কি নিস্পৃহ হয়েই আছেন? ন্যায়-অন্যায় ভালোমন্দ পাপপুণ্য এসবের যাচাই করবেন না তিনি? শাসন করবেন না? তিনি কি পর্যায়ে শেষে জাগ্রত হবেন এবং শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন? লোকে বলে পাপের ঘড়া পূর্ণ না হলে নাকি তিনি ক্রিয়াশীল হন না। সেটা হবে কোন প্রলয়কালে? পাপ কি পূর্ণ হয়নি? আরো পাপ হবে? আরো পাপ !

কথা হচ্ছে হঠাৎ ঈশ্বরকে নিয়ে এত টানাটানি পড়ল কেন? আচ্ছা, আমরা কখন ঈশ্বরের খোঁজ করি? যখন বিপন্ন হই। কথায় বলে, ঠেকায় পড়লে বাপকে ডাক। চরম দুঃসময়ে, সীমাহীন কষ্টের মধ্যে, আকণ্ঠ হতাশাগ্রস্ত হলে কিংবা ভয়ে আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। বলি – হে ভগবান, দয়া করো, পাপীকে উদ্ধার করো। বলি – হে ঈশ্বর, জগতের মঙ্গল করো। তা সেই অবস্থা আসতে আর কি বাকি আছে? প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নীতিবোধ ও মূল্যবোধ চুরমার হয়ে গিয়েছে। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে, অণু-পরিবারও বুঝি আর থাকে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রয়োগে। মানুষ বিপন্ন, সমাজ বিপন্ন, পরিবেশ বিপন্ন।

তাই সেই স্রষ্টাকে খুঁজে দেখা। ঈশ্বরকে খোঁজা। এই আশায় যে যদি তিনি সত্যিই থেকে থাকেন, তবে একটা বিহিত করতে পারবেন। হে ঈশ্বর, আপনি কি আছেন? কোথায় আছেন? আপনার আবাস কী স্বর্গে নাকি বৈকুণ্ঠে? তো সে জায়গাটি কোথায়? চন্দ্রলোকে নাকি অন্য ন'খত্রলোকে? আপনার সৃষ্টির মধ্যে নাকি তার বাইরে? কেউ বলেন আসলে আপনার আবাস মানুষের অন্তরে। জীবের হৃদয়স্থলে যদি আপনার অধিষ্ঠান হয় তাহলে মানুষ এত হিংস্র হয় কি করে?

এই ব্যাপারটা বোঝা শক্ত। সভ্য দুনিয়ায় অসভ্য রকমের হানাহানি লেগেই আছে। সবসময় – কোথাও না কোথাও। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, নানা ধর্মে, ধনী দরিদ্রে। অথচ মন্দিরে মসজিদে চার্চে সিনাগগে বিশাল আয়োজনে ঈশ্বরের উচ্চকিত পূজার বিরাম নেই। কতকাল ধরে ভক্ত মানুষেরা কাতারে কাতারে জড়ো হয়েছিল, এখনো হচ্ছে, কেঁদে আকুল হচ্ছে, কোলাকুলি করছে, তীর্থে তীর্থে ঘুরছে, দানধ্যান করছে। আবার সেই মানুষ আরেক দল মানুষকে অক্লেশে পীড়ন করছে। হত্যা করছে।

ঈশ্বর কি তখন মানুষের অন্তর থেকে কিছু বলেন না? ভাবনা হয়, ঈশ্বর কি আছেন, সত্যিই আছেন? ওই সব মন্দিরে মসজিদে চার্চে সিনাগগে আছেন? মানুষের অন্তরে আছেন?

ঈশ্বরকে আমরা পরমেশ্বর বলেও ডাকি। তাঁর থেকে বড়ো আর কিছু থাকতে পারে না। কখনো বলি ভগবান। কেউ বলেন লর্ড বা প্রভু। কেউ বলেন আল্লাহ বা খোদা। ইহুদীরা বলে ইয়াওহে বা জিহোভা।

পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী নানা জনজাতির জন্য এক এক জন করে পৃথক ঈশ্বর। আবার এক ঈশ্বরের অনুগামীদের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরের অনুগামীদের ঘোর বিবাদ। কেউ যেন কাউকে সহ্য করতে পারে না। তোমার ঈশ্বর মন্দ, আমার ঈশ্বর ভালো – এই রকম ধারণা। অথচ ঈশ্বর আসলে সবই এক। একজনই সর্বশক্তিমান আছেন, একজনই স্রষ্টা আছেন। রামকৃষ(পরমহংসদেব বলেছেন – তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'ব্রহ্মা', কেউ বলছে 'কালী', কেউ বলছে 'রাম-হরি-যীশু-দুর্গা'। উনি তো হক কথাই বলেছেন কিন্তু মানে কে? আর মানলেও কয় জনা?

ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হন তো দেবতা কে? কী তাঁর কাজ?

কোন এক জাতির ঈশ্বর একজন হলেও দেবতা হন অনেকে। এত দেবদেবী কেন? দেবতার সঙ্গে এত অপদেবতা কেন? ভূতপ্রেত দত্যিদানো কেন?

তাঁরাও কি কখনো কখনো কিছু সৃষ্টি করে বসেন? তাঁরাও কি বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন?

মানুষ বিশ্বাস করে যে সৃষ্টি না করলেও দেবতারা যথেষ্ট 'খমতাসম্পন্ন। তাঁরা মানুষের ভালোমন্দ বেশ ভালোমতোই প্রভাবিত করতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বর একজন হলেও অন্য দেবতাদের অমান্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পণ্ডিতেরা বলেন – মানুষের কাছে একজন ঈশ্বরের ধারণা শুর‚তে ছিল না। গোড়ায় তারা প্রকৃতির এক এক শক্তির জন্য এক একজন নিয়ন্ত্রকের কথা ভাবতো। জলের জন্য এক দেবতা তো আকাশের জন্য আরেকজন। আলোর জন্য এক দেবতা তো বাতাসের জন্য আরেকজনা। ঝড়জলবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, সমুদ্রনদনদী, নগর, চাষবাস – সব কিছুর জন্য একজন করে দেবতা চাই। এঁদের তুষ্ট করে চলা চাই। দেবতাদের রোষানল থেকে বাঁচতে হবে। তাই জন্মের জন্য দেবতা আছে, মৃত্যুর জন্য দেবতা আছে, উর্বরতার জন্য দেবতা আছে। চাষবাস কিংবা পশুপালন, অরণ্যে পশুশিকার কিংবা মৎস্যশিকার, যুদ্ধ কিংবা প্রেমভালবাসা, এমন কি রতিমিলনের জন্যও দেবতার কৃপা চাই।

ঈশ্বরের আবির্ভাবের আগে এঁনারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। পরে যখন মানুষের আরেকটু জ্ঞানগম্যি হল তারা বুঝতে চেষ্টা করল যে এত দেবতা নয়, আসলে জগতের স্রষ্টা একজনই। তখন থেকে দেবতাদের ওজন গেল কিছুটা কমে। দেবদেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্তা রইলেন বটে, কিন্তু তাঁদের 'খমতা হ্রাস পেল।

ভয়বিহ্বল মানুষ তবু তাঁদের পূজা করে চলল। দেবতাকে না চটানোই তাদের সাবধানী নীতি।

মহান এই সসাগরা ধরিত্রী। মহান এই দেশভূমি ভারতবর্ষ। মহান এই সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। নিখিল এই বিশ্বচরাচরে, দেশদেশান্তরে ঈশ্বরের বাসভূমি কোথায়? কোথায় খুঁজে দেখব।

অতীতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে কত যে দেবদেবীর মহান আবির্ভাব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা তত্ত্ব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কে ঈশ্বর? কে দেবতা? কাকে পূজো করব? হিন্দু একজনকে, মুসলমান আরেকজনকে আর খৃস্টান অন্যজনকে? এঁদের তিনজনই ঈশ্বর? এমনি করে অন্য জাতি বা অন্য ধর্মে আরো তো ঈশ্বর বা দেবতারা আছেন। তাঁরা কি নগণ্য?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন – 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসেবা। ঈশ্বরকে সেবা করার অবশ্যই তা মহৎ উপায়। এর মতো মহৎ উপায় আর হয় না। একথা সকলেই জানে। কিন্তু কজন পালন করে?

আমরা ঈশ্বরসেবার উপায় খুঁজতে বসিনি। বসেছি ঈশ্বরকে খুঁজে দেখতে। মানবসমাজে ব্যাপকভাবে রোগভোগ বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ হত্যা নিপীড়ন চলছে আর তার বিহিত করার দায় মহান স্রষ্টা এড়িয়ে যাবেন কি করে? তাই তাঁকে খুঁজতে বসা। তাঁকে কোথায় পাবো? নানা ভাবনা আর বিশ্বাসের মধ্যে? নানা ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে? ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে চাই। কোথায় যাবো?

পৃথিবীতে অনেক দেবতা এসেছেন, অনেক ঈশ্বর। কোন ঈশ্বরের অর্চনা করব? কোন দেবতার পূজা করব?

সেই সঙ্গে জগৎ সৃষ্টির রহস্য জানতে চাই। তা কি করে জানা হবে? প্রাচীন সভ্যতার আদিম ধর্মভাবনায় ফিরে যাওয়া? নাকি প্রচলিত প্রধান যে কয়েকটি ধর্ম আছে সেসবের মধ্যে খোঁজ করব?

শুরু থেকে শুরু করতে হলে প্রাচীন সভ্যতার কাছে যাওয়াই ভালো। প্রথম পর্বে আমরা তাই করব।

মানবসমাজে আদিম সভ্যতা কেন্দ্র করেছিল পাঁচটি এলাকায় –মেসোপটেমিয়ায়, মিশরে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, ভারতবর্ষে আর চিনে। সুমের-আক্কাদ-ব্যবিলনের মানুষ ঈশ্বরের কথা ভাবেনি। ভাবেনি প্রাচীন মিশরের মানুষেরা। এমন কি সেদিনের গ্রীক সভ্যতায় দেবদেবীরাই ছিলেন প্রবলভাবে। তখন মানুষ ভেবেছিল শুধু দেবতাদের কথা।

সভ্যতা কিছুদূর বিকশিত হওয়ার পর পৃথিবীতে জন্ম নেয় গুটিকয়েক ধর্ম – ইহুদী, হিন্দু, জরাথুস্ট্রীয়, বৌদ্ধ, জৈন, তাও, কনফুসিয়, শিনটো, খৃস্টান, ইসলাম, শিখ, বাহাই ইত্যাদি। অনুগামীর সংখ্যা বিচার করলে প্রথম খৃস্টান – ১৯৩ কোটি অনুগামী তার। তারপর ইসলাম –১১৫ কোটি, হিন্দু – ৭৫ কোটি, বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামীও ৩৫ কোটি। অন্যান্য ধর্মের প্রতিপত্তি সীমিত পরিসরে ব্যাপ্ত। শিখ দু কোটি এবং ইহুদী দেড় কোটি আর বাকিরা লে(সীমাবদ্ধ। যেমন, বাহাই –৭৭লাখ, কনফুসিয় – ৬১ লাখ, জৈন – ৪০ লাখ, শিনটো – ২৭ লাখ, জরাথুস্ট্রীয় – ৩ লাখ।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মভাবনায় ঈশ্বর বিশেষভাবে চর্চিত। অনেক মানুষ অনেক দেবদেবীর পূজা করছে। আবার অনেকের মধ্যে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নিয়ে আকুল হয়েছে। কিন্তু সকল মানুষের জন্য একজন ঈশ্বর হল না। নানা জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর হলেন। ইহুদী ধর্মমতে প্রথম থেকেই একজন ঈশ্বর। জরাথুস্ট্রের ধর্মে এসেছে দুই ঈশ্বরের কথা। খৃস্টান ধর্ম এক ঈশ্বরের আরাধনা করে এসেছে। ইসলামে একজনই সর্বশক্তিমান। অথচ ইহুদী, খৃস্টান এবং ইসলাম ধর্মে একই ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত। জগতসৃষ্টির কাহিনী মূলত একই।

ভারতবর্ষে হরপ্পা যুগে মানুষের কি ধর্ম ছিল তা নিয়ে সামান্যই সা'খ্যপ্রমাণ আছে। হিন্দুধর্মে বৌদ্ধ-খৃস্টান-ইসলামের মত কোন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা নেই। নানা মুনিঋষি ও দার্শনিকবৃন্দ নানা ভাবনা দিয়ে পুষ্ট করেছিল হিন্দু চিন্তাধারা – ধর্মে ও দর্শনে। আর্য সভ্যতার আদিকালে ঋক বেদের যুগে নানা দেবতা ছিলেন। বেদসংহিতার আমল ছাড়িয়ে উপনিষদের যুগে এসে সেই সব দেবতাদের ছাপিয়ে একজন ঈশ্বরের চিন্তা জ্ঞানবান ঋষিদের আচ্ছন্ন করেছিল। আরো পরে আসে মহাকাব্য এবং পুরাণযুগ। পুরাণকথার যুগ। ইতিমধ্যে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ভারতে উদ্ভূত হয়েছে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। পুরাণের সময় ভক্তির জোয়ার সাধারণ মানুষের কাছে সহজে ঈশ্বর লাভের উপায় তুলে ধরেছিল। ধর্মভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র বিকশিত হয়েছিল। সেখানেও স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে নানা ভাবনার উদয় হয়েছে বিশেষ করে সাংখ্য মতবাদে। ধর্মে আছে আদ্যন্ত বিশ্বাস(দর্শনে আছে কিছু যুক্তি(-তর্ক-আলোচনা।

অনেক বিবেচনার পর প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন – মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

মহাজন যে পথে যান সেটাই উৎকৃষ্ট পথ। বর্তমান কালে বেশ কয়েকজন মহাজন তথা মহাপুরুষ ঈশ্বর লাভের কথা বলেছেন।

তাঁরা কোন পথের কথা বলেছেন তা বিবেচনা করব।

বস্তুজগতের সত্যকে জানার একমাত্র নিশ্চিত পথ বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানীরা জগতসৃষ্টি বস্তুসৃষ্টি প্রাণরহস্য ইত্যাদি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করেন। পরী'খা-নিরী'খা করেন। তারা প্রশ্ন করেন, যাচাই করেন, ভুল করেন এবং ভুল আঁকড়ে না থেকে সংশোধন করেন। বিজ্ঞানী যদি মহাজ্ঞানী মহাতপস্বী হয় তবু তার ভুলটা ভুলই। সেটা কেউই মেনে নেবে না। এখানে কোন ভাবনার প্রতি বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলা আছে কিন্তু অন্ধবিশ্বাস নেই। প্রশ্নহীন আনুগত্য নেই। কারণ যুক্তি(তর্ক আছে, পরী'খা-নিরী'খা আছে, প্রমাণ-অপ্রমাণ আছে। তারপর মানামানি। এও এক সত্যের সন্ধান। বিজ্ঞানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু সৃষ্টি আছে। স্রষ্টাকে জানা যায় তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েও। আমরা ঈশ্বরের খোঁজে তৃতীয় পর্বে এসে দেখার চেষ্টা করব জগতের সৃষ্টি কি করে হল? প্রাণের সৃষ্টি করে হল? কোথায় স্বর্গ আর কোথায় নরক? মানুষের জন্য নশ্বর ইহলোক ছাড়া কি কোন পরলোক আছে? যদি থাকে তবে তা কোথায়? কোন চন্দ্রলোকে কিংবা ন'খত্রলোকে?

আর ভূমিকা নয়। এবার চলুন বেড়িয়ে পড়া যাক সেই মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খোঁজে। দেবতাদের সন্ধানে। জগতসৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে।

২। প্রথম পর্ব। প্রাচীন সভ্যতায়

২.১। সুমের-অক্কাদ-ব্যবিলনে

প্রাচীন মানবসভ্যতার অন্যতম আদি পীঠস্থান প্রাচ্যদেশের মেসোপটেমিয়া। বর্তমানের ইরাক। এখানে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীদুটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল দখিনে সুমের এবং উত্তরে অক্কাদ সভ্যতা। আরো পরে উত্তরে অ্যাসেরিয় এবং দখিনে ব্যবিলনীয় সভ্যতা। কৃষিকর্ম ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এই সব নগরকেন্দ্রিক মানবসমাজ। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রাচীনকালে।

সুমের (Sumer) সভ্যতায় দেবতাই সব। তিনিই সমস্ত জমিজমার অধীশ্বর। তিনিই ধনসম্পদের অধিকর্তা। শুধু সেই সব বিষয়-আশয় দেখাশুনার জন্য ভার দেওয়া হয়েছে কয়েকজন প্রতিনিধির উপর। রাজা বা পুরোহিত তারা। প্রত্যেক নগরের জন্য ছিল একজন করে নির্দিষ্ট দেবতা। নগরের জন্য মানে নগরবাসীদের জন্য। এক একটি নগরই তখন এক একটি রাষ্ট্র। প্রাচীনতম নগর — এরিডু, বাদ-টিবিরা, লারসা, সিপ্পার এবং শুরুপ্পাক। তাছাড়া কিশ, উরুক, উর, লাগাস, এনগিরসু ইত্যাদি নগরের নাম মেলে।

সুমের সভ্যতায় প্রাচীনতম যে দেবতার খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন *অনু* (Anu)। ইনি আকাশের বা স্বর্গের দেবতা। সুমেরিয় ভাষায় 'অ্যান' কথার অর্থ হচ্ছে 'আকাশ'। তার থেকেই নাম 'অনু'। তাঁর সহধর্মিনীর নাম *কি* (Ki) যার অর্থ পৃথিবী। উভয়ের মিলনে জন্মায় *এনলিল* (Enlil)।

নিপ্পুর নগরের দেবতা ছিলেন এনলিল। এঁকে বায়ুর দেবতাও বলা যায়। 'লিল' কথার মধ্যে বায়ু, প্রাণবায়ু, ছায়া বা আত্মার অর্থ জড়ানো। এনলিলের পত্নী *নিনলিল* (Ninlil)। তাঁদের সন্তান চন্দ্রদেব *নন্না* (Nanna)। তাঁর পত্নী *নিনগাল* (Ningal)। নন্না এবং নিনগাল জন্ম দেয় ইনান্না-উতু-র।

দেবতা এনলিল নাকি স্বর্গ থেকে ধরিত্রী আলাদা করে দিয়েছিলেন। মাটির চাঙড় ভাঙার জন্য তৈরী করেছিলেন লাঙল। তাঁর হাতে একটি বিশাল গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই গহ্বর থেকে মাটি ফুঁড়ে জন্ম নিয়েছিল মানুষ। সুমেরীয় পুরাণকথায় বলা হয়েছে সেই সব কাহিনী। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর ভেদ করে গাছ জন্মায়, তেমনি করে মানুষের জন্ম হওয়ার ভাবনার মধ্যে খুব বিস্ময় নেই।

সমুদ্র উপকূল এলাকায় *ইয়া* (Ea) নামে আরেক দেবতা ছিলেন। ইনি জেলে সম্প্রদায়ের দেবতা হবেন।

এঁরা ছাড়া পূজ্যা ছিলেন উর ুক মন্দিরের বিশ্বমাতা দেবী *ইনান্না* (Inanna)। ইনি মাতৃদেবী এবং উর্বরতার প্রতীক। প্রেম ও যুদ্ধের দেবীও বটে। 'ফটকদণ্ডে বাঁধা উড়ন্ত ফিতে' এই তাঁর প্রতীক চিহ্(। অনেকের কাছে ইনি ছিলেন মেষদলের র'খাকর্ত্রী।

প্রাচীন নগর এরিডুতে পূজা পেতেন জলের দেবতা *এনকি* (Enki)। ধরিত্রীর অন্তর থেকে ইনিই এনে দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ পানীয় জল। ইনি পুরুষ-উর্বরতা ও জ্ঞানের অধীশ্বরও বটে।

সুমেরবাসীদের কাছে জগৎ ছিল লবাণাক্ত সমুদ্র দিয়ে ঘেরা আবদ্ধ গম্বুজ। উপরের গম্বুজ তথা আকাশের দেবতা অ্যান এবং নিচে গম্বুজের ভূমি এই পৃথিবী যার দেবী কি। পৃথিবীর নিচে পাতাল এবং পানীয় জলের সমুদ্র 'আপসু'। চারদিকের লবণ-সমুদ্রের নাম 'নমমু' যা পরে 'তিয়ামত' নামেও পরিচিত হয়।

আরেক সুমেরীয় পুরাণকথায় বলা হয়েছে মনুষ্যসৃষ্টির কথা। দেবদেবী এনকি-ইনান্না মিলে মানুষ গড়েছিলেন।

আদিকালে দেবতাদের নাকি নিজের হাতে সকল কাজকর্ম করতে হত। তখনো মানুষ সৃষ্টি হয়নি যে। দেবতারা জমিতে হলকর্ষণ করতেন, সেচের জন্য খাল কাটতেন, বীজ বুনতেন, ফসল তুলতেন। তাঁদের অন্নের যোগান তাঁদেরই করতে হত। শস্য উৎপাদন করতে করতে তাঁরা নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। দেবতাদের পখে' এতসব দৈহিক পরিশ্রম করা রীতিমত কঠিন কাজ তো বটেই। দেবতা এনকি ভাবলেন এর একটা বিহিত করতে হয়। ভেবেচিন্তে উপায় বার করলেন। মাটি দিয়ে মানুষের পুতুল বানাতে হবে। সেই মৃন্ময় পুতুলে প্রাণ সঞ্চার করবেন বিশ্বমাতা স্বয়ং। এরা তখন মানুষ হবে এবং দেবতাদের জন্য চাষবাস করবে, খাদ্য উৎপাদন করবে, অন্যান্য কাজকর্মও করে দিতে পারবে। মানুষ নিজেদের অন্ন যোগানোর সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও অন্ন যোগাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পুতুলমানুষ বানানো হল এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হল। এভাবে সৃষ্টি হল মানুষ। দেবতাদের নির্মাণ অবশ্যই সুন্দর হবে। একদিন দেবতারা অতিরিকত সুরাপানের ফলে নিজেদের মধ্যে খুব বিবাদ শুরু করে দিলেন। বেশি সুরাপান করলে যা হয় আর কি। দেবী ইনান্না তখন রুষ্ট হয়ে বললেন – জানো, আমি তোমাদের সৃষ্টি নষ্ট করে ফেলতে পারি।

দেবতা এনকি সেই হুমকিতে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। বললেন – সৃষ্টি নষ্ট করার চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। কিছুই নষ্ট হবে না। বরংচ দেবী যদি কিছু সৃষ্টি করেন তবে তাকেও মনুষ্যসমাজে ঠাঁই দেওয়া হবে।

ক্রুদ্ধ বিশ্বমাতা তখন অন্ধ, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করতে লাগলেন। আর দেবতা এনকি সেই সকল মানব-মানবীদের মনুষ্য সমাজে আশ্রয় দিতে লাগলেন। এভাবে নিখুঁত ও সুন্দর মনুষ্যসমাজে ত্র(মে জন্ম নিল বিকলাঙ্গ মানুষেরা।

লারসা এবং সিপ্পার নগরে পূজ্য ছিলেন সূর্যদেবতা *উতু* (Utu)। উর নগরে পূজিত হতেন চন্দ্রদেবতা *নন্না* (Nanna)। এই দেবতার প্রতীক চিহ্(ছিল বৃত্তসহ এক দণ্ড। অনেকের অভিমত ইনি আগে পশুপালনের দেবতা ছিলেন। গর ু বা ওই জাতীয় পশুর। যখন উর-নগর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, ইনি রাষ্ট্রদেবতা হিসেবে মনোনীত হলেন। তাঁর জন্য নগরে গড়া হয়েছিল একটি বিশাল মন্দির। তিনতলা সমান উঁচু। এদের বলা হয় 'জিগুরাত' (Jiggurat)। পরবর্তীকালে মিশরে তৈরী হয়েছিল যে সকল পিরামিড অনেকটা সেই আদলে গড়া এই জিগুরাত-মন্দির।

এনলিলের সন্তান দেবতা *নিনুর্ত* (Ninurta)। ইনি গিরসু এবং লাগাস নগরের দেবতা ছিলেন। নগর-রাষ্ট্র ক্রমে এলাকা দখল করে প্রসারিত হচ্ছিল এবং পুরোদস্তুর রাজ্য হয়ে উঠছিল। আবার বলা হচ্ছে, লাগাস রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গিরসু। নগরদেবী ছিলেন *বব।* গিরসুর দেবতা হিসেবে আরেকটি নাম পাওয়া যায় – *নিন-গিরসু*। উরের তৃতীয় রাজবংশের সময় প্রধান-অপ্রধান সুমেরীয় দেবদেবীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল নাকি ৩৬০০ জন।

সুমেরীয় দেবতাকুল অক্কাদ (Akkad) সভ্যতার আমলে ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। দেবতা অনু হলেন *এল* (El)। এনকি হলেন *ইয়া* (Ea)। ইনান্না হলেন *ইশতার* (Ishtar)। সূর্যদেবতা উতু হলেন *সামাস* (Shamash)। আর চন্দ্রদেব নন্না হলেন *সিন* (Sin)।

উ(ক নগরের প্রাচীর নাকি প্রথমে গড়ে দিয়েছিলেন রাজা *গিলগামেশ* (Gilgamesh)। সুমেরের রাজা অগ্গ তার উরুক অবরোধের কাহিনী লিখে রেখে গিয়েছেন এক মহাকাব্যে। মানবসমাজের আদিমতম মহাকাব্য সেই 'গিলগামেস ও কিশের অগ্গ'। এই গিলগামেশ কি সত্যিই কোন ঐতিহাসিক ব্যকিত ছিলেন?

অনেকে বলেন, তিনি আজ থেকে ৪৭০০ বছর আগে উর ুকের রাজা ছিলেন। জীবনে অনেক মহৎ কাজকর্ম করেছিলেন। ব্যর্থ হয়েছিলেন শুধু মৃত্যুকে জয় করতে। ইনি অমর হতে চান। অমরত্ব লাভের উপায় খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন পথে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা হল তার সঙ্গে একজন অমর মহাত্মার। তার নাম উত-*নাপিশতিম* (Utnapishtim)। তিনি তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। চলার শকিত নেই, উঠে বসার শকিত নেই। সবসময় শুয়ে থাকেন। গিলগামেস তার এই অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন।

উত-নাপিশতিম জানালেন – সেও এক কাহিনী। দেবতারা তো মানুষ বানিয়ে নিশ্চিন্ত। এদিকে মানুষের সংখ্যা দ্রুত হু হু করে বেড়ে গেল। তাদের কলকোলাহলে দেবতাদেরই টেকা দায় হল। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে মানুষকে ধ্বংস করতে বন্যা ডেকে

আনলেন। বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমস্ত মানুষজন। দেবতার সৃষ্টি দেবতারাই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। মমতা অনুভব করলেন সৃষ্টিকারী দেব এনকি। তিনি সৃষ্টি র'খা করতে এগিয়ে এলেন। অনুগত মানুষদের ডেকে বললেন বড়ো দেখে একটি নৌকা বানাতে। এবং সেই নৌকায় উঠে আশ্রয় নিতে। তাই করা হল। আর এইভাবে দেবতা এনকির অনুগ্রহে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে র'খা পেল।

পরবর্তী কালে বাইবেলের নোয়ার কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর অনেক সাদৃশ্য আছে। আসলে এই বন্যা ও তার ধ্বংস আদিম মানুষদের কাছে পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা যা তাদের স্মৃতিপটে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বন্যার কথা ঘুরেফিরে অনেক কাহিনীর পটভূমি।

উত-নাপিশতিম দেব এনকির একান্ত অনুগত ছিলেন। দেবতার নির্দেশ মতো নৌকা বানিয়ে তিনি ও তার পরিবারবর্গ আশ্রয় নিয়েছিলেন ও প্রলয় থেকে র'খা পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে র'খা পেল নানা পশুপ্রাণী। একদিন বন্যার জল সরে গেল। নৌকাটি ততদিনে ভাসতে ভাসতে ভিড়ল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ে। শেষপর্যন্ত সৃষ্টি র'খা পাওয়ায় দেবতারা খুশি হলেন। তাঁরা উত-নাপিশতিমকে অমরত্ব দান করলেন।

গিলগামেস তখন তার বাসনার কথা নিবেদন করলেন বৃদ্ধ মহাত্মার কাছে। তিনিও অমরত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু অমরত্বলাভ সে তো আর সহজ কথা নয়। প্রথমে বললেন অমরত্ব লাভ করতে হলে একটানা ছয়দিন সাত রাত জেগে থাকতে হবে। রাজা গিলগামেশ জেগে থাকতে পারলেন না। নাছোড়বান্দা রাজা গিলগামেস তবু অনেক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পরে মহাত্মা উত-নাপিশতিম একটি ওষুধের নাম বললেন। সেই ওষুধ সেবন করলে অমরত্ব লাভ হতে পারে। রাজা ওষুধ খুঁজতে বেরোলেন। অনেক খোঁজখবরের পর আবিষ্কার করলেন অমরত্বলাভের সেই দুর্লভ ওষধিলতা। দুর্ভাগ্য যার সঙ্গে ফেরে তার আর তো কোন চারা নেই। নদীতীরে ওষুধ রেখে তিনি জলে নেমেছিলেন স্নান করতে। কোথা থেকে একটি সাপ এসে খেয়ে ফেলল সেই লতা। সাপটি হয়ে গেল অমর। তার দিব্য প্রমাণও মিলল। খোলস ছেড়ে পুনর্জন্ম লাভ করে সে চলে গেল। রাজা গিলগামেসের আর অমরত্ব লাভ হল না। অমর হয়ে রইলেন তিনি শুধু কাব্যগাথায়।

উত্তর মেসোপটেমিয়ার অক্কাদ সভ্যতার পরে দু দফায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অ্যাসেরিয় (Assyrian) সভ্যতা। অ্যাসেরিয় না বলে একে অসুর সভ্যতা বলা যাক।

আমরা সুর-অসুর ব্যাপারটা কিছুটা বুঝি। ভারতবর্ষে সুর মানে দেবতা আর অসুর মানে দেবকুলের শত্রু দৈত্য-দানব। নানা কাহিনীতে সুর-অসুরের কথা শুনেছি

অনেক। ঠিক উলটো জিনিস ঘটেছে এই প্রাচীন অসুর সভ্যতায়। এদের কাছে অসুর হয়েছে আরাধ্য দেবতা। ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগে, তাই না? অসুর পূজো করা এই মানবকুলের সঙ্গে সুর-পূজক ভারতীয়দের কি কোন সম্পর্ক আছে? যেন এরা একদা একই গোষ্ঠীর মানুষ ছিল। কোন বিষম বিবাদ তাদের দুটো দলে পৃথক করেছে। এমনভাবে করেছে যে একজনের আরাধ্য দেবতা পর্যন্ত অন্যজনের শত্রুস্থানীয় হয়ে পড়েছে।

সুমেরীয় দেবতা এনলিলের স্থান দখল করেছিল দেবতা *অসুর* (Assur)। অসুর-পূজকদের জীবনযাত্রার সমস্ত ছন্দ আবর্তিত হচ্ছিল এই দেবতাকে কেন্দ্র করে।

দেবতার গৌরব বৃদ্ধি করা ভক্তদের পবিত্র কর্তব্য। অসুর-পূজকেরা পরাক্রমশালী ছিল। পররাজ্য জয় করা ছিল তাদের দেবতার গৌরব বৃদ্ধি করা। তা দেবার্চনার নামান্তর। দুর্ধর্ষ অসুরদের যুদ্ধযাত্রা হত স্বয়ং দেবতার নেতৃত্বে। অন্তত সেভাবেই ভাবা হত। মর্তের মানুষেরাও রাজ্যজয় করে থাকে দেশমাতৃকার পূজার জন্য।

বোধ হয় আদিতে অসুর নামে কোন নগর-রাষ্ট্র ছিল ইউফ্রেটিস নদীকূলে। পরে তা সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলখ বা নিমরুদ। কলখের প্রধান দেবতা ছিলেন *নিনুর্ত* (Ninurta)। ইনি যুদ্ধ ও শিকারের দেবতা ছিলেন। অসুর-পূজনের সঙ্গে অন্যান্য দেবতার পূজার্চণাও প্রচলিত ছিল। অন্য কয়েক দেবতার নাম -- ইশতার, নবু, এলিস, অনু, ইয়া, সিন, সামাস আদাদ ইত্যাদি। নিনেভে নগরের দেবী ছিলেন ইশতার -- অসুর দেবের পত্নী।

ব্যবিলনের কথা উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে প্রাচীন পৃথিবীর দ্বিতীয় আশ্চর্য বস্তু ব্যবিলনের শূন্য উদ্যানের কথা যার নির্মাতা ছিলেন চালডিয়ানদের রাজা *নেবুকদনেজর* (খৃঃপূঃ ৬০৫-৫৬১)। মনে পড়ে রাজা *হামুরাবি*-র কথা (আঃ ১৭৯২-১৭৫০ খৃঃপূঃ)। তিনি প্রথম আইনের অনুশাসন শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করে যান।

ব্যবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন *মার্দুক* (Marduk)। তাঁকে ডাকা হত বেল নামে। 'বেল' মানে লর্ড (প্রভু)। অ্যাসেরিয়বাসীগণ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব দেবতা অসুর থাকা সত্ত্বেও এই দেবতাকে মান্য করত। অনু-এনকির সন্তান মার্দুক। তাঁর পঞ্চাশটি নাম পাওয়া যায়। সন্তান ছিলেন জ্ঞানের দেবতা *নবু*।

একবার অসুর-রাষ্ট্রশক্তি(ব্যবিলনের মন্দির নষ্ট করে ফেলেছিল এবং তাতে অ্যাসেরিয় জনগণ খুবই 'খু'ব্ধ হয়ে উঠেছিল। এতটাই যে দেশবাসীর সেই বি'খোভ সামাল দিতে রাষ্ট্রশক্তি(কে প্রচার করতে হয়েছিল নতুন কাহিনী। তারা প্রচার করল যে নানা আদর্শ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমস্ত দেবকুল মার্দুকের উপর রুষ্ট হয়েছেন। দেবমণ্ডলী মার্দুককেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন। শাস্তির জন্য তাঁকে

বিচারসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিচার করে মার্দুককে পদচ্যুত করে প্রধান দেবতার আসনে বসানো হল দেবতা অসুরকে।

এই কাহিনী থেকে আঁচ পাওয়া যায় দেবতা মার্দুকের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল যা অন্যদেশের জনগণকেও প্রভাবিত করেছিল।

অপ্রতিহত শক্তিমান এই দেবতার কাছে ব্যবিলনবাসীরা প্রার্থনা জানাত এই বলে – 'হে যোদ্ধা মার্দুক, যার ক্রোধ বন্যার মত ভয়ঙ্কর, যার 'খমা স্নেহময় পিতার মত, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে আমি নিদ্রাহীন, তিনি কি শুনছেন? তাঁকে ডাকতে ডাকতে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, কোন উত্তর পেলাম না তবু। হে মহান প্রভু, 'খমাসুন্দর মার্দুক, কে তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে? পাপ না করে কে তাঁর কাছে উপস্থিত? কে জানতে পারে দেবতার মন? আমি যেন সমস্ত পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি, আমি যেন সর্বদা জীবন-পিয়াসী হই, মানুষ দেবতাদের নির্দেশিত পথে চলে, এবং দেবতাদের শাস্তি মাথায় পেতে নেয়। আমি যেন আপনার দাস হয়ে কোন পাপকর্মে লিপ্ত না হই। আমি যদি দেবতাদের বিধান উল্লঙ্ঘন করি, হয়তো অল্প বয়সে তা করেছি, তবে দেবতা যেন তা মার্জনা করে দেন। আমাকে দোষ থেকে মুক্তি(দিন, আমার ভ্রান্তি অপনয়ন করুন, আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিন, আমার কষ্ট লাঘব করুন – হে বীর মার্দুক, আপনার জয়গান গাইবার জন্য যেন আমি বেঁচে থাকতে পারি।'

জগৎসৃষ্টি নিয়ে ব্যবিলনে সুন্দর একটি উপকথা আছে। সাতটি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে সেই কাহিনী।

আদিতে জগৎ ছিল এক মহাসমুদ্র। নিখিল বিশ্বচরাচর ছিল জলময়। সেই অনন্ত সমুদ্র থেকে একদিন দেবতাগণ উত্থিত হলেন। তাঁরা সমুদ্রকে বি'খুব্ধ করে তুলেছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে সমুদ্র ঐ দেবতাদের সংহার করতে মনস্থ করল। ভীতসন্ত্রস্ত দেবতারা তাঁদের মধ্যে একজনকে সেনাপতি পদে বরণ করে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠালেন। তিনি পরাস্ত হলেন। দ্বিতীয় আরেকজনকে সেনাপতি করে পাঠানো হল কিন্তু তিনিও পরাস্ত হলেন। মার্দুক ওই দেবকুলের মধ্যে ছিলেন। দুবার পরাজয়ের পর তিনি বললেন যে তিনি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যাবেন। আর যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে তাঁকেই রাজা বলে স্বীকার করে নিতে হবে। দেবতাগণ এই প্রস্তাবে সম্মত। মার্দুক যুদ্ধজয়ের জন্য একটি ফন্দি করেছিলেন আর সে ফন্দিটা ঠিক ঠিক খেটেও গিয়েছিল। যুদ্ধজয় করে তিনি দেবকুলের রাজা হলেন।

আরেকজন দেবতার খবর পাই আমরা। তিনি দেবতা *আপসু* (Apsu)। ইনি পাতালপুরীর গহ্বর এবং সমুদ্রের নিয়ন্তা ছিলেন। দেবী *তিয়ামত* (Tiamat) ছিলেন আদিম লবণ-সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দানবী। তাঁর চারটি পা আর এক জোড়া ডানা ছিল।

চিত্র-১। ব্যবিলনের দেবতা মার্দুক।

কাহিনী 'এনুমা এলিশ' অনুসারে বলা হয় – সদ্যজাত দেবতাদের সঙ্গে দুর্যোগ-শক্তির সংঘর্ষের কথা। ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের। জগতে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী শুভশক্তির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তি র। সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেবী তিয়ামত দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। ভীত দেবকুল তিয়ামতের কাছে মস্তক অবনত করাই স্থির করেছিলেন। কেবল একজনই এসবে ভয় পেলেন না। তিনি দেবতা মার্দুক। দানবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। তিয়ামতকে পরাস্ত করে তাঁকে দুটুকরো করে কেটে ফেললেন। এক টুকরো দিয়ে নির্মিত হল আকাশ। আরেক টুকরো দিয়ে গড়া হল পৃথিবীর ডাঙাজমি। সকল দেবতারা তাঁকে সর্বেশ্বর বলে স্বীকার করে নিলেন।

এই গল্পটাই নানাভাবে প্রচারিত হয়েছে নানা উপকথায়। মূলকথা সে সবের সবের একটাই – দেবকুলে শ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন মার্দুক।

বলা হয় ব্যবিলনীয় দেবতা মার্দুকই নাকি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সেই সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করেছেন *এনকি-ইয়া*। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল তাদের দিয়ে দেবতাদের কাজকর্ম করিয়ে নেওয়া। সুমেরীয় পুরাণ কথায় একই গল্প প্রচলিত দেখেছি। সর্বত্র দেখা যায়, দেবকুল বেশ পরিশ্রম বিমুখ।

অন্য এক উপকথায় বলে প্রথম সৃষ্ট মানবের নাম ছিল অদাপা। দেবতা ইয়া তাকে নির্মাণ করেছেন। মানুষকে অমর করে গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আদি মানবের কোন এক ভুলে সে অমরত্ব লাভ করতে পারে না।

পরে বাইবেলে আমরা এরকমই আরেক কাহিনী শুনতে পাই। অদাপা সেখানে হয়েছে আদম। আদমও নিজের ভুলে স্বর্গ থেকে মর্তে পতিত হয়েছিল। ঈশ্বরের নির্দেশে।

আজ সেই সব দেবতারা কোথায়? সেদিন 'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কমলা রঙের রোদ।' সে রোদ আজ পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত।

২.২। প্রাচীন মিশরে

মানুষের আদিম জন্মভূমি ছিল নাকি আফ্রিকা। সেই আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব দিকে নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মিশর সভ্যতা। প্রাক-ইতিহাস পর্ব থেকে একদিন তারা ইতিহাসের পাতায় চলে আসে। নীলনদকে সে দেশের মানুষেরা বলত হাপি। 'হাপি' মানে 'নদী' কেননা মিশরীরা একটি নদীর কথাই জানত।

মিশর সাম্রাজ্য হয়ে ওঠার আগে উত্তর ও দখিন মিশরেরা মানুষেরা অনেকগুলি গোষ্ঠী বা নোমে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক নোমের জন্য টোটেম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। নানা পশুপাখির নামে গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত ছিল। মেষ, গরু, শেয়াল, ইবিস, কুমির, বেড়াল ইত্যাদি সব টোটেম ছিল তাদের। এই সব পশুপাখিরা হয় পশুরূপেই পূজ্য ছিল অথবা মানুষ ও পশুর এক মিশ্ররূপে। পরেও এই পশুরূপী মনুষ্যদেহ নিয়ে আশ্চর্য রকমের দেবতাকুল বন্দিত হয়ে চলছিল সেদেশে।

দুটি অঞ্চলে মোট ৪২টি নোমের নাম পাওয়া যায় — দখিনে ২২টি এবং উত্তরাঞ্চলে ২০টি। একদিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছিলেন *সেথ* (Seth)। আরেকদিকের বাজপাখি-রূপী দেবতা *হোরাস* (Horus)। এই বাজপাখি ক্রমশ মিশরের অন্যান্য টোটেম আত্মসাৎ করে ফেলেছিল।

মিশরের ইতিহাসের শুরু রাজা *মেনেস* (Menes) বা *নরমার*-এর কাল থেকে। আনুমানিক ৩২০০ বা ৩০৯০ খৃঃপূঃ থেকে। প্রধান উপাস্য দেবতার নাম ছিল হোরাস। কালে কালে ইনি হয়ে উঠেছিলেন আকাশের দেবতা। কেউ তাঁকে গ্রহণ করলেন সূর্য, আলো ও ন্যায়ের দেবতা রূপে। ওসিরিস (Osiris) ও *আইসিস* (Isis) -এর পুত্র দেবতা হোরাস। মাথা বাজপাখির মতো। পরে গ্রীস-রোমক সভ্যতায় হোরাস দেবতা এক বালকে রূপান্তরিত হয়েছিল। *হেথর* (Hathor) ছিলেন হোরাসের পত্নী। ইনি মাতৃদেবী। আদিতে গাভীরূপিনী ছিলেন। তিনি পরে হন শিংওয়ালা গাভীর মস্তক নিয়ে এক মানবী।

প্রাচীন মিশরে যত দেবদেবীর খোঁজ পাওয়া যায় তাঁরা সবাই প্রায় পশুপাখির আদলে গড়া। যেমন, কুকুরের মুখওয়ালা সিয়ুটের দেবতা *অনুবিস* (Anubis) যিনি পাতালের দেবতা ছিলেন। কুমিরের মাথা বসানো দেবতা *ছিলেন সেবেক* (Sebek) । লাটোপোলিসে যুদ্ধের দেবী ছিলেন সিংহীর মাথাওয়ালা *শেখমেত*। থার্মোপোলিসে ইবিসের মাথাওয়ালা *থোঠ* (Thoth)। এই থোঠ আবার চন্দ্র দেবতা, বিদ্যা দেবতা ও লিপির আবিষ্কর্তা। ফলে লিপিকার ও জ্ঞানীগুণীজনের পৃষ্ঠপোষক হলেন।

খ্নুম (Khnum) নামে এক দেবতা ছিলেন যার মাথা ছিল মেষের মতো। ইনি নাকি দেবতা ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন স্রেফ কুমোরের চাকা থেকে। মানুষ কুমোরের চাক থেকে গড়ে মৃৎপাত্র কিন্তু দেবতারা গড়তে পারেন মানুষ।

হাথর সৃষ্টি করেছেন জল। নীলনদের উজানে বাস করত যে সকল মানুষ তারা খুব মান্য করত এই দেবতাকে। কোপ্টার *মিন* দেবতা ছিলেন নাকি বিদেশীদের পৃষ্টপোষক।

আকাশদেবতা হোরাসের সময়ে অন্যতম শক্তিমান দেবতা ছিলেন সেথ। ইনি এক ভয়ঙ্কর দেবতা। প্রবল ধ্বংসসাধন করতে স'খম। দেবতা ওসিরিসকে হত্যা করাই যেন তাঁর আদত কাজ। অথচ তিনি তাঁরই ভাই।

ওসিরিস (Osiris) গণ্য হতেন উর্বরতার দেবতা হিসেবে। সুন্দর সবুজ পৃথিবী ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওসিরিস প্রথমে ছিলেন বদ্বীপের বুসিরিস এলাকার জনগোষ্ঠীর দেবতা। পৃথ্বীদেব *গেব* এবং আকাশদেবী নাট-এর সন্তান। তাঁর থিবসে জন্ম। জন্মকালে নাকি আকাশে উচ্চ নিনাদে ঘোষিত হয়েছিল এই মহাশক্তিমানের আবির্ভাবের কথা।

ওসিরিস-এর মৃত্যু ও পুনর্জীবন নিয়ে লোককথা প্রচলিত ছিল। ইনি ছিলেন মিশরের রাজা। হিংসুটে সেথ-এর চক্রান্তে তাঁকে কফিনবন্দী হতে হয়। নীলনদের জলে ভাসতে ভাসতে সেই কফিন দূর বিক্কাস নগরে চলে যায়। দেবী আইসিস তাঁকে ফিরিয়ে আনেন এবং জীবনদান করেন। সেথ আবার তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেহ খণ্ড খণ্ড করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিলেন। ওসিরিস-এর প্রণয়ী দেবী আইসিস অনেক খুঁজে পেতে সেই সব দেহাখণ্ড সংগ্রহ করেন এবং দেবতা হোরাসের জন্ম দেন। বড়ো হয়ে হোরাস পিতৃঘাতক সেথ-কে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তিনি পিতা ওসিরিস-কেও পুনর্জীবিত করেন।

দেবী *আইসিস* (Isis) ছিলেন এক মহিমময়ী দেবী। ইনি চন্দ্রদেবী। শস্য ও উর্বরতার প্রতীক। ইনি গোমাতা, সর্পমাতা। পাতালের এবং পবিত্র জীবনবৃ'খের দেবী। গেব এবং নাটের কন্যা। এঁর এক ভগিনী *নেপথিস* আর তিন ভাই হোরাস, ওসিরিস এবং সেথ। ওসিরিস-এর সঙ্গে ভগ্নী আইসিস-এর বিবাহ হয়। আইসিস-এর সাহায্য নিয়ে ওসিরিস শেষ পর্যন্ত জন্মান্তরলোকের অধীশ্বর হন।

সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনেক দেবতার। অটেন-রে, হোরাস, ওসিরিস, আমুন (Amun), অ্যানহের, সেবেক এবং মান্ট। অটেন (Aten) এবং *রে* (Re) আগে পৃথক দেবতা ছিলেন। পরে একীভূত হয়ে দাঁড়ালেন *অটেন-রে*। এরকম আরো অনেক দেবতাদের মধ্যে একীভূত হওয়ার ঘটনা আছে। আরেকজন যেমন *আমুন-*

রে। থোঠ, আইসিস এবং খোনস ছিলেন চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। হাথর এবং নাট উভয়ে আবার আকাশের সঙ্গে। মিন আর গেবের সম্পর্ক ছিল পৃথিবীর সঙ্গে।

সৃষ্টি নিয়ে মিশরে নানা উপকথা প্রচলিত ছিল। আদিতে বিশ্বজগত ছিল জলময়। সেই অনন্ত জলধি হতে একদা আবির্ভূত হল একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ে জন্মাল জীবজগত। নানা কাহিনী নানাভাবে দেবতার ও মানুষের উদ্ভবের কথা বলে। কোথাও বলা হল সমুদ্র থেকে দেবতারা উত্থিত হলেন। অন্যত্র হয়তো বলা হল সমুদ্রজাত পাহাড় থেকে দেবতাদের আবির্ভাব। এক দেবকুল জন্মের পর অন্য দেবতাদের সৃষ্টি করেন।

চিত্র-২। পৃথ্বীদেব *গেব* এবং আকাশদেবী নাট।

মেমফিসের পুরোহিত সম্প্রদায় দাবী করেন যে দেবতা *ত্বাহ* (Ptah) ছিলেন আদি দেবতা। তিনিই ছিলেন জলময় অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড। তাঁর ইচ্ছানুসারে জন্ম নিয়েছিল অন্যান্য দেবতাসকল।

এই সব নানা কাহিনী একদিন প্রচলিত ছিল পিরামিডের দেশের লোকের কাছে। লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তখন। আজ আর তা ঠিকঠিক পাওয়া যায় না।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? পরলোকে?

মৃত্যু-পরলোক নিয়ে ভাবনা তো সব দেশেই ছিল। কিন্তু মিশরীয়দের পেয়ে বসেছিল ভীষণভাবে। ইহজীবনেই গভীরভাবে ভেবে নিতে হয়েছে পরলোকের কথা। কত ব্যবস্থা করতে হয়েছে মিশরের ফ্যারাওদের তাদের জীবদ্দশাতেই যাতে পরলোকে কালাতিপাত করা সহজ ও সুন্দর হয়। সকল সম্মানিত অভিজাতরাই চেষ্টা করত পরলোকে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে। মৃত মানুষদের সেই অন্তিম যাত্রার জন্য কত এলাহি আয়োজন ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন মিশর হল 'কবরের দেশ'। চারিদিকে শুধু কবরখানা। প্রথমদিকে *মস্তবা* আর তারপর গড়ে উঠেছে দানবাকার *পিরামিড*।

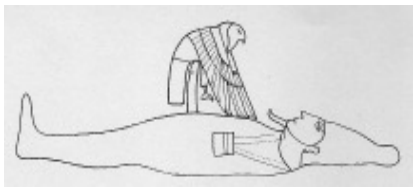

চিত্র-৩। বাজপাখি আইসিস আর মৃত ওসিরিস- হোরাসের জন্মকথা।

সৎ জীবনযাপন না করলে পরলোকে বিচার হবে – এই ছিল মিশরীদের বিশ্বাস। মৃত মানুষের হৃৎপিণ্ড তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে। ওজন করা হবে পাখির পালক দিয়ে কেননা পালক হল সত্যের প্রতীক। দেব থোট সেই ওজনের হিসেব রাখেন। ওজন করা হত দেব ওসিরিস-এর উপস্থিতিতে। যারা বিচারে উত্তীর্ণ হয় না, তারা অনন্তকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরলোকে যাত্রা হয় সূর্যদেবতা রে-র সঙ্গে আকাশপথে। অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল সেই যাত্রা। দৈত্য দানবেরা পথে অলঙ্ঘ্য বাঁধা দিয়ে চলে। অলৌকিক 'খমতাসম্পন্ন সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই সকল বাঁধা অতিক্রম করতে হয়। মৃতের কাছে রাখা প্যাপিরাসে লেখা থাকত সেসব মন্ত্র। পরে ওসিরিস-এর নামটিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনিই নাকি জাগতিক কাজকর্ম বিচার করে শাস্তি বা পুরস্কার দেন। কালে ওসিরিস হয়ে উঠলেন ন্যায় ও ধর্মের প্রতীক।

সূর্যদেবতা *রে* এক মহান দেবতা কেননা তিনিই দেবতাদের রাজা, মানুষের পিতা এবং রাজকুলের পালক।

আরো দুজন সূর্যদেবতার কথা জানতে পাই। একজন হলেন অ্যাটেন অন্যজন আমুন। রে সূর্যদেবতার প্রধান মন্দির ছিল হেলিওপোলিসে।

থীবসের দেবতা ছিলেন *আমুন*। দ্বাদশ রাজবংশের *অমেনেমহেত*-১ রাজার সময় আমুন সম্প্রদায় গুরুত্ব পেয়েছিল। তখন আমুন দেবতাই ছিল রাষ্ট্রীয় দেবতা।

কুমির দেবতা সেবেক-এর অনুগামীরাও তখন বিশেষ রাজানুকূল্য লাভ করেছিল।

চতুর্থ *অমেনহোটেপ* নাম নিয়েছিলেন *অখেন-অটেন*। ইনি *অটেন* নামধারী সূর্যদেবতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাজপাখির মাথাওয়ালা এই দেবতার প্রতীক ছিল সৌরচক্র। মিশরের করনকে তাঁর বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বাতিল করা হয়েছিল দেবতা আমুনের আরাধনা। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হল না অটেন দেবতার একেশ্বর হওয়ার চেষ্টা। অনতিকালের মধ্যে ফিরে এলেন দেবতা আমুন এবং ফিরে পেলেন তাঁর পূর্বপ্রতিষ্ঠা। নতুন নামে সূর্যদেবতার আবির্ভাব হল আমুন-রে।

কে এই সকল দেবতা সৃষ্টি করে? মানুষেরা?

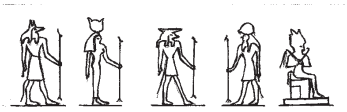

চিত্র-৪। উপরে — মিশরের দেবতা। বামদিক থেকে অনুবিস, হাথর, খনুম, রে এবং ওসিরিস(

মধ্যে — বাজমুখী দেবতা হোরাস(

নিচে — মৃত্যুর পর আত্মার ওজন করা হচ্ছে।

হেলিওপোলিসের পুরোহিতকুল জগতসৃষ্টির কারণ হিসেবে সূর্যদেবতা রে বা অটেনকে চিহ্নিত করেন। আদিতে ছিল কেবল বিশৃঙ্খল জলীয় পদার্থ। তাকে বলা হল '*নান*'। আদি নৈরাজ্যের সেই নান থেকে দেবতা রে জন্ম নেন। সেই নৈরাজ্যের মধ্যে রে নিজের সঙ্গে নিজের মিলনে অন্যান্য দেবতা, মানুষ এবং পশুপাখির সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টি করেন বায়ুমণ্ডলের প্রতিনিধি দেব সু এবং তাঁর পত্নী *টেফনাট*। সৃষ্টি করেন ডাঙার দেবতা গেব আর আকাশদেবী নাট-কে। অন্যান্য দেবদেবতাও। তাঁর এক চ'খু হল সূর্য আর অন্য চ'খু চন্দ্র। তিনি তাঁর অশ্রুবিন্দু থেকে মানুষ বানিয়েছেন। তাই বুঝি মানুষের অশ্রুধারা মুছে গেল না কখনো।

আরেকটি কাহিনীতে বলে যে আদিতে পৃথিবী ও আকাশ, গেব ও নাট, প্রথমে আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিলেন। দেবতা সু তখন আকাশদেবী নাটকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরলেন। পৃথিবীর আলিঙ্গন থেকে তাঁকে মুক্ত করতে। সেই থেকে আকাশ স্থাপিত হল উঁচু আকাশে আর পৃথিবী নীচে ধরণীর ধূলিতে।

প্রাচীন মিশরের সেই আশ্চর্য দেবতাকুল আজ সমাধি ও সৌধে নির্বাক।

কোথায় তাঁরা হারিয়ে গেলেন? কে আর তাঁদের অর্চনা করে? কে তাঁদের স্মরণ করে?

২.৩। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে

প্রাচীন সভ্যতার আরেক বিকাশভূমি হল ভূমধ্যসাগরের উপকূল। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপমালা ছুঁয়ে মূল গ্রীস ভূখণ্ডে এবং তারপর রোম সাম্রাজ্যে।

মেসোপটেমিয়া-মিশর থেকে তার বিস্তৃতি শুরু হয়েছিল তারপর অ্যানাতোলিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন হয়ে গ্রীস-রোম এলাকায় প্রসারিত হয়েছে। শুরুতে ক্রীট ও অন্যান্য দ্বীপসমূহ কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল মাইয়োনিয়ান সভ্যতা। পরে মূল ভূখণ্ডে প্রসারিত হয় মাইসেনীয় সভ্যতা। তা ক্রমে ছড়িয়েছে গ্রীসের মূল দেশে।

আমরা গ্রীক দেবদেবীর কথা জানি মহাকবি হোমারের দুটি মহাকাব্য থেকে। *ইলিয়াড* (Iliad) আর *অডিসি* (Odyssey)। ইলিয়াডে রয়েছে ট্রয় যুদ্ধের কথা। এশিয়া মাইনরের বুকে গ্রীক উপনিবেশ ছিল ট্রয়। অডিসিতে রয়েছে গ্রীকবীর ওডিসিয়াসের ঘরে ফেরার বিপর্যয়ের কাহিনী। সে সব ঘটে মাইসেনীয় সভ্যতার তুঙ্গে।

গ্রীক দেবদেবীরা কখনো বৃদ্ধ হন না। তাঁরা ছিলেন অমর। শুধু ছিলেন নয়, আছেনও বটে। তা কোন দেবতারাই বা বৃদ্ধ হন? তাঁরা প্রয়োজনমতো আকার আকৃতি এবং স্বরূপ পরিবর্তন করতে পারেন। না পারলে দেবতাদের মহত্ব কোথায়?

মানুষ এই সব দেবতাদের প্রথমে ভয় পায় এবং তারপর শ্রদ্ধা করে। তারা তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানায়, মিনতি জানায়, প্রশংসা করে, বলি উৎসর্গ করে, কারণবারি নিবেদন করে। দৈববানী হয় ডোডোনা কিংবা ডেলফির মন্দিরে। দেবদেবীরা অনেক শক্তি ধরেন তবু নিয়তি অনতিক্রম্য। দেবতারাও তাহলে নিয়তির অধীনস্থ? অসহায় সেই অপ্রতিহত শক্তির দুয়ারে?

সমস্ত গ্রীক দেবকুলের মধ্যে প্রধান দেবতা হলেন *জিউস* (Jeus)।

ইনি দেবপিতা এবং মানুষের পিতা। ইনিই সর্বোচ্চ 'খমতাসম্পন্ন। তাঁর 'জিউ-পিতর' নাম থেকে পরে রোমানদের দেবতার নাম হয় *জুপিটার* (Jupiter)। ইনি ক্রোনাস (Chronus) এবং রিয়া (Rhea)-র সন্তান।

ক্রোনাস মানে মহাকাল। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল যে রিয়া-র গর্ভজাত কোন সন্তানের দ্বারা ক্রোনাস 'খমতাচ্যুত হবেন। তাই রিয়ার শিশুপুত্রদের জন্মলাভের পরই গ্রাস করতেন ক্রোনাস। মহাকালের গর্ভে। তৃতীয় সন্তান জিউস-এর জন্ম হলে রিয়া তাঁকে বসুন্ধরাতে লুকিয়ে ফেলেন। সেখানেই তাঁর বড়ো-হওয়া। সেখানেই তাঁর

লালন-পালন। বড়ো হয়ে জিউস কৌশল করে পিতা ক্রোনাসকে বাধ্য করলেন গ্রাস-করে-ফেলা ভাইবোনদের উদগীরণ করতে। সেই ভাইবোনদের সাহায্য নিয়েই তিনি পিতা ক্রোনাসকে 'খমতাচ্যুত করেন এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ 'খমতার অধিকার লাভ করেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বলতে অবশ্য গ্রীসদেশ।

দেবরাজ কিন্তু স্রষ্টা নন। তাই তাঁর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার পড়েনি। 'অর্ফিয়ুস' মতাবলম্বীরা মনে করে যে জগতের শুরু হয় মহাকাল হতে। মহাকাল মানে ক্রোনাস।

অন্যরা বলে – জগতে আদিম অবস্থায় ছিল এক নৈরাজ্য। দুর্যোগপূর্ণ চরম বিশৃঙ্খলা।

আবার অন্য কেউ বলল – না হে, শুরুতে ছিল ইথার সমুদ্র।

তা সেই আদিম জগত যেমনই থাকুক না কেন, তা থেকে জন্ম নিয়েছিল পৃথ্বী বা *গেইয়া* (Gaiea) আর অন্ধকার *এরেবাস* (Erebus)। তারপর একে একে রাত্রি, আলো, বায়ু, দিন, আকাশ এবং সমুদ্র জন্মাল। তারপর জন্মায় প্রাকৃতিক শক্তি(সমূহ।

ন'খত্রখচিত আকাশ তথা *ইউরেনাস* (Uranus) পৃথ্বীর উপর সম্পূর্ণ আচ্ছাদন তৈরী করেছিল। মাতৃদেবী গেইয়া তখন পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র ইত্যাদি নির্মাণ সম্পন্ন করে নিদ্রা গেলেন। আকাশ থেকে তখন বর্ষণ হল। সেই জল পৃথ্বীর মধ্যে সঞ্জাত হল। তা থেকে জন্মাল বৃ'খ', ঘাস, ফুলফল, লতাগুল্ম ও পশুপ্রাণী। জন্মাল একচ'খুবিশিষ্ট *সাইক্লোপস* (Cyclopes)। তারা নিখি'প্ত হল পাতালপুরীতে। তারপর জন্মায় *টাইটান* (Titan) নামের পরাক্রমশালী দেবকুল। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র *ক্রোনাস*। সবশুদ্ধ ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা জন্মেছিল। তাঁরাই জগত শাসন করতেন। পরে বারোজন অলিম্পিয়া নিবাসী দেবতাদের দ্বারা 'খমতাচ্যুত হন। জিউস-হিরা সেই দেবকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য।

মাতা গেইয়া ক্রোনাসকে প্ররোচিত করেন পিতা ইউরেনাস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। পুত্র পিতার লিঙ্গ কেটে সমুদ্রে নিখে'প করেছিল যখন, তখন ইউরেনাস-এর রক্ত পৃথ্বীর দেহে পড়েছিল আর তা থেকে জন্মায় *ফিউরিস*। তাঁরা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে। ভীত ক্রোনাস তাই তাঁর পুত্রকন্যাদের জন্মের পরই গ্রাস করে ফেলতে থাকেন।

দেবরাজ জিউস স্বর্গের অধিপতি। আকাশদেবতা। আবহাওয়া তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ন্যায়-অন্যায় বিচার, আইনশৃঙ্খলা র'খা করা তাঁর দায়। তিনিই পৃথিবীর বুকে বর্ষা নিয়ে আসেন। বজ্র তাঁর অমোঘ অস্ত্র। ক্রুদ্ধ হলে তা নিখে'প করেন। ঈগল হল তাঁর সংবাদবাহক। জিউস ষণ্ড, হাস কিংবা স্বর্ণরেণুর মতো বৃষ্টির রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর নিবাস অলিম্পাস পর্বতে। অনেক সন্তান-সন্ততির পিতা তিনি।

ক্রোনাস-রিয়ার তিন পুত্রের মধ্যে বিশ্বসংসার ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর দেবতা হলেন *হেডস* (Hades)। তাঁর অধিকারে থাকে পাতালপুরী। *পসেডন* (Poseidon) হলেন সমুদ্রের দেবতা। সপ্তসমুদ্রের অধিপতি, পৃথিবী বেষ্টনকারী এবং ভূকম্পক। দেবরাজ জিউসের ভাগ্যে জোটে আকাশ, আলো এবং বাতাস। অলিম্পাস পর্বত এবং পৃথ্বী যৌথ সাধারণ সম্পত্তি হয়ে রইল।

ক্রোনাস-রিয়ার এক কন্যা হলেন *হেরা* (Hera)। ইনি জিউসের পত্নীও বটে। দেবী হেরা নারীসমাজের পৃষ্ঠপোষক। বিবাহ ও সন্তান প্রসব করা তাঁর এক্তিয়ারে। তাঁর বাহন গাভী এবং ছাগী। তিনি রোমানদের কাছে পরিচিত হন *জুনো* (Juno) নামে।

চিত্র-৫। অ্যাপালো।

অন্যতম শক্তিমান দেবতা ছিলেন *অ্যপোলো* (Apollo)। ইনি সূর্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। দেবতা হিসেবে দেখাশোনা করেন পশুপালন, ধনুর্বিদ্যা, সংগীত, ভেষজবিদ্যা, এবং ভবিষ্যদ্বাণী। চারুকলা এবং বিজ্ঞানেরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নেকড়ে হল তাঁর বাহন। তিনি এবং দেবী *আর্তেমিস* দুজনেই জিউসের ঔরসে লেটোর (লাতোনা) গর্ভে জন্ম নেন।

দেবতা অ্যাপোলো গ্রীসে ব্যাপকভাবে পূজিত হতেন। তাঁর কাজকর্মের পরিধি ছিল ব্যাপক। আদিতে তিনি নাকি এশিয়া মাইনরের দেবতা ছিলেন। পরে আইয়োনিয়ান গ্রীক, যাকে আমরা যবন বলি, সেই গ্রীকদের দ্বারা গ্রীসে প্রতিষ্ঠিত হন। হোমারের মহাকাব্যে অ্যাপোলো এবং আর্তেমিস দুজনেই ট্রয়বাসীদের পখে' এবং গ্রীকদের বিপখ' শিবিরে ছিলেন। যতদূর সাধ্য তাঁরা ট্রোজানদের সাহায্য করেছেন। ডেলোস দ্বীপে এবং ডেলফির মন্দির ছিল অ্যাপোলোর প্রধান অর্চনাকেন্দ্র। পরে অবশ্য অন্যান্য জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তাঁকে কল্পনা করা হয়ে থাকে। তাঁর মধ্যে নেই কোন উগ্রভাব। শান্ত গম্ভীর স্বভাবের এই দেবতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

দেবী *আর্তেমিস* (Artemis) অ্যাপোলোর ভগ্নী। শিল্পীর কল্পনায় তাঁকে আমরা শিকারীরূপে দেখি। ডানহাত তাঁর কাঁধের উপরকার তূণের উপর রাখা থাকে। বাম

হাতে ধরা থাকে শিংওয়ালা এক হরিণী। তাঁর বাহন এই হরিণী। কখনো কখনো ভল্লুকীও বাহন হিসেবে দেখা যায়। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি এবং পশুদলের র'খাকর্ত্রী। ইনি নারীকে সন্তান দেন, বেদনাহীন প্রসব করান এবং নারীর সতীত্ব র'খা করেন।

ক্রীট, লাকোনিস এবং এলিথিয়াতে তিনি তাঁর অনুগত শিষ্যদেরও র'খা করেন। কৃষকেরা তাঁকে শস্যদেবী হিসেবেও পূজা করত। আর্তেমিসের পূজার্চনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে ইরান পর্যন্ত। এফিসাসে তাঁর বহুস্তনযুক্ত এক মূর্তির উপাসনার কথা জানা যায়। দেবী সেখানে মাতৃদেবী হিসেবে পূজিতা। আর্তেমিস মন্দিরের পূজারী বা সেবকরা হত নপুংসক। দেবী চিরকুমারী বলে হয়তো এই ব্যবস্থা। অনেকের ধারণা সুমের সভ্যতায় যে দেবী ইশতার ছিলেন, তিনিই রূপান্তরিত হয়েছেন দেবী আর্তেমিসে।

দেবরাজ জিউসের ভাই পসেডন (Posedon) ছিলেন সমুদ্র দেবতা। পেলোপনিসের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় গ্রীকদের পূজ্য ছিলেন গোড়ার দিকে। ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে তাঁকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রিশূলধারী এই দেবতা পৃথ্বী বেষ্টন করে আছেন এবং তাঁর ত্রিশূলখানা দিয়ে ধরিত্রীকে ঝাঁকুনি দেন এবং খোঁচা মেরে ভূমিকম্প ঘটান। তিনপুত্র তাঁর – পেগাসাস, পলিফেমাস এবং ওরিয়ন।

চিত্র-৬। এথেনা।

দেবী *অ্যাথেনা* (Athena) দেবরাজ জিউস এবং মেটিস-এর সন্তান। দেবরাজের মস্তক থেকে ইনি উৎপন্ন হয়েছেন পূর্ণযৌবনা অস্ত্রসুসজ্জিতা হয়ে। রোমানদের আমলে ইনি ভূষিত হন নতুন নামে – *মিনার্ভা* (Minerva)। এথেন্স নগরী র'খার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। সেই সঙ্গে অ্যাটিকা দ্বীপের অধিশ্বরীও ছিলেন তিনি। তাঁর আরেক নাম *পল্লাস*। ইনি একাধারে যুদ্ধদেবী, হস্তশিল্পের দেবী এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তির দেবী। তাঁর সঙ্গে থাকে পেঁচা, সাপ, ছাগচর্ম আর অলিভবৃ'খ'। এথেন্সের পার্থেনন মন্দিরে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল।

অ্যাপোলোর পুত্র *অ্যাসক্লেপিয়স* (Asclepios) ছিলেন ভেষজবিদ্যার দেবতা। বিশেষ করে এপিডওরাসে। হয়তো

আদিতে কোন স্থানীয় দেবতা ছিলেন পরে দেশের সর্বত্র আরাধিত হন। তাঁর গুরু ছিলেন *চিরন*। দেবরাজ জিউস তাঁকে হত্যা করেছিলেন মৃত হিপোলাইটসকে বাঁচানোর জন্য। সাপ এই দেবতার অনুগামীদের কাছে পবিত্র জীব হিসেবে গণ্য।

দেবরাজ জিউস এবং ডায়োনের সন্তান দেবী *আফ্রোদিতি* (Aphrodite)। ইনি প্রেম, সৌন্দর্য এবং উর্বরতার প্রতীক। সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস থেকে তাঁর উত্থান হয়েছিল। অগ্নিদেবতা *হেফায়েস্তস* (Hephaestus)-এর পত্নী ছিলেন তিনি কিন্তু সম্পর্ক ছিল অ্যারিস, ডায়োনিসাস, হার্মিস, পসেডন ইত্যাদি দেবতাদের সঙ্গে। ফলে একনিষ্ঠ পত্নীর অপবাদ তাঁকে দেওয়া যাবে না। হোমার কাব্যে এই দেবী ছিলেন ট্রোজানদের পখে'। অনেকে তাঁকে এশিয়া মাইনরের উর্বরতার দেবী অ্যাডোনিস-এর রূপান্তর বলে মনে করেন। কবি হোমারও তাঁকে মূলত সাইপ্রাসের দেবী বলেছেন।

আফ্রোদিতির পুত্রের নাম *এরোস* (Eros)। ইনি কামদেব। রোমানদের কাছে আফ্রোদিতি আবার ভেনাস (Venus) নামে পূজিতা হতেন। গ্রীকদেবী *আতারগাতিস* সম্ভবত দেবী আথটার এবং অনট-এর মিলিত এক রূপ ধারণ করেছিলেন। পরে তিনিই বুঝি হয়েছিলেন ভেনাস।

যুদ্ধদেবতা *অ্যারিস* (Ares) জিউস-হেরার পুত্র। আফ্রোদিতির প্রেমিকদের মধ্যে একজন। স্বভাবে নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং কলহপ্রিয় বলে খ্যাত। থ্রেস এলাকায় পূজ্য ছিলেন বলে মনে হয়। ইলিয়াড মহাকাব্যে তাঁকেও ট্রোজানদের পখে' থাকতে দেখা যায়। রোমানদের কাছে ইনি *মার্স* (Mars) নামে পরিচিত। মার্স মানে মঙ্গলদেব।

অগ্নিদেবতা হেফায়েস্তস (Hephaestus) জিউস-হেরার পুত্র ছিলেন। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিসমূহ থেকে অগ্নি-উদগীরণ তাঁর অন্যতম কাজ। কামারের যে অগ্নিকুন্ড থাকে সেখানেও এই দেবতার অধিষ্ঠান। এ ছাড়া শিল্পচর্চার খে'ত্রটিও নাকি এই দেবতার একিত্য়ারভুক্ত। হেফায়েস্তস খঞ্জ দেবতা। আগে কোন স্থানীয় দেবতা ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের আমলে তিনি *ভালকান* (Vulcan) নামে পরিচিত হন।

দেবতাগণের দূত হিসেবে কাজ করতেন *হার্মিস* (Hermes)। ইনি দেবরাজ জিউস ও মাইয়ার পুত্র। মৃত মানুষদের নরক-লোক হেডস-এ নিয়ে যাওয়া তাঁর অন্যতম কাজ। গ্রীক বনিক সম্প্রদায় নাকি এই দেবতার আরাধনা করত। বনিক-ব্যবসায়ী ছাড়া পরিব্রাজক ও দেশভ্রমণকারীরাও তাঁর অর্চণা করত। কেননা রাস্তাঘাট ছিল তাঁর হেফাজতে। পথের পাশে যে চিহ্(ফলক বা দূরত্ব নির্দেশ করার ফলক থাকে, তা নাকি এই দেবতার বিশেষ রূপ। আমাদের দেশে কার্তিক ঠাকুরের মতো ইনিও চোরেদের দেবতা হিসেবে পূজ্য। তাঁর যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে তা মানুষের মুখ কিন্তু পাথুরে দেহ নিয়ে। কোথাও তাঁর পায়ে দেখা যায় ডানাওয়ালা জুতো এবং

চওড়া এক টুপি। রোমানদের কাছে এই দেবতা রূপান্তরিত হয়েছেন *মার্কারি* (Mercury) নামে। মার্কারি মানে বুধ দেবতা।

আরেকজন দেবতার নাম *হেরাক্লিস* (Heraclis)। ইনি হারকিউলিস নামে সুপরিচিত। জিউস এবং অ্যালকমেনের এই পুত্রকে জিউসপত্নী হেরা খুব হিংসা করতেন। শিশু হারকিউলিসকে হত্যা করার জন্য দেবী হেরা তাঁর দোলনায় এক বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দিয়েছিলেন। দৈত্যসদৃশ শিশুটি সাপের গলা টিপে মেরে ফেলে। কিশোর হেরাক্লিস নাকি আর্কমেনাসের আক্রমণ থেকে থিবস নগরী র'খা করেছিলেন। পুরষ্কার হিসেবে রাজা কেওন কন্যা মেগারার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বিদ্বেষী হেরার প্রভাবে উন্মাদ হয়ে হেরাক্লিস আপন পত্নী ও সন্তানদের হত্যা করেন। তারপর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিবায়নের রাজা ইউরাইসথেস-এর রাজ্যে বারো বৎসর ধরে কঠোর ও দুঃসাহসিক পরিশ্রম করেন। তিনি নেমিয় সিংহ এবং বহুমুখী দানব হাইড্রাকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর আরো অনেক কীর্তিকলাপ আছে। ইনি শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে এক চিতা জ্বালিয়ে আত্মবিসর্জন দেন। নশ্বর দেহ তাঁর পুড়ে যায়। দেবতাও কি নশ্বর দেহ ধারণ করেন? যাই হোক হেরাক্লিসের আত্মা স্বর্গে গিয়ে হেরার সঙ্গে মিলিত হয়। তিনি জিউস-হেরার কন্যা যৌবনের দেবী হেবেকে বিবাহ করেন। সিংহচর্ম পরিহিত বিশাল দণ্ডধারী বলিষ্ঠ চেহারা ছিল তাঁর। দেবতা হিসেবে গণ্য হলেও হেরাক্লিস বলতে ন্যায়-অন্যায় নানা কাজে ভরা একজন দুঃসাহসিক বীরের ছবি ফুটে ওঠে।

ডায়োনাইসাস (Dionysus) জিউস-সিমেলির পুত্র। ইনি আঙুরখে'ত্র এবং মদ প্রস্তুতিকরনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রথমের দিকে ইনি এশিয়া মাইনর এবং থ্রেস এলাকায় পূজিত হতেন। কৃষক সমাজের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে তিনি উদ্ভিদ-বৃ'খাদির দেবতা হিসেবে গণ্য হতেন। ডেলফির মন্দিরে তিনি অ্যাপোলোর সঙ্গে অর্চিত হতেন। ভক্তরা বিশেষ করে নারীভক্তরা পূজার সময় উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করত। রোমান আমলে তাঁকেই *বাক্কাস* ((Bacchus) বলা হয়েছে।

ডেমেটার (Demeter) হলেন ক্রোনাস-রিয়ার কন্যা। গ্রীক পুরাণে তাঁকে শস্য, ফসল এবং সার্থকতার দেবী হিসেবে মান্য করা হত। জিউসের ঔরসে তাঁর যে কন্যা জন্মেছিল তাঁর নাম *পার্সিফোনে*।

এলিয়ুসিস নগরে ডেমেটার ও পার্সিফোনেকে নিয়ে এক রহস্যময় বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। পার্সিফোনেকে প্লুটো নাকি পাতালপুরীতে সারা শীতকাল বন্দী করে রাখেন। শীতের পরে বসন্তে নবাঙ্কুরের উদগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তি হয়। বলা বাহুল্য ঋতুচক্রের সঙ্গে এবং কৃষিজাত উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এই দেবীর অর্চনা। মৃত্যুর পরবর্তী লোক, সেই পরলোকে সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং পুনর্জন্ম এমন

অনেক ভাবনাচিন্তা থেকে এই গোপন পূজার্চনা বোধ হয় প্রচলিত হয়েছিল।

ক্রোনাস-রিয়ার কন্যা *হেস্তিয়া* (Hestia) গ্রীকপুরাণে অগ্নিকুণ্ড (ফায়ারপ্লেস) তথা গৃহাগ্নির দেবতা। সমস্ত গ্রীক দেবদেবীর মধ্যে এঁকেই দেখা যায় সবথেকে দয়াময়ী। ইনি সেই সঙ্গে গৃহ-নিরাপত্তা বজায় রাখা সুনিশ্চিত করতেন। রোমানরা তাঁকে *ভেস্তা* (Vesta) নামে অভিহিত করেছে।

পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত গ্রীক দেবদেবীদের আত্মস্থ করে নিয়েছিল। অবশ্য দেবদেবীর নামধাম কিছু পরিবর্তিত করে। রোম সাম্রজ্যে তিনজন দেবতা প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা হলেন — জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভা। ক্যাপিটোলাইন পর্বতের সমুন্নত মন্দিরে তাঁরা পূজিত হতেন। পূজো হত *অয়েস্কালাপিয়াস* এবং *সিবিলি* দেবীর। সিবিলি বা সাইবিলি দেবমাতা ছিলেন — অনেকটা প্রকৃতি দেবীর মতো।

কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত আরো কয়েকজন দেবতার খোঁজ পাওয়া যায়। প্রথম লাঙল দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত *ভার্ভাকটর*, দ্বিতীয়বার লাঙল দেওয়ার জন্য *রডারটর*, চক্রাকার বা আড়াআড়ি লাঙল চালানোর জন্য *ইম্পার্সিটর*, বীজবপনের জন্য ইনসিটর, বীজ আচ্ছাদনের জন্য ওবারেটর। এই রকম আরো সাতজন। সবটাই চাষাবাদ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনযাপনের অন্য সকল ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল কোন না কোন দেবতা। জন্মের পর শিশুর প্রথম কান্নার তদারকি করতেন *ভ্যাটিকানাস*। কথা ফোটার মতো জরুরী ব্যাপারটা দেখতেন ফ্যাবুলিনাস, ফ্যারিনাস, এবং লোকুটিয়াস। শিশুর খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা দেখতেন দেবী *এডুকা* এবং *পোটিনা*। হাটতে শেখার পর তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতেন দেবী *অ্যাবেওনা* আর ঘরে ফেরাতেন সেও আরেক দেবী নাম তাঁর *অ্যাডেওনা*। এরকম আরো কত যে দেবদেবী ছিল!

প্রচলিত তাম্রমুদ্রার তদারকির জন্যও একজন দেবতার তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হয়েছিল। সেই দেবতার নাম *অ্যায়েস্কোলানাস*। আবার যখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হল, তখন নতুন আরেক দেবতার আবির্ভাব হল। তাঁর নাম *আর্জেন্টিনাস*। শান্তির জন্য দেবতা ছিলেন *প্যাকস*, আশা আকাঙ্ক্ষার জন্য *স্পেস*, বীরত্বের জন্য *ভির্তাস*, ন্যায়ের জন্য *জাস্কিশিয়া*, সুখের জন্য *ফরচুনা*।

প্রধান দেবতা হিসেবে নাম হয়েছিল — জুপিটার-মার্স-কুইরিনাসের। পরে জুপিটার-জুনো-মিনার্ভার নামই বেশি প্রচলিত হয়।

চিত্র-৭। বাঁদিকে রোমের দেবী জুনো এবং ডানদিকে দেবতা মার্স।

খৃঃপূঃ ১ম শতকের একজন লেখক ভাররোর মতে আটজন হলেন মূল দেবতা — জানুস, স্যাটার্নাস, জেনিয়াস, সোল ডিভাইনাস, ওর্কাস, লিবার-পিটার, টেরা-মাচের এবং লুনা। খৃঃপূঃ ২য় এবং ৩য় শতকে বারোজন প্রধান দেবতার কথা জানা যায়। তাঁরা হলেন — জুনো, ভেস্টা, মিনার্ভা, সেরেরা, ডায়না, ভেনাস, মার্স, মার্কিউরাস, জুপিটার, নেপচুনাস, ভলকানাস এবং অ্যাপোলো।

দেবদেবীর কথা ও কাহিনী শেষ করা খুব মুস্কিল। এত কথা আছে তাঁদের নিয়ে! সেই দেবদেবীরা আজ আর পূজিত হন না। তাঁরা আর নেই দেবালয়ে, শুধু রয়ে গিয়েছে তাঁদের গল্পগাথা।

পৃথিবীর এই সব গল্পও বেঁচে থাকে অনেককাল।

২.৪। কান্নান ও অন্যান্য এলাকায়

আধুনিক যুগের প্যালেস্তাইন প্রাচীনকালে কান্নান নামে পরিচিত ছিল।

সুদূর অতীতে ইহুদীরা ব্যবিলন থেকে ফিরে এসে দখল করে নিয়েছিল এই দেশ। কান্নানবাসীরা তখন সরে যায় ফোয়েনিশিয়া এলাকায়। বর্তমান কালের লেবাননে। ফোয়েনিশীয় মানুষেরা প্রধানত ব্যবসাবানিজ্য নিয়ে থাকত। এরা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিল ভাষা – আদি কান্নান বর্ণমালা। এর থেকে পরে উদ্ভূত হয় রৈখিক শব্দাংশযুক্ত অ'খরমালার।

প্রাচীন কান্নানদের প্রধান দেবতা ছিলেন একজন ষণ্ডদেবতা, নাম *এল* (El, El Elyon)। তিনি সকলের পিতা – দেবতা ও মানুষের। তাঁর পত্নীর নাম দেবমাতা *অথিরাট, আশেরাহ* (Athirat, Asherah)। এলের কন্যা হলেন *অনট* (Anat)। ইনি যুদ্ধদেবী। শিকারী এবং প্রেমের দেবীও বটে। কোন কোন উপকথায় তাঁকে তাঁর সহোদর ভাই বাল-এর প্রেমিকা বলা হয়েছে।

দেবতা *বাল* (Bal) হলেন বজ্রবিদ্যুৎ ও আকাশের দেবতা, আবহাওয়ার দেবতা আবার মৃতলোকের দেবতা। খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি। *ইয়াম* জলদেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। দেবী অনট প্রভূত সাহায্য করেছিলেন তখন।

অন্ধকার আত্মা ও খরার দেবতা ছিলেন *মট* (Mot, Mawat)। সেইসঙ্গে মৃত্যুর দেবতাও। ইনি আবার দেবতা বালের ভাই। এই মৃত্যুদেবতার জন্য বালদেবতাকে পাতালে বন্দী হতে হয়। দেবী অনট তাঁকে উদ্ধার করেন। বাল ও মটের মধ্যে যুদ্ধ হলে বালদেবতার জয় হয়। আবার তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হন। মটকে পরাস্ত করবার সময় দেবী অনট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয় মৃত্যুদেবতাকে মেরে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু ধরাধামে মৃত্যু অমর। আর অমর মৃত্যুদেবতা। মট আবার পুনর্জীবিত হয়েছিলেন।

বজ্রের দেবতা ছিলেন *হাদাদ* (Bal Hadad)। সূর্যদেবতার নাম ছিল *সাপাস* (Shapash)। চন্দ্রদেবতা *ইয়ারিখ* (Yarikh)। তাঁর পত্নীর নাম হল *নিক্কল* (Nikkal)। রোগভোগ, বিশেষ করে প্লেগরোগের দেবতা বা অপদেবতা, ছিলেন *রেসেফ* (Reseph)। রোগের দেবতা থাকলে রোগবালাই-এর জন্যও দেবতা ছিল। তাঁর নাম *এশমুন* (Eshmun)। কান্নানদের বিশ্বকর্মা ছিলেন *কোথারাওয়া-খাসিস* (Kothar-wa-Khasis)।

সুমেরীয়দের মতো কান্নানদেরও এক এক নগরের জন্য একজন দেবতা সুনির্দিষ্ট ছিল। দেব হলে 'বাল' আর দেবী হলে 'বালাত' নামে ডাকা হত। আগেই বলা হয়েছে, 'বাল' মানে প্রভু – মাস্টার। টায়ার নগরের দেবতা ছিলেন *মেলকার্ট* (Melqart)। এমনি আরেক নগরদেবতা ছিলেন *অ্যাডোনিস* (Adonis)। ইনি একজন দুর্ধর্ষ শিকারী ছিলেন। সেই সঙ্গে দেবী *আস্তার্ত*-এর প্রেমিক।

আস্তার্তে (Astarte) কিন্তু একজন বিবাহিতা দেবী। তাঁর পতিদেব স্বীয় পত্নীর এই পরকীয়া প্রেম সুনজরে দেখতে পারেন নি। কেই বা পারে! একদিন বন্য শূকরের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থেকে অ্যাডোনিসকে হত্যা করেন। বিব্লাস নগরের কাছে একটি সমুদ্রগামী নদীর জল আজো প্রতি বছর নাকি অ্যাডোনিসের রক্তে লাল হয়ে যায়। রোম সাম্রাজ্যে দেবতা অ্যাডোনিস আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ইহুদীদের কান্নান দখলের সময়ে মধপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল আরো নানা জাতি উপজাতি। ফিলিস্তিনিদের মতো কিংবা আরো ছোট ছোট জনজাতি – এডোমাইট, মোয়াবাইট, এমোনাইট, আর্মেনিয়, ক্যাসাইট ইত্যাদি। আজো কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান রয়েছে।

মোয়াবাইটদের এক দেবতার নাম ছিল *চেমোস* (Chemos) আর এডোমাইটদের *কওস* (Qaus)। আম্মান প্রদেশে এক দেবতা ছিলেন *মিলকম* (Milcom)। এই দেবতার সঙ্গে কান্নানদের দেবতা মোলেচ-এর সাদৃশ্য ছিল। কান্নানবাসীরা নাকি সন্তানবলি দিত এই দেবতার কাছে।

সিরিয়ায় বসবাস করত আর্মেনিয় জনজাতি। *হাদাদ* (Hadad) তাদের প্রধান দেবতা। দামাস্কাসের এই দেবতাকে আরো বলা হত রাম্মান বা *রিম্মন*। ইনি বজ্রের দেবতা এবং স্বর্গের অধীশ্বর ছিলেন। 'বালশামেন' কথার অর্থ 'স্বর্গের দেবতা'। এই নামেও তাঁকে ডাকা হত। পৌঁছে দেওয়া হত তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা। তাঁর প্রেমিকা ছিলেন দেবী *আথটার* (Athtar)। ইনি বোধ হয় সুমের-ব্যবিলনের দেবী ইশতার-এর নবরূপ।

ব্যবিলনের দুর্ধর্ষ ক্যাসাইট জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল নাকি *সূর্যস* (Hadad)। ভারতীয় সূর্য আর সূর্যস কি অভিন্ন নয়? ক্যাসাইটরাও আদতে ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মানুষ।

আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনরের হিটাইটদের সূর্যদেবতার নাম ছিল *এরিনা* (Erina)। তাদের বজ্রদেবতা *তেশুব* বা *তেশাব* (Hadad) এবং তাঁর পত্নী *হেবাত* (Hadad) রাষ্ট্রীয় দেবতা ছিলেন। তেশাবের প্রতীক দুধারওয়ালা কুঠার এবং দু'মাথাওয়ালা পাখি ছিল।

সাইবেল বা *সিবিলি* (Cybele) ফ্রিজিয়ার অধিবাসীদের দেবী ছিলেন। ইনি ছিলেন সকল দেবতার জননীস্বরূপা। এশিয়ায় এরকম দেবীকে মহামাতা বা মহাদেবী বলে পূজা করা হয়। সমগ্র এশিয়া মাইনরেই দেবী সিবিলির আরাধনা প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা এঁকে দেবী রিয়ায় রূপান্তরিত করেন।

আনাতোলিয়ায় তাঁর সিংহবাহিনী মূর্তি দেখা গিয়েছে। আমাদের দুর্গাজননীর মতো। সিবিলি দেবীর পতিদেব ছিলেন *অত্তশি* বা *অত্তিশ* (Attish)। কোথাও তাঁকে পুত্র বলা হয়েছে। ইনি উর্বরতার দেবতা ছিলেন।

হিত্তিতি নয়াসাম্রাজ্যের আমলে ঝড়-আবহাওয়ার দেবতা ছিলেন *তরহুন* বা *তরহুস* (Tarhun, Tarhus)। বিশ্ব প্রকৃতির পালনকর্তা করহুহস (Karhuhas) ছিলেন। এই দুই দেবতার সঙ্গে রানী *কুবব-সিবিলি* (Kubab-Cybele) বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

আনাতোলিয়ায় হিত্তিতি, লুউইন এবং পলইয়ন জনজাতির নানা গোষ্ঠীর অজস্র দেবদেবীর খোঁজ মেলে।

ইউরোপে প্রাচীন জার্মান জাতির মধ্যে উপাস্য দেবতা ছিলেন তিনজন – *ওতান* বা *ওদিন* (Woden, Odin), *তিয়াজ* (Teiwaz) এবং *থর* (Donar, Dumor, Thor)। নর্স জাতি ওতান দেবতাকে *ওদিন* নামে পূজা করত। তাঁর পত্নী ফ্রেজা বা ফ্রিগ (Freyja, Frigg)। থর আর্যদের ইন্দ্রদেবের মতো। ইনি বজ্রদেবতা এবং অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি উর্বরতারও প্রতীক ছিলেন। সমুদ্র-বায়ুর দেবতা নর্ড (Njord)। তাঁর পুত্র সূর্য-বৃষ্টির উর্বরতার দেবতা ফ্রে (Frey)।

মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মঙ্গোলদের প্রধান দেবতা ছিলেন একজন। তাঁর নাম *টেংরি* (Tengri)। ইনি আকাশের প্রতিনিধি ছিলেন। প্রধান দেবতা হলেও তিনি জগতের সৃষ্টি করেন নি। তা করেছেন অন্য দুজন ঐশী শক্তি – তার মধ্যে একজন সৎ আর অন্যজন শয়তান। তাছাড়া অতগ-টেংরি (Atag Tengri) ছিল ভালো জাতের অশ্ব-প্রসবনের দেবতা। মনকন টেংরি (Manaqan Tengri) আবার বন্যক্রীড়ার দেবতা।

আমেরিকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সামগ্রিকভাবে রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয়। প্রাচীনকালে তারা মধ্য এবং দখিন আমেরিকায় মায়া, ইনকা এবং অ্যাজটেক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বোধ হয় খৃস্টপূর্ব ২০০ নাগাদ। তবে প্রতিপত্তি হয় ৩০০ খৃস্টাব্দ থেকে ৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। মায়া সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল গুয়াতেমালা-মেকসিকো-বেলিজে।

মায়াদের অন্যতম দেবতা ছিলেন বৃষ্টির দেবতাকুল – *চাক* (Chaac) বলা হত তাঁদের। দীর্ঘনাসা ছিলেন সেই সব দেবতারা। সাপের মত রূপ তাঁদের। সাধারণভাবে চারটি দিকের জন্য চারজন করে চাকস দেবতা পূজিত হতেন। অন্যান্য দেবতাদের পরিচয় সঠিক জানা নেই। 'কিনিচ আহাউ' (Kinich Ahau) নামে একজন সূর্যদেবতা ছিলেন। তিনি আকাশের দেবতাও। রাতে আবার তিনি নাকি হয়ে যেতেন পাতালের নয় প্রভুর একজন।

পরে মায়াদের হায়রোগ্লি-ফিক লিপির পাঠোদ্ধার করে জানা গিয়েছে যে ইতজামনা (Itzamna) ছিলেন আকাশের দেবতা। ইনি ইতজামাল নগরের প্রতিষ্ঠাতা শুধু নয়, মায়া সংস্কৃতিরও স্রষ্টাস্বরূপ। আবার তাঁকে স্রষ্টা দেবতাও বলা হয়। মায়াপান নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবতা *কুকুলকান* (Kukulcan)। আধা-মানব আধা-সাপের চেহারা তাঁর। মেকসিকোর দেবতা কোয়েতজালকোটল-এর মতো। বাতাসের দেবতা ছিলেন *হুরাকান* (Huracan)। জগৎ সৃষ্টিতে তাঁর নাকি বিশেষ অবদান ছিল।

মায়াপুরাণ 'পোপোল ভূ' (Popol Vuh) অনুসারে – এ জগৎ সৃষ্টি দেবতারাই করেছেন। তারপর একে একে জমি, পশুপ্রাণী এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে নাকি মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপর কাঠ দিয়ে। অবশেষে শস্য দিয়ে মানুষ তৈরী করা হয়। প্রথমে চারজন পু(ষ গড়া হয় তারপর চারজন নারী। বজ্র-বিদ্যুতের দেবতার নাম বোলোন-জোকাব (Bolon-Dzocab)। পাতাল-ভূগর্ভস্থ জল-বজ্রের এক দেবতার নাম বাকোবস (Bacobs)।

মেকসিকোর টিউটিহুয়াকানে ৩০০-৭০০ খৃস্টাব্দে এক প্রসিদ্ধ নগর গড়ে উঠেছিল। সেখানে বৃষ্টির দেবতাকে বলা হত *তালোক* (Tlaloc)। ইনি শস্য এবং উর্বরতার দেবতা ছিলেন। আরেক জন দেবতার নাম *কোয়েতজালকোটল* (Quetzelcoatl)। সম্ভবত ইনি জলদেবতা ছিলেন।

দখিন আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার ইকুয়াডোর-পেরু-বলিভিয়ায় ইনকা সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। মধ্যযুগে। ১৫৩৩ সালে স্পেনের আক্রমণে ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ রণনিপুন জাতি ছিল তারা। ইনকাদের বিশ্বাস তারা সূর্যদেবতার বংশজাত। সম্রাট পরিবার বংশের পবিত্রতা বজায় রাখতে মিশরের ফারাওদের মত সহোদরাকে বিবাহ করত। ইনকা বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকি *ম্যানকো কাপাক* (Manco Capac) নামের কোন প্রবাদপ্রতিম পু(ষ। ইনকাদের বিশ্বাস ইনিই সেই সূর্যের সন্তান। ইনকা সম্রাট *পাটচাকুটি* (Patchacuti) দেবতা *ভিরাকোচা* (Viracocha)-র পূজা প্রবর্তন করেন। *ভিরাকোচা* নামে যে সম্রাট

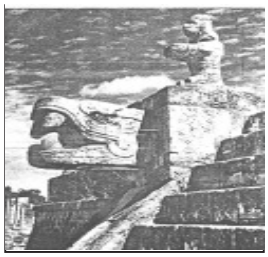

চিত্র-৮। দেবতা কোয়েতজালকোটল সর্পরূপে ।

ছিলেন তিনি আবার পাচকুটেকের পিতা। যাই হোক দেবতা ভিরাকোচাকেই জগতের স্রষ্টা ভাবা হত। তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষ গড়েছেন। তবু সূর্যই ইনকাদের সব কিছু জুড়ে। *ইনতি* (Inti) নামে এক দেবতা শস্য র'খা করতেন। ফসল পাকানোর দায় ছিল তাঁর উপর ন্যস্ত। বজ্রদেবতা ছিলেন – কাটেকুইল (Catequil), আপকো-কাটেকুইল বা ইল্লাপা (Illapa) নামে। *পাচাকামাক* (Pacha Camac) এবং *পাচামামা* (Pachamama) নামে এক মহান দেবদম্পতি ছিলেন। তাঁরা উর্বর ভূমির প্রতীক। এ ছাড়া বৃষ্টি-বায়ুর দেবতা কন (Kon), চন্দ্রদেবী কোনিরায়া (Coniraya) ও সমুদ্রের অন্যান্য দেবতারাও ছিলেন।

ইনকা সভ্যতা লুপ্ত হয়ে গেলেও তার সংস্কৃতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। আন্দিজের পর্বতকন্দরে তা আজো বিরাজ করছে। কোয়েচুয়া এবং আয়ামারা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। পার্বত্য মানুষগুলো আজো পূজো করে তাদের মাতৃদেবী পাচামামাকে। তারা বিশ্বাস করে যে ইনিই জীবন সৃষ্টিকারী। ইনিই সবকিছু লালনপালন করেছেন। বরফেঢাকা উঁচু পাহাড়ে রয়েছে আপু (Apu) দেবতা। উঁচু এলাকার প্রভু তিনি। নীচের পাহাড়গুলো রয়েছে আউকিস প্রভুর নিয়ন্ত্রণে। এই দেবতারা শস্য জন্মানো থেকে, পশুদের জন্ম দেওয়া, মানুষের দেখাশোনা করা – সব কিছু করে থাকেন।

মেকসিকোয় বিস্তার লাভ করেছিল অ্যাজটেক সভ্যতা। ১২০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ স্পেনীয় আক্রমণে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত। অ্যাজটেকরা দুই আদিম সত্তায় বিশ্বাস করত। একজন ওমেতেকুহুটলি (Ometcuhtli) যিনি দ্বৈত সত্তার প্রভু এবং অন্যজন ওমেসিউয়াটল (Omecihuatl) যিনি দ্বৈত সত্তার দেবী। অ্যাজটেক মতে এঁরাই জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর শীর্ষে ত্রয়োদশ স্বর্গে

তাঁদের বসবাস। এঁরাই অন্যান্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর ঐ সকল দেবতারা পৃথিবী এবং সূর্য নির্মাণ করেছেন। টিওটিহুয়াকানে সূর্যের জন্ম হয়েছিল। কোন এক দেবতার আত্মবলিদানের মূল্যে তাঁর জন্ম। তার পর থেকে অন্যান্য দেবতারা রক্ত নিবেদন করে সূর্যকে সক্রিয় রাখেন। প্রতিদিন নরবলি হত সূর্যের উদ্দেশ্যে রক্ত নিবেদনের জন্য। মধ্যগগনের সূর্যকে হুইটজিলোপচটলি (Huitzilopochtli) নামের এক দেবতা বলে মনে করা হত। ইনি যুদ্ধদেবতাও বটে। বৃষ্টির দেবতা ছিলেন তালোক (Tlaloc)।

অ্যাজটেক সভ্যতায় তিনজন দেবতা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন। কোয়েতজালকোটল (Quetzalcotl) নামে এক প্রাচীন দেবতা আদিতে বোধ হয় কোন টোটেম ছিল। সাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরে তিনি পূজিত হন দাড়িওয়ালা শুভ্রকায় বৃদ্ধ রূপে। তেজকাটলিপোকা (Tezcatlipoca) ছিলেন সূর্যের এক প্রতিনিধি। ধ্বংসকারী ও দহনকারী সূর্যের। গোড়ায় ইনি অ্যাজটেকদের তেজকোকো উপজাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন। তৃতীয় দেবতা হুইটজিলোপোচটলি (Huitzilopochtli) – হামিং পাখীর টোটেমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। পরে ইনি এক নিষ্ঠুর দেবতা হয়ে ওঠেন। শেষ দুজন দেবতার সন্তোষ বিধানের জন্য নরবলি দেওয়া হত। সূর্যদেব ছিলেন টোনাটিয়ু (Tonatiuh) এবং চন্দ্রদেব মেট্‌জলি (Metzli)।

এক অ্যাজটেক পুরাণ মতে, জগতের স্রষ্টা তোলোকনাহুয়াক নামের এক দেবতা। সৃষ্টির পর জগৎ চার কালচক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বর্তমান কালচক্র নাহুই-ওল্লিন (Nahui-Ollin)-এ পৌঁছেছে। প্রত্যেক চক্র শেষ হয় কোন না কোন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। সে বিপর্যয় – বিশ্বব্যাপী অগ্ন্যুতপাত কিংবা বন্যা বা ঝড় বা দুর্ভিখ' হতে পারে।

এযাবৎ মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় নানা প্রাচীন সভ্যতায় অনেক দেবদেবীর সন্ধান করলাম। অল্প খোঁজখবর করা হল অন্য কিছু এলাকায়। পৃথিবীতে ছিল আরো অনেক প্রাচীন সভ্যতা। আজো অনেক জনজাতি বেঁচে আছে প্রাচীন পরম্পরা নিয়ে। তাদেরও নিজস্ব আরাধ্য দেবতা ছিল। এখনো আছে। জগত সৃষ্টি সম্পর্কে তাদেরও কোন-না-কোন ভাবনা ছিল। সব খোঁজখবর করার সাধ্য নেই।

প্রাচীনকালের সেই সব দেবদেবীরা ছিলেন সেদিনের মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর সুন্দর আরাধ্য। তারপর যেই মানুষেরা লুপ্ত হয়ে গেল, অমনি দেবদেবীরাও লুপ্ত হয়ে গেলেন। বেঁচে রইলেন তাঁরা ইতিহাস আর পুরাণ কথায়। আচ্ছা, মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক দেবদেবীরা লুপ্ত হয় কেন?

অতঃপর আমরা প্রচলিত ধর্মের দেবদেবী ও ঈশ্বরের খোঁজে অগ্রসর হব।

৩ । প্রচলিত ধর্ম ভাবনায়

৩.১। ইরান চীন জাপানে

প্রাচীন সভ্যতায় নানা দেশের নানা মানুষের আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার মধ্যে ধর্মভাবনা ছিল বটে কিন্তু ধর্মের প্রতিষ্ঠানগতরূপ ছিল না। প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায় যেসকল ধর্ম বা রিলিজিয়ন তাদের মধ্যে পড়ে ইহুদী, খৃস্টান, ইসলাম, হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, জরাথুস্ট্রীয়, শিন্টো, তাও, কনফুসিয় ইত্যাদি। এই সকল ধর্মে ঈশ্বর আছেন, সেই সঙ্গে দেবতা এবং আত্মা। রয়েছে সৃষ্টি নিয়ে ব্যাখ্যাও। সাধারণভাবে এই সকল ধর্মের একজন করে প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন। আছেন নানা ধর্মপ্রচারক। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রত্যেক ধর্মের জন্য লিখিত ধর্মগ্রন্থ। শুরু করব খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উদ্ভূত জরাথুস্ট্রীয় ধর্ম নিয়ে।

বহুকাল আগে প্রাচীন পারস্যে ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর জনমানব বসবাস করছিল। দুটি গোষ্ঠীর কথা বিশেষ ভাবে জানা যায় — মিডি এবং পারসিক। পারসিক বা পর্শুয় মোটামুটি ফর্স বা পর্শ প্রদেশে ঘাঁটি করেছিল। উত্থান হয়েছিল প্রধানত হাখ'মনিশ বা অখ'মেনিশ রাজবংশের কালে (আঃ ৬৪০-৩৩০ খৃঃপূঃ)। তাদের মধ্যে যে প্রাচীন ধর্ম প্রবর্তিত ছিল, তার আমূল সংস্কার করে জরাথুস্ট্র বা জোরোয়াস্টার (Zarathustra, Zoroaster) একটি ধর্মমত স্থাপনা করেছিলেন। সেখানে প্রকৃতিজগতই ছিল দেবতা হিসেবে পূজ্য। সেই সঙ্গে সামরিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সত্য-ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে কিছু বিমূর্ত ধারণা ছিল এই ধর্ম-ভাবনার ভিত্তি। পশুবলি ছিল, অগ্নি দেবতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল আর ছিল 'হওম' নামে উত্তেজক পানীয় সেবন। প্রচলিত বহু ঈশ্বরবাদী ধারণার সংস্কার করে এক সুস্থ সুনীতির উপর মানবসমাজকে দাঁড় করানো ছিল জরাথুস্ট্রের ল'খ্য।

ব্যক্তি জরাথুস্ট্র সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় নি। কেউ বলেন যে তিনি ছিলেন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ২৭০০/২৬০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যতদূর জানা যায় তিনি সাতাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর সময়কাল খৃঃ পূঃ ৬৩০-৫৫৩। মতান্তরে ৬২৮-৫৫১ বা ৬১৮-৫৪১ সাল।

পারস্যে তখন হাখ'মনিশ রাজবংশ শাসন করছে। এই রাজাদের উপাস্য দেবতা হয়ে উঠেছিলেন অহুরমাজদা। বলা হয়, জরাথুস্ট্র বহুদিন রাজা হিসতাপের রাজসভায়

ছিলেন। পারস্য সম্রাট দরিয়ুসের পিতা হাইস্তপেস এবং হিসতাপ বোধ হয় একই ব্যক্তি(হবেন। অনেকে বলেন জরাথুস্ট্র সম্ভবত তাজিকিস্তান-উত্তর বেলুচিস্তান অথবা মিডিয়া অঞ্চলের মানুষ।

জরাথুস্ট্রীয় ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা' বা 'জেন্দ আবেস্তা'। জরাথুস্ট্রের উপদেশাবলী সংগৃহীত রয়েছে সেখানে। মূল অবেস্তার রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কারণ জরাথুস্ট্রর আবির্ভাবকাল নিয়ে নিশ্চয়তা নেই। আবেস্তার প্রাচীন অংশের নাম 'আবেস্তা ইয়স্ন'। এতে অনেক গাথা, যসন (যজ্ঞ), মন্ত্র, স্তোত্র এবং প্রার্থনার অংশ আছে। প্রাচীন পারস্য ভাষায় লেখা হয়েছিল। হাখ'মনিশ রাজত্বের আগে কোন সময়ে প্রথম সঙ্কলিত হয়। তারপর সম্ভবত সাসানীয় আমলে অর্থাৎ খৃস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতকে তা সংশোধন করা হয়। 'ভেন্দিদাদে' রয়েছে দৈত্যদের বি(দ্ধে লড়াই করার নিয়মাবলী, পুরোহিতদের ক্রিয়াকলাপ, সাধারণ প্রার্থনা এবং কিছু আইনকানুন। 'ভিস্পেরেদ' বা 'বিস্পরদে' উল্লিখিত হয়েছে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্তব। শেষভাগ 'বুন্দহিশি'তে রয়েছে জরাথুস্ট্রের কথা। আবেস্তার পহ্লবী সংস্করণ 'আপিস্তক-উ-জিন্দ'। এই পহ্লবী গ্রন্থে সৃষ্টিরহস্য বর্ণিত হয়েছে আর আছে আহুরমাজদা (Ahura Mazda) এবং অহ্রিমান (Ahriman)-এর বিরোধের কথা।

প্রাচীনকাল থেকেই ইরানীরা মৃত পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল। কিছু পবিত্র পশুকে পূজনীয় জ্ঞান করত। যেমন গরু, কুকুর এবং মোরগ। অতি প্রাচীনকাল থেকে তাদের মধ্যে অগ্নি উপাসনার প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগে ভারতে যেমন ছিল সোমপানের চল, ইরানীরাও তেমনি সেবন করত 'হওমা'। এই হওমা এবং সোম সমার্থক মনে হয়।

ইরানীদের পূজ্য দেবতা অহুর। এই অহুর এহং ভারতীয় অসুর বোধহয় অভিন্ন দেবতা। দৈবকে ইরানীরা মনে করত অশুভ শক্তি(র প্রতিনিধি বলে। অসুর বা অহুরই শুভ। ইরানীদের সূর্যদেবতার নাম হল মিথ্র (Mithra)। ইনি যেন ঋগ্বেদের মিত্র দেবতা। আমাদের দেশের ইন্দ্র ওদেশের কাছে 'অন্দ্র' হিসেবে গণ্য হতেন।

প্রাচীনকালের ইরানী এবং ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এরকম বেশ কিছু আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। তা থেকে সহজেই মনে হয় যেন অতীতের এক জাতিসত্তা তীব্র অন্তর্বিরোধে দ্বিখণ্ডিত হয়ে বিপরীত শুভ-অশুভ শক্তির প্রতীক গ্রহণ করেছে। ওদের অহুর-অন্দ্র-মিথ্র-হওমা তাই যেন আমাদের অসুর-ইন্দ্র-মিত্র-সোম। তা থেকে অনেকের অভিমত হল যে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর স্রোতটি ইরানীয় জনগোষ্ঠী হতে পৃথক হয়ে যায়।

অহুরমাজদার ভারতীয় প্রতিরূপ বুঝি বরুণদেবতা। ঋগ্বেদে বরুণের উপাধি ছিল অসুর। অহুর তাঁরই পরিবর্তিত রূপ। দেব কথাটি অতি প্রাচীন — সংস্কৃতে 'দেব', ল্যাটিনে 'দিউস', কেল্টিকে 'দেবোস' এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে 'তিবর' সমার্থক। আদিতে সুরাসুরের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। ১৪০০ খৃঃপূঃ বোখাজ-কোই শিলালিপিতে দৈবদেবতা ইন্দ্র ও নাসত্য অসুর দেবতা বরুণ ও মিত্র একাসনে আসীন ছিলেন। পরবর্তীকালে সুরাসুরের মধ্যে ভেদাভেদ দেখা দেয়। জরাথুস্ট্রের কালে ইন্দ্র বা অন্দ্র হয়ে উঠলেন অপদেবতা। বরুণকে রূপান্তরিত করা হল অসুরে। আর জ্ঞানী অসুর সেই অহুরমাজদাই উন্নীত হলেন প্রায় পরমেশ্বরের আসনে।

জগতের প্রগতির কারণ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি একটি সৎ অন্যটি অসৎ। জগতের স্রষ্টা হলেন সৎ-ঈশ্বর। সৃষ্টির রাজ্যে যা কিছু সুন্দর দৃশ্যমান, সে সবের স্রষ্টা তিনি। যা কিছু সৎ, সবই তাঁর হাতে গড়া। যা কিছু মঙ্গলময়, সে সব তাঁরই সৃজন। গবাদি পশু, অগ্নি, পৃথিবী, ধাতু, জল এবং বৃখ' — এ সবই তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি। চন্দ্র-সূর্য-ন'খত্র তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সপ্তম সৃষ্টি হল মানুষ এবং তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সেই সর্বজ্ঞ শক্তিমান এবং সুন্দর ঈশ্বর হলেন অহুরমাজদা। 'মাজদা' কথার অর্থ জ্ঞানী। 'অহুরমাজদা' মানে প্রজ্ঞাবান অসুর।

অহুরমাজদা ছয়টি স্বর্গীয় অবিনশ্বর সাধী শক্তি বা সন্ত সৃষ্টি করেছেন। এঁরা সকলে তাঁর পুত্র ও কন্যা — অমেশা স্পেন্টাস (Amesha Spentas)। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বহুমনহ (Vahu-Manah) — ইনি ন্যায়, মন ও দয়াময় যুক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, রয়েছেন আশা (Asha-Vahista) — ইনি ধর্মপথ র'খা করেন, রয়েছেন অর্মাইতি (Amraiti) — ইনি নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি, 'খত্র (Kshatra-Vahista) — ইনি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধি, হউরাবতত (Hauravatt) এবং আমেরেতত (Ameretat) — এঁরা ধন ও স্বাস্থ্য, জীবনের পূর্ণতা ও অবিনশ্বরতা র'খা করার জন্য যথাযথ 'খমতা সম্পন্ন। এঁরা স্বর্গের দেবতা মাত্র নন, মানুষের আদর্শও বটে। এই স্বর্গীয় অবিনশ্বর শক্তিসমূহ ঈশ্বরের সৎ সৃষ্টির অধীশ্বর। ছয়টি সৎ সৃষ্টি হল — গৃহপালিত পশু, অগ্নি, মাটি, ধাতু, জল এবং বৃখ'। সপ্তম সৃষ্টি মানুষ। পূর্বোক্ত ছয় সাধু শক্তিকে ভাবা হয় আকাশ, সূর্য, বায়ু, পবন, অগ্নি এবং জলের প্রতিনিধি বা নিয়ন্ত্রক রূপে। এ ছাড়াও এঁদের অধীনস্থ রয়েছে অনেক শক্তি এবং দেবদূত (ইজাজ)। বিপরীতে ছিল অন্ধকার জগতের 'দয়েব'-রা। এই দয়েবদের মধ্যে রয়েছে ছয়টি মন্দবুদ্ধি শয়তান। তাদের মধ্যে একজন হলেন 'অন্দ্র'। আরেকজন মন্দবুদ্ধি শক্তির নাম 'আয়েসমো'।

আবেস্তার ধর্মে আমরা দুজন ঈশ্বরের কথা জানতে পেলাম। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন সৎ ঈশ্বর — অহুরমাজদা। আর দ্বিতীয়জন হল এক অসৎ দানব। তাঁর নাম হল অঙগ্রমন্যু। পরে ইনি হলেন অহ্রিমান যেমন অহুরমাজদা হয়ে উঠেছিলন 'ওহরমাজদা'। ঈশ্বরের সৃজন কখনো মন্দ হতে পারে না, হয়ও নি। কিন্তু অহ্রিমান অশুভ শক্তি। যা কিছু মন্দ তারই প্রতীক। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ধ্বংস করা কিংবা হিংস্রতা ও নৃশংসতা ছড়ানো — এ সব ওই অশুভ শক্তির কাজ। তার অধীনস্থ ছয় মন্দবুদ্ধি শয়তান এ ধরনের কাজে সাহায্য করে অহ্রিমানকে।

বিশ্বজগত সৃষ্টির পরে অশুভ শক্তির ঈশ্বর অহ্রিমান নাকি হিংসায় জ্বলে উঠেছিল আহুরমাজদার সাফল্যে। ধ্বংস করাই যে তার কাজ। ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লাগল। জগতের শৃঙ্খলার মধ্যে আমদানী করল বিশৃঙ্খলা। গোলাকার ও সুন্দর সমতল ধরিত্রীকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে নির্মাণ করল পাহাড়-পর্বত আর উপত্যকা। যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল মাথার উপরে, তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। পবিত্র অগ্নিতে এনে দিল ধোঁয়া — ধূম্রজাল। আদিম মানুষ ও যণ্ডের মধ্যে যুক্ত করল অপরিসীম দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা। চারিদিকে অহ্রিমানের জয়ডঙ্কা সূচিত হচ্ছিল। অন্যায়ের জয়, অশুভ শক্তির জয়।

তখন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। মৃতপ্রায় মানুষ এবং যণ্ড থেকে নির্গত হল অনেক শুক্র বা বীজ। দৈব যণ্ডের বীজ থেকে জন্মাল অন্যান্য গবাদি পশু। আর মানুষের বীজ থেকে জন্মাল উদ্ভিদ। তার সবুজ পাতা বড়ো হয়ে বৃ'খচ্যুত হল। আর তা থেকে সৃষ্টি হল আদি মানব-মানবী। এর ফলে অনাসৃষ্টির সাফল্য ব্যাহত হল আর তা দেখে অহ্রিমান পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পালিয়ে আত্মর'খা করা সম্ভব হল না। শুরু হল শুভ-অশুভর যুদ্ধ। ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ সেই থেকে চলছে। ভালো-মন্দের সংঘর্ষ আজো ঘটে যাচ্ছে। অহ্রিমানের আত্র(মণ শুরু করার প্রথম তিন হাজার বছর ধরে উভয় শক্তির মধ্যে একটা সমতা ছিল। তারপর মহামানব জরাথুস্ট্র জন্মালেন। তখন থেকে অহ্রিমানের পরাজয়ের পালা শুরু হল। এই যুদ্ধ চলবে আরো তিন হাজার বছর ধরে। প্রতি সহস্রাব্দে জন্ম নেবেন একজন করে মহামানব। কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম নেবেন তাঁরা। এক পবিত্র হ্রদের মধ্যে সেই মহামানবদের বীজ সংরখি'ত আছে। কুমারী কন্যারা সেখানে স্নান করে। তারপর কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম নেন মহাপুরুষ। এক হাজার বছর পরে পরে এক একজন মহামানব এসে কিছুটা করে অন্যায় ধ্বংস করবেন। তৃতীয় এবং শেষ মহামানব হবেন 'শাওশিয়ান্তস'। ইনি জরাথুস্ট্রের পুত্র হবেন কিংবা তাঁরই মতো দেহধারী কেউ। তিনি এসে মৃত

মানুষদের বাঁচিয়ে তুলবেন। তখন তাদের শেষ বিচার হবে। বিচারশেষে তারা কিছুকাল স্বর্গ বাস করবে অথবা নরকে। যার যেমন প্রাপ্য হবে। তারপর অহুরমাজদার সান্নিধ্যে অনন্ত সুখে অনন্ত কাল ধরে বিরাজ করবে।

অবশেষে প্রলয়কালে গলিত ধাতুপিণ্ড দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত উপত্যকা ভরে উঠবে। পর্বত সমতল হবে। নরক হবে অবলুপ্ত। অহ্রিমান তখন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে যাবে। অহুরমাজদা হবেন সর্বশক্তিমান। পৃথিবী তখন চন্দ্রালোকে পৌঁছে যাবে। সৃষ্টির পুনর্বিন্যাস হবে। পৃথিবী ও স্বর্গের মিলন হবে। 'বোহু-খষথ্র' বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এই জগতে।

এই হল জরাথুস্ট্রের সদসৎ দ্বৈতবাদ। সম্রাট দরিয়ুসের বিসতুন শিলালেখতে দেখা যায় অহুরমাজদার মানুষী দেহের চিত্র। সূর্যের প্রতীক চিহ্(সম্বলিত।

গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের আক্রমণের ফলে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে খৃঃপূঃ ৩৩০ সালে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভাটা পড়ে তারপর থেকে। ইসলামের প্রসার এই ধর্মবিশ্বাসীদের উপর চরম আঘাত হানে। তখন বেশ কিছু এই সম্প্রদায়ের মানুষ দেশছাড়া হয়।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে কিছু পার্শী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছে। ইসলাম ধর্মের চাপে আপন ধর্মবিশ্বাস বাঁচাতে তারা পারস্যদেশ থেকে চলে এসেছিল এদেশে। ৯৩৬ খৃস্টাব্দে। পারস্যদেশের মানুষ বলে তাদের পরিচয় হয় পার্শী। এরা জরাথুস্ট্রীয় ধর্মমতে বিশ্বাস করে। আজো তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য, ধর্মমত ও বিশ্বাস পরম নিষ্ঠায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

পারস্য দেশের আরেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিথ্র (Mithra) নামে এক দেবতার অর্চনা প্রচলিত ছিল খুব। মিথ্র একজন মহান যোদ্ধারূপে পরিচিত। তিনি সুন্দর ও সুগঠিত যুবাপুরুষ। ষণ্ড হত্যাকারী। পঁচিশে ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। দিনটি আসলে সূর্যের মকরসংক্রান্তি অতিক্রমণের দিন। সূর্যের যেন নবজন্ম লাভ হয়। তার থেকে মনে হয় এই মিথ্র দেবতার মধ্যে আসলে সূর্য দেবতার ঝলকই দেখা যায়। হা'খমনিশ রাজবংশের পরবর্তীকালে অহুরমাজদার পাশাপাশি রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল মিথ্রদেবতা এবং দেবী অনহিতা (Anahita)। রাজা অর্তখ'রেস (৪০৫-৩৬২ খৃঃপূঃ) মিথ্র অর্চনায় উৎসাহী ছিলেন। ফলে তখন তা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়েছিল। পার্থিয়ানদের আমলে এবং রোম সাম্রাজ্যেও।

প্রাচীন মানবসভ্যতার আরেক উন্মেষ হয়েছিল চীনের হোয়াংহো নদী উপত্যকায়। কালে কালে তা চীন ছাড়িয়ে কোরিয়া-জাপান ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়েছিল। এই দূর প্রাচ্যদেশে ইহুদী-খৃস্টানের মতো কোন ধর্মমত প্রবর্তিত হয়নি। যা প্রচলিত ছিল বলে

চিত্র-৯। কনফুসিয়াস

জানা গিয়েছে তা মূলত নীতিসূচক কিছু আচার আচরণবিধি। যেমন চীনে কনফুসিয় এবং তাও মতবাদ আর জাপানে শিন্টো মতবাদ।

জরাথুস্ট্রের কাছাকাছি সময়ে বিশ্বে আরেকজন চিন্তানায়কের জন্ম হয়েছিল। ইনি জন্মেছিলেন প্রাচীন চীনদেশে। নাম কনফুসিয়াস (Confucius) বা কুঙ্গ-ফু-ৎসু (Kung-fu-tzu) মানে প্রভু কুঙ্গ। আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব ৫৫২ কিংবা ৫৫১ থেকে ৪৭৮ বা ৪৭৯ পর্যন্ত। ইনি কিন্তু এক অর্থে নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তন করেন নি। আসলে কনফুসিয়াস ছিলেন একজন নীতিবিদ এবং দার্শনিক। ফলে তাঁর প্রচারিত ধর্মে কোন ঈশ্বর নেই বা দেবতা নেই। অবশ্য স্বর্গ আছে। মানুষের ভাগ্য যে স্বর্গীয় ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই বিশ্বাস আছে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১১-১২শ শতকের নব্য কনফুসিয়াস মতবাদে, দুটি চিরন্তন সত্তার কথা বলা হয়েছে। লি (Li) এবং চি (Chi)। লি হল সৃষ্টির সক্রিয় শক্তি যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জগতের সকল সৎ গুণ। আর চি হল নিস্ক্রিয় শক্তি যা থেকে উৎসারিত সব অসৎ গুণরাজি।

প্রাচীন চীন সভ্যতায় মানুষের বিশ্বাস ছিল স্পিরিট বা আত্মার উপর। আত্মাশক্তিই জীবজগতকে নিয়ন্ত্রণ করত। পুরোহিতগণ আত্মার কাছে নানা প্রশ্ন তুলে ধরত। এবং কি আশ্চর্য তার একটা উত্তরও লাভ করত। এই রকম বেশ কিছু প্রশ্নোত্তর খোদিত পাই কচ্ছপের শক্ত খোলসে কিংবা ষাঁড়ের কাঁধের হাড়ে। আগুনে পুড়িয়ে দেখা হত খোলসে বা হাড়ে কিভাবে ফাটল ধরেছে আর তাই দেখে ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রশ্নের উত্তর দিত। কখনো হয়তো জ্বলন্ত আগুনের টুকরো খোলসে বা হাড়ে চেপে ধরে ফাটলরেখা তৈরী করা হত দৈববাণীর নির্দেশ লাভের জন্য। প্রচলিত ছিল পূর্বপু(ষের পূজা। মানুষের দুটি সত্তা — 'কি' বা জীবন এবং 'লিন' বা আত্মা। মৃত্যুর পর সেই লিন হয়ে যায় 'গুই' (শয়তান) অথবা 'শেন' (দেবতা)। মানুষ মরে গেলে স্বর্গে যায়। মৃত মানুষের আত্মা তিনটি জায়গায় অধিষ্ঠান করে। স্বর্গে, সমাধি স্থলে এবং পূর্বপু(ষগণের পূজাস্থলে।

চীনে তাও (Tao) মতবাদ খুব প্রচলিত হয়েছিল। প্রবর্তক ছিলেন লাও জু (Lao-tzu) এবং চুয়াং জু (Chuang-tzu)। তাও (Tao) একটি আধিদৈবিক ব্যাপার — সর্বাত্মক সর্বব্যাপী এক সমগ্রতা। অনেকটা পরমেশ্বরের মতো।

পৌরাণিক চীনা উপাখ্যানে বলা হয় যে দৈবশক্তিধারী একজন স্রষ্টা আছেন। তাঁর নাম পান-কু (Pan-ku)। জগতের আদিতে ছিল শুধু বিশৃঙ্খলা। এক বিশাল অণ্ডের মধ্যে। এই বিশৃঙ্খলার আরেক নাম ইন-ইয়াং (Yin-Yang)। নারী-পুরুষ, শীত-উষ(তা, আলো-অন্ধকার, সক্রিয়তা-নিস্ক্রিয়তা, ভেজা-শুকনো এরকম দ্বৈত বিপরীতের মিশ্রণ হয়ে। তার মধ্যে অবস্থান করছিলেন পান-কু। তারপর অণ্ড ভেদ করে তিনি নির্গত হলেন এবং দুই বিপরীত বস্তুকে বিভক্ত করতে বসলেন। পৃথিবী ও আকাশ তখন গড়ে ওঠে। তার মাঝখানে পান-কু আসীন হন। ১৮,০০০ বৎসর ধরে পান-কু প্রতিদিন কিছুটা করে বর্ধিত হন। তাঁর এই বৃদ্ধি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। তাঁর গায়ে লোম, মাথায় শিং, আর মুখে শুঁড় আছে। হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে তিনি খোদাই করে নির্মাণ করেছেন পর্বত-উপত্যকা নদনদী সমুদ্র। তিনি গড়েছেন সূর্য চন্দ্র ও ন'খত্ররাজি। মানুষকে শিখ'া দিয়েছেন। জগত ইন এবং ইয়াং দ্বারা পরিপূর্ণ। ১৮,০০০ বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাথার খুলি হয় আকাশ, তাঁর শ্বাস হয় বায়ু, তাঁর কণ্ঠ বজ্র, দেহ মাটি আর রক্ত প্রবাহ হল নদনদী। তাঁর চুলে যে অসংখ্য পোকা ছিল তারা হয়ে উঠল মানুষ। পোকা থেকে মানুষ?

ইনি তৈরী করেছিলেন তিনজন সম্রাট — একজন স্বর্গের, একজন মর্ত্যের এবং অন্যজন মনুষ্য জাতির জন্য। সুই-জেন (Sui Jen) নামে একজন সম্রাট আগুন আবিষ্কার করেন। পরে সম্রাট ফু-সি (Fu Hsi) শিকার ও সংগ্রহ এবং পশুপালনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সম্রাটেরা সভ্যতা প্রতিষ্ঠার নানা সূত্রপাত করেন। যেমন চাষবাদের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, চিকিৎসার প্রবর্তন করেন, পঞ্জিকা আবিষ্কার, ঘরবাড়ি-শহর নির্মাণ, রেশম বোনার প্রচলন, নদীবাঁধ নির্মাণ ও খাল কেটে জলসেচ ব্যবস্থা করা। এই সম্রাটেরা দৈবশক্তিধারী কিনা বলা হয় নি। আবার তারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন এমন প্রমাণও নেই। শেং নং ছিলেন চাষবাসের প্রবর্তক সম্রাট। তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। নগরের পৃথক র'খাকর্তা দেবতা চেং-হুয়াং (Cheng Huang)। তাঁর পূজা হত। যুদ্ধদেবতা ছিলেন গুয়ান-ডি।

স্যাং-তি (Sangdi) নামে একজন স্বর্গীয় সম্রাটের কথা শোনা যায়। বোধ হয় শাং বা ইন উপজাতির পূর্বপুরুষ। তাঁকেই আবার আকাশের অধীশ্বর রূপে গণ্য করা হয়েছে। আরো পরে স্যাং-তির বদলে আকাশ বা তিয়ান (Tian) নামে এক পরম শক্তিমান দেবতার কল্পনা করা হয়েছিল। আরেকজন নিম্নশ্রেণীর দেবতার নাম পাওয়া যায় —ধন সম্পদের দেবতা কাই-সেং (Cai Shen)। ড্রাগন চীনা

ভাবনায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এরা বৃষ্টি এবং ঝর্ণার জল নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধান ড্রাগনের নাম লং-ওয়াং। চীনা সম্রাটের জন্য নাকি ড্রাগনটি সংরখি'ত।

জাপান দেশে আদিতে যে ধর্মাচরণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার কোন নাম জানা নেই। বলা হত কামি (Kami)-প্রদর্শিত পথ। চীনা ভাষায় একে আবার বলা হয়েছে শিন-টো (Shinto) মানে একই কথা। সেই থেকে জাপানী ওই ধর্মাচরণের নাম হল শিন্টো ধর্মমত।

অতি প্রাচীন কাল থেকে এদেশে প্রচলিত ছিল বংশ-প্রতীক পূজা, আত্মাশক্তি(র পূজা এবং র'খাকারী দেবতা অর্থাৎ কামির পূজা। 'কামি' কথার মানে উপরে অবস্থানকারী বা পরম বা প্রধান। সঠিক বলা মুস্কিল 'কামি' নামধারী এই দেবকুলের স্বরূপ কি। আশি লাখ কামি নাকি জগতে বিরাজ করছে। মানুষ মরে গেলে এক একজন কামি হয়ে যায়। অন্তত জাপানী মানুষ মরে গেলে তো যায়। সপ্তম কিংবা অষ্টম শতকে সংকলিত হয়েছিল জাপানের পুরাণ গ্রন্থ 'কোজিকি' (Kojiki) এবং 'নিহোঙ্গি' ((Nihongi, Nihonshoki)। তা থেকে সৃষ্টি নিয়ে জাপানে কি রকম কাহিনী প্রচলিত ছিল তা জানা যায়।

জগৎ সৃষ্টিতে আকাশ ও পৃথিবী হল সৃষ্টির প্রথম ধাপ। তারা প্রথমে তিনজন দেবতার জন্ম দেয়। পরে উদ্ভূত হলেন প্রথমে দুজন দেবতা এবং তারপর পাঁচজোড়া দেবতা। ওই পাঁচজোড়া দেবতাদের মধ্যে সর্বশেষ দম্পতি ছিলেন ইজানাগি (Izanagi)) এবং ইজানামি (Izanami)। দেব ইজানাগি সৃষ্টি করেছেন মাটি এবং তারপর নির্মাণ করেছেন জাপানের দ্বীপসমূহ। স্বর্গের এক সেতুর উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বর্শা দিয়ে তিনি সমুদ্র মথিত করেছিলেন। তাঁর পাশে তখন দাঁড়িয়েছিলেন দেবী ইজানামি। তাঁর বর্শা থেকে পতিত হয়েছিল দ্বীপভূমি। দেবতা ইজানাগি তাঁর বাম চোখ থেকে তৈরী করলেন সূর্য এবং সূর্যের দেবী অমটেরাসু (Amaterasu)। তিনি অন্যান্য দেবতাদেরও নির্মাণ করেছিলেন যেমন নির্মাণ করেছিলেন চন্দ্র, ঝড়, বায়ুর দেবতা।

সুসা-নো-উয় (Susanoo) হলেন ঝড়ের দেবতা। অমটেরাসুর ভাই। ইনারি (Inari) শস্যদেবতা না শৃগাল-দেবতা? নানা উপাস্য দেবতার মধ্যে অন্যতম হল মাউন্ট ফুজি আগ্নেয়গিরি। পশু হলেও পূজিত হত শেয়াল, বানর এবং হরিণ। পৃথিবীর কামি সরতাহিকো ওকামি (Saratahiko Okami)। চন্দ্র দেবতার নামি কামি ৎসুকুয়োমি (Tsukuyomi)। আরো অনেক দেবতার নাম পাই যেমন, সঙ্গীত-শিল্পের দেবতা বেনটেন, সমৃদ্ধির দেবতা এবিসু, যুদ্ধ-ধনুর্বাণের দেবতা হাচিমান,

চিত্র-১০। জাপানের সূর্যদেবী অমটেরেসু।

সমুদ্রযাত্রার সুর'খা দেবতা কোনপিরা, শি'খার দেবতা টেনজিন ইত্যাদি।

জাপানীরা সূর্য উপাসক। বলা হয় জাপানের সম্রাট সূর্যবংশের সা'খাৎ উত্তরপুরুষ। ৬৬০ খৃঃ পূঃ সময়ে জিমমু তেন্নো এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম সূর্যবংশজাত মনুষ্যদেহধারী সম্রাট।

কনফুসিয়াস-জরাথুস্ট্রের প্রায় কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন আরেক মহাপুরুষ। তিনি গৌতম বুদ্ধ (আঃ খৃঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩)। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। মানুষের দুঃখদুর্দশার শরিক হয়ে তিনি মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। না, তিনি কোন ঈশ্বরের কথা বলে যান নি। তিনি জগত সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামান নি। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত হলেও পরবর্তীকালে চীন-জাপান-কোরিয়া-কাম্বোডিয়া-বর্মা-তিব্বত জুড়ে এশিয় ভূখণ্ডে ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে তা এক বিশ্বধর্ম রূপে মর্যাদা পায়।

বুদ্ধের সমসাময়িক আরেকজন ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন। তাঁর নাম মহাবীর। ইনি জৈন ধর্মের প্রচার করেন। বলা হয় মোট জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্ম প্রচার করেন। ঈশ্বর-দেবতা নিয়ে ভাবনা এখানেও নেই বললেই চলে।

আমরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ঈশ্বর-দেবতার খোঁজে যাচ্ছি না।

৩.২। ইহুদী খৃস্টান ইসলাম ধর্মে

মানবসমাজে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে একটি হল ইহুদী ধর্ম। মধ্য প্রাচ্যে এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধর্মের উদ্ভব। প্রাচীন পু(ষে আব্রাহাম ক্যালডিয়ার উর নগর থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ঘেঁষা কান্নান প্রদেশে এসে বসবাস শু(করেন। উর নগর ছিল সুমের আমলে চন্দ্রদেবীর পীঠস্থান। ঈশ্বর নাকি আব্রাহাম ও তার পরিবার-গোষ্ঠীকে বিশেষ সুনজরে দেখেছিলেন। ইহুদীরা নিজেদের 'ঈশ্বরের অভিপ্রেত মানুষ' বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

কথিত আছে যে মহান ঈশ্বর হারনে আব্রাহামের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন – আমি তোমাদের এক নতুন দেশের কথা বলব। তোমরা সেখানে চলে যাও। তোমাদের আমি মহান জাতি হিসেবে গড়ে তুলব।

ঈশ্বরের নির্দেশেই আব্রাহাম পরিবার পরিজন নিয়ে কান্নান প্রদেশে বসবাস করতে চলে যান। সে সব তিন হাজার বছরেরও আগেকার কথা। ঈশ্বরের সেই বিশেষ অনুগত মানুষেরাই বর্তমানে ইস্রাইল রাষ্ট্রে বসবাসকারী। প্রাচীন নাম ছিল যার কান্নান এখন তা প্যালেস্টাইন। এই অনুগত মানুষেরাই হল ইহুদী বা জিউ। এদের পবিত্র শহর জের্জালেম। ইহুদীদের রাজা ডেভিড এই নগর নির্মাণ করেছিলেন। তার রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল ঠিক তিন হাজার বছর আগে – ১০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে।

ইতিহাস বলে দু দুবার বিধ্বস্ত হয়েছে এই শহর। প্রথমবার ৫৮৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে ব্যবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজর-২ এর হাতে। ইহুদীরা তখন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়। তারপর পারস্য সম্রাট কাইরাস-২ ব্যবিলন দখল করেন। ৪৭ বছর পরে। সেই সঙ্গে লাভ করেন ব্যবিলনের সাম্রাজ্য। তখন ব্যবিলনে নির্বাসিত ইহুদীরা তাদের পবিত্রভূমিতে ফিরে আসে। তারা জুডিয়া প্রদেশে বসবাস করতে শুরু করে এবং কঠোরভাবে ধর্মাচরণ করতে থাকে। জুডিয়া প্রদেশে বসবাসকারী ইহুদীদের ধর্মমত কালে কালে জুডাইজম নামে পরিচিত হয়। ইহুদী ধর্মমত এই সময় বিকশিত হয়। জের্জালেম দ্বিতীয়বার বিধ্বস্ত হয় ৭০ খৃস্টাব্দে রোম সম্রাটের আক্রমণে। যীশুখৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কিছুকাল পরে।

হিব্রু ধর্মমতে একজনই ঈশ্বর। একজনই স্রষ্টা। নিতান্ত একেশ্বরবাদী ভাবনা। মোজেসের কাছে প্রকাশিত সেই পরমেশ্বরের নাম 'জিহোভা'। কথাটির অর্থ হল – 'আমি আছি'। আসলে 'ইয়াওয়ে' (YHWH) এই নাম দিয়ে নাকি বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। ঈশ্বরের এই নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। দুঃসাধ্যও বটে। হিব্রুরা তাই 'অ্যাডোনাই' বা 'লর্ড' নামে তাঁকে ডাকত। পরে ইয়াওয়ে কথাটির মধ্যে স্বরবর্ণ

যুক্ত(করে ইয়াওয়েহ উচ্চারণের ব্যবস্থা হয়। ইয়াওয়েহ কালে কালে হয় জিহোভা। হিব্রুদের নিরাকার ঈশ্বর।

কান্নান থেকে ইহুদীরা মিশরে আস্তানা নিয়েছিল কিছুকাল। তারপর সেই দেশ থেকেও তাদের ফিরে যেতে হয় স্বদেশভূমির দিকে। বোধ হয় ১২০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে। মিশর থেকে নিষ্ক্রমণের পরে আরেকবার ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন সিনাই পর্বতে এবং মুসা মোজেসকে দশটি আদেশ দিয়ে যান। মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে স্বয়ং ঈশ্বর তখন নাকি ঘোষণা করেছিলেন – আমিই সেই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর (I am the Lord thy God)। (এক্সোডাস-২০.২)

দশটি আদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন – আমার আগে আর তোমাদের কোন ঈশ্বর থাকবে না, তোমরা জলে স্থলে বা অন্তরীখে' কোন প্রকার মূর্তি গড়বে না, তোমরা আর কোন দেবতার সামনে মাথা অবনত করবে না অথবা পূজা করবে না, কেননা আমি তোমাদের প্রভু – একজন ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর, যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত সন্তানদের আমি শাস্তি দিই। কিন্তু সেই সহস্র সেবকদের ভালবাসি যারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার দশটি প্রত্যাদেশ পালন করে, তোমরা ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করবে না, সাবাথ দিনটি পবিত্র রাখবে কেননা বাকী ছয়টি দিনে ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেছেন, পিতামাতাকে সম্মান করবে, হত্যা করবে না, চুরি করবে না, প্রতিবেশীর বিপখে' মিথ্যা সা'খ্য দেবে না, প্রতিবেশীর গৃহ বা গৃহিণী বা চাকর বা চাকরানীর উপর নজর দেবে না। শোন হে ইস্রায়েলীরা, একজনই প্রভু আছেন, একজনই ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বরের প্রকাশিত নিয়মাবলী বা 'তোরাহ' বাইবেলের প্রথম পাঁচটি খণ্ডে সংগৃহীত রয়েছে। ৬১৩টি নির্দেশ আছে সেখানে। দশটি আদেশে মূল সারাৎসার বর্ণিত।

বাইবেলের তিনটি পাঠ্যাংশ সঙ্কলিত হয়েছে 'শিমা' গ্রন্থে। শিমা কথার মানে হল 'শোন'। ইহুদীদের দুবেলা পাঠ্য এই ধর্মপুস্তক। ধর্মীয় মন্দির সিনাগগ। হিব্রু কথায় যার মানে 'বেন হাকেনেসেট' । অর্থ মিলন-স্থান। একেশ্বরবাদী ইহুদী ধর্মে যদিও ঈশ্বরকে সম্বোধন করা হয় লর্ড বা প্রভু বলে। আমরা তাঁকে ঈশ্বর নামেই ডাকব।

ঈশ্বর কিভাবে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন? বাইবেলের ওলড টেস্টামেন্টে তা নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাতদিনে ব্রহ্মাণ্ড থেকে মানুষ পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন তিনি। এভাবে তা বর্ণিত হয়েছে।

'ঈশ্বর শুরুতে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

পৃথিবী তখন নিরাকার ও শূন্য ছিল। গভীর গহ্বরে অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং ঈশ্বরের শক্তি জলরাশির উপর বিচরণ করছিল।

ঈশ্বর বললেন – আলোর সৃষ্টি হোক। এবং আলোক সৃষ্ট হল।

ঈশ্বর আলোক দেখলেন এবং তৃপ্ত হলেন। তারপর অন্ধকার থেকে আলোক বিচ্ছিন্ন করলেন। সেই আলো হল দিন এবং অন্ধকার হল রাত্রি। এবং সন্ধ্যা ও সকাল মিলিয়ে হল প্রথম দিন।

তারপর ঈশ্বর বললেন – জলরাশির মধ্য থেকে আকাশ জাগ্রত হোক এবং আকাশ জল থেকে জলরাশি বিভক্ত করুক। এবং তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং আকাশের নীচের জলরাশি থেকে উপরের জলরাশি বিভক্ত করলেন। এই আকাশের নাম দিলেন স্বর্গ। সেই সন্ধ্যা এবং সকাল মিলে হল দ্বিতীয় দিন।

ঈশ্বর বললেন – স্বর্গের নীচের সমস্ত জলরাশি এক জায়গায় জড়ো হোক এবং শুকনো ডাঙা জেগে উঠুক। তাই হল। ঈশ্বর সেই শুকনো ডাঙার নাম দিলেন পৃথিবী এবং জড়ো-হওয়া সমস্ত জলরাশিকে বললেন সাগর। ঈশ্বর এ সব দেখলেন এবং তৃপ্ত হলেন।

তারপর ঈশ্বর বললেন – পৃথিবী হতে ঘাস হোক, বীজসম্পন্ন তরুলতা হোক, এমন ফলবতী গাছপালার জন্ম হোক যাতে সেই প্রকারের ফল জন্মাতে পারে এমন বীজ আছে। এবং তাই হল। পৃথিবী ঘাসের জন্ম দিল, বীজসম্পন্ন তরুলতার জন্ম দিল এবং একই প্রকার বীজ আছে যে ফলাদিতে সেই প্রকার ফলবতী গাছের জন্ম দিল। সেই সন্ধ্যা এবং সকাল মিলে হল তৃতীয় দিন।

ঈশ্বর বললেন – দিন থেকে রাত্রি পৃথক করার জন্য স্বর্গের আকাশে অনেক আলোর উদয় হোক এবং তারা সকলে চিহ্(, ঋতু ও দিন এবং বৎসরের জন্য বিরাজমান হোক। পৃথিবী আলোকিত করার জন্য স্বর্গের আকাশে তারা সব আলো হোক। এবং তাই হল। ঈশ্বর দুটি মহান আলোকপিণ্ড সৃষ্টি করলেন – বড়ো আলোকপিণ্ড দিনে রাজত্ব করার জন্য এবং ছোট আলোকপিণ্ড রাতে রাজত্ব করার জন্য। তিনি ন'খত্রমালার সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর সব কিছু স্বর্গের আকাশে স্থাপন করলেন যাতে তারা পৃথিবীতে আলো দিতে পারে। এবং দিনে এবং রাতে রাজত্ব করতে পারে এবং অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করতে পারে। ঈশ্বর দেখলেন এবং তৃপ্ত হলেন। সেই সন্ধ্যা এবং সকাল মিলে হল চতুর্থ দিন।

তারপর ঈশ্বর বললেন – জলরাশি জলের মধ্যে প্রচুর পরিমানে প্রাণ আছে এমন সচল প্রাণীর জন্ম দিক এবং স্বর্গের খোলা আকাশে পৃথিবীর উপরে উড়ে বেড়াতে পারে এমন পাখির জন্ম হোক। এভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন বড়ো তিমি এবং সকল প্রকার গতিশীল প্রাণী। জলরাশি থেকে প্রচুর সংখ্যায় জন্মেছিল তারা। আর তিনি সৃষ্টি করলেন সকল রকমের পাখি। ঈশ্বর দেখলেন এবং তৃপ্ত হলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, সফল হও এবং বৃদ্ধি হোক তোমাদের

এবং সমুদ্রের জলরাশি ভরে তোলো এবং পৃথিবীর পাখিরাও অনেক হয়ে উঠুক। সেই সন্ধ্যা এবং সকাল মিলে হল পঞ্চম দিন।

তারপর ঈশ্বর বললেন – পৃথিবী থেকে জন্ম হোক জীবন্ত প্রাণীদের, বিচরণকারী প্রাণীদের এবং উরঙ্গম প্রাণীদের এবং পৃথিবীর জন্তুদের, যে যেমন হয় তেমন করে। এবং তাই হল। এভাবে ঈশ্বর পৃথিবীর নানা জন্তুদের নির্মাণ করলেন, নানা চারণ পশুদের তৈরী করলেন এবং যা কিছু বুকে হেঁটে যায় সেই সব উরগ প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর দেখলেন এবং তৃপ্ত হলেন।

ঈশ্বর বললেন – আমার মতো করে আমার প্রতিরূপে মানুষ হোক। এবং তারা সমুদ্রে মৎস্যকুলের উপর, চারণ পশুদের উপর এবং সকল বুকে-চলা উরগ প্রাণীদের উপর এবং গোটা পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। এভাবে ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিরূপে এবং আপন প্রতিবিম্বের মতো আপনাকেই সৃষ্টি করলেন মানবরূপে। সৃষ্টি করলেন নারী-পুরুষ। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন – সফল হও এবং বৃদ্ধি হোক তোমাদের, পৃথিবীকে ভরে তোলো এবং তা অধিকার করো, সমুদ্রে যত জলজ প্রাণী আছে, অন্তরীখে' যত বিহঙ্গপ্রাণী আছে, এবং পৃথিবীর উপর যত জীবন্ত ও গতিশীল বস্তু আছে, সে সবের উপর আধিপত্য বিস্তার ক(ক। ঈশ্বর আরো বললেন – দেখো, পৃথিবীতে আমি বীজ থেকে জন্মায় যে সকল ত(লতা তা দিয়েছি তোমাদের জন্যে, বীজ ধারণ করে যে সকল ফল সেই প্রকার গাছপালা দিয়েছি(সে সব তোমাদের ভ'খ্য হবে। তাই হল। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সব দেখলেন এবং দেখে তৃপ্ত হলেন। সেই সন্ধ্যা এবং সকাল মিলে হল ষষ্ঠ দিন।

এই ভাবে স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ এবং তার ভিতরে যা কিছু আছে সে সব নির্মাণ করা সাঙ্গ হল।' (বাইবেল, জেনেসিস ১ঃ১-৩১, ২ঃ১)

এই হল বাইবেল-কথিত বিশ্বনির্মাণের কাহিনী। এরপর আরো আছে। মানুষ নির্মাণের কথা আছে। মানুষ এবং পশুপ্রাণী গড়ার কথা। ঈশ্বর সেসব সৃষ্টি করেছেন। প্রথম সেই মানুষটির নাম ছিল 'আদম'। আদিমতম মানব। তখনো কোন মানবীর আবির্ভাব হয়নি। 'প্রভু ঈশ্বর মাটির ধুলো থেকে মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তার নাসিকারন্ধ্রে ফুঁ দিয়ে জীবনবায়ু ভরে দিলেন(মানুষ জীবন্ত আত্মা হয়ে উঠল। প্রভু ঈশ্বর ইডেনের পূর্বদিকে একটি বাগান করে সেখানে তাঁর সৃষ্ট মানুষটিকে স্থাপন করলেন।' (জেনেসিস ২ঃ৭-৮)

'মাটি থেকে প্রভু ঈশ্বর মাঠের সমস্ত চারণপশু, অন্তরীখে'র সমস্ত বিহঙ্গকুল গড়েছেন এবং তারপর আদমের কাছে এনে দিলেন। দেখতে চাইলেন আদম তাদের কাকে কি নাম দেয় এবং সে কিন্তু সেই সমস্ত প্রাণীদের ঠিক ঠিক নামকরণ করল।

.... কিন্তু আদমকে সাহায্য করার জন্য কেউ তো নেই। তাই প্রভু ঈশ্বর আদমের চোখে গভীর নিদ্রা এনে দিলেন এবং সে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি তখন তার বুকের পাঁজর থেকে অস্থি নিলেন এবং বুকের খাঁচা বন্ধ করলেন। তারপর সেই পাঁজর থেকে প্রভু ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করলেন এবং তাকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। আদম বললেন – এ এখন আমার অস্থির অস্থি হল, আমার মজ্জার মজ্জা হল। একে নারী বলা হবে কারণ সে নর থেকে নির্মিত হয়েছে।' (জেনেসিস ২ঃ১৯, ২১-২৩)

এভাবে এই জগতসংসারের সৃষ্টি, প্রকৃতিজগতের সৃষ্টি এবং একজোড়া নরনারীর সৃষ্টি। আদম আর ঈভ। এদের বসন ছিল না কেননা নগ্নতার বোধ জন্মায় নি। লজ্জা জন্মায় নি। এদের জ্ঞান ছিল না কেননা তখনো তারা জ্ঞানবৃখে'র ফল খায় নি।

ওলড টেস্টামেন্টে এরপর আছে আদম-ঈভের জ্ঞানবৃখে'র ফল খাওয়ার গল্প। আদম-ঈভ সেই ফল খাওয়ার ফলে জ্ঞানলাভ করেছিল। ঈশ্বর তা পছন্দ করতে পারলেন না। জ্ঞানলাভের ফল হল এই যে ঈশ্বর তাদের ইডেনের মনোরম স্বর্গোদ্যান থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। এই আদম-ঈভ থেকে মনুষ্য জাতি ত্র(মে ক্রমে উৎসারিত হয়ে বংশবিস্তার করেছে। নানা জনজাতিতে। ৯৩০ বছর আদম বেঁচে ছিলেন।

কয়েক পুরুষ পরে এসেছিল লামেখের পুত্র নোয়া। তখন একটা বড়ো বিপর্যয় ঘটেছিল পৃথিবীতে। ঈশ্বর দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের পাপবুদ্ধি খুবই বেড়ে গিয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি হলেও তাদের হৃদয়ে যা কিছু ভাবনা জাগ(ক ছিল সে সবই তখন পাপময় হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর অনুতপ্ত হলেন। 'খুব্ধ হলেন। তিনি মনস্থ করলেন, তিনি তাঁর এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন। ধ্বংস করবেন মানুষ এবং পশুপাখী, উরগ এবং বিহঙ্গকুল। এই যে পৃথিবী দুর্নীতিতে ভরে উঠেছিল, হিংসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নোয়া ও তাঁর বংশধরগণ।

ঈশ্বর তাঁকে ডেকে বললেন – 'দেখো পৃথিবী পাপ ও কদাচারে ভরে উঠেছে। এই পৃথিবীর উপর থেকে সমস্ত সৃষ্টি আমি ধ্বংস করব।' তারপর বললেন – 'তুমি এক কাজ কর, গফার কাঠ গিয়ে একটা বড়ো নৌকা বানাও যেন তার মধ্যে অনেক কামরা থাকে। নৌকাটি হবে ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া, এবং ৩০ হাত উঁচু আর তিনতলা। সেখানে তুমি, তোমার ছেলেরা, তোমার পত্নী এবং ছেলেদের পত্নীরা আশ্রয় নেবে। সেই সঙ্গে নৌকায় তুলে নেবে যত রকমের জীব আছে তাদের একটা করে মদ্দা ও মাদী। অন্তরীখে' যতরকমের প্রাণী আছে, পশুচারণের জন্য যত রকমের প্রাণী আছে, তাছাড়া যত উরগ প্রাণী আছে, সব রকমই যেন নৌকায় আশ্রয় পায় এবং তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। তোমার সঙ্গে আমি আমার চুক্তি(কভেনেন্ট) প্রতিষ্ঠা করব।' (জেনেসিস ৬ঃ১৩-১৯)

নোয়ার বয়স তখন ৬০০ বছর। একদিন পৃথিবীতে নেমে এল অঝোর বর্ষণ। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে প্রবল বর্ষণ হল অবিশ্রান্ত ধারায়। পৃথিবীতে ভীষণ বন্যা নেমে এল। ধরাতল ডুবে গেল। নদনদী সমুদ্র একাকার হল। পাহাড়পর্বত পর্যন্ত ডুবে গেল সেই অথৈ জলসমুদ্রে। পৃথিবীতে যা কিছু জীবন্ত ছিল, সবই ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু বেঁচে রইল নোয়া এবং তার নৌকায় চড়ে বসা মানুষ ও পশুপ্রাণীরা। দেড়শ দিন পরে সেই ঐশ্বরিক বন্যার জল নেমে গেল।

ইতিমধ্যে নোয়ার নৌকাখানা ভাসতে ভাসতে আরারাত পর্বতে এসে ভিড়ল। এইভাবে নোয়া ও তার তিন পুত্র পৃথিবীতে মানুষ এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্যান্য প্রাণীদলকে বিলুপ্তি থেকে র'খা করল। পৃথিবী আবার ভরে উঠল নোয়ার সন্তান সন্ততিতে। নোয়ার সাহায্যে র'খা পাওয়া পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা। আমরা সকলে নোয়া তথা আদম-ঈভের সন্তান।

ল'খ্য করে থাকবেন এমন জলময় সমুদ্রের কথা, জগত-জুড়ে হওয়া বন্যার কথা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসেও বেশ প্রচলিত। যেমন উতনাপিশতিম-এর কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীটির অনেক মিল। যাই হোক নোয়ার বংশধরেরা নানা জাতি উপজাতি সৃষ্টি করল। আদিতে সকলের ছিল এক ভাষা। তারপর ঈশ্বর অনেক ভাষার সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি যেমন বর্ধিত হচ্ছিল, তেমনি ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছুকাল পরে জন্ম হয়েছিল আব্রাহামের। তিনি ক্যালডিয়ার উর নগরে বসবাস করছিলেন।

আব্রাহামের পিতার নাম কি আজর? ইনি আদতে কি অসুর বা অ্যাসিরিয় গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন? আব্রাহাম কতটা ঐতিহাসিক আর কতটা পৌরাণিক? ঈশ্বর কেন শুধু আব্রাহামের উপর সদয় হবেন আর অন্যদের উপর নির্দয়? যেভাবেই হোক না কেন, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল তার উপর। ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন – 'আমি তোমাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব ... আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করব, তোমাকে যারা ধন্য করবে আমি তাদের কৃপা করব, তোমাকে যারা অভিশাপ দেবে, আমি তাদের অভিশাপ দেব।'

ঈশ্বরের সেই বরপুত্র ক্যালডিয়া থেকে চলে গেলেন কান্নান প্রদেশে। এই আব্রাহামই আদি ইহুদী যার সঙ্গে ঈশ্বর চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর আইজাক-জোসেফ-জেকব হয়ে আসে মোজেস। মিশর থেকে হিব্রুদের আবার পবিত্রভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মোজেস। পথে সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের আদেশ পেলেন। মোজেসের কাছে ঈশ্বর সেবার আত্মপ্রকাশ করে বলেছিলেন – 'আমি আব্রহাম, আইজাক এবং জেকবের কাছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রূপে প্রকাশিত হয়েছিলাম। আমার যে নাম জিহোভা এই নামে তাদের কাছে পরিচিত হইনি।' (একসোডাস ৬ঃ৩) সেই প্রথম ইহুদীদের ঈশ্বর আপনার নাম প্রকাশ করলেন। তিনি ইয়াওহে। তিনি জিহোভা।

ইহুদী ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল খৃস্টান ধর্মমত। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জোসেফ ও মেরির সন্তান যীশুখৃস্ট (আনুমানিক ৪ খৃঃ পূঃ থেকে ২৯ খৃঃ) নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেও আজীবন তিনি ইহুদী ছিলেন। জন্মেছিলেন মধ্য প্রাচ্যের গ্যালিলি প্রদেশের নাজারেথ শহরে। জন্মের গৌরব বৃদ্ধি করতে পরে তাঁর জন্মস্থান ইহুদী ঐতিহ্যধারী জুডিয়া প্রদেশের বেথলেহেম বলে প্রচার করা হয়েছে। মহাপ্রয়াণ হয় ২৯ খৃস্টাব্দে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে যীশুর জীবনকথা এবং তাঁর উপদেশাবলী লিখিত রয়েছে। সে সব কথা গসপেলের আকারে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর চার অনুগামী। রচনাকাল সম্ভবত ৭০-৭৫ থেকে ১০০-১১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এই সকল গসপেলকারগণ কেউই যীশুর প্রত্যখ' শিষ্য ছিলেন না। কেবলমাত্র সেন্ট মার্ক যীশুর প্রত্যখ' শিষ্য সেন্ট পিটারের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর কাছে যীশুর জীবনকথা শুনেছিলেন। অন্যান্যরা যা কিছু লিখেছেন তা শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে। ভক্ত সম্প্রদায়ের স্তুতি চিরকালই বাস্তব সীমানা অতিত্র(ম করে যায়। ফলে ভক্তিগাথা থেকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা নির্ণয় দুর্‌হ কাজ।

যীশুর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিরিশ বছর বয়সে তিনি জন নামে একজন সাধকের কাছে দী'খা নেন। জন কারাবরণ করলে তিনি নীতিকথা প্রচার শুরু করেন। সে সময় ইহুদী ধর্ম নিয়ম ও আচারসর্বস্ব হয়ে পড়েছিল। মানুষের যথার্থ সেবা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। ধর্মসংস্কার করা খুবই জর্‌রী হয়ে পড়েছিল।

চিত্র-১১। যীশু

হতাশাক্লিষ্ট ইহুদীরা প্রত্যাশা করছিল একজন পরিত্রাতার। তখন যীশু প্রচার করলেন – ঈশ্বর দয়াময়। তিনি সকল মানুষের পিতা এবং মানুষ তাঁর সন্তান। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ। প্রেম ও ক(ণা আশ্রয় করাই মনুষ্যধর্ম।

যীশু প্রথমে গ্যালিলি প্রদেশে প্রচার করেন। রোগ নিরাময়ের অলৌকিক 'খমতা ছিল তাঁর। তা নিয়ে অনেক

কাহিনী শোনা যায়। গ্যালিলির মতো অসংস্কৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারের পর তিনি ইহুদীদের মূলকেন্দ্র জেরুজালেমে যান। তখন তাঁর প্রধান শিষ্য ছিল মাত্র বারো জন। জেরুজালেমে ধর্মান্ধ ইহুদী সম্প্রদায় ফ্যারিসিদের চাপে এবং অত্যাচারী রোমান প্রতিনিধি পনটিয়াস পাইলেটের অন্যায়ের শিকার হয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তাঁর বিচার-প্রহসনে, ক্রুশ বহনের সময়ে কিংবা ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর শিষ্যরা পালিয়ে আত্মর'খায় ব্যস্ত ছিল। প্রাণত্যাগের আগে হতাশায় যীশু নাকি বলে উঠেছিলেন – ভগবান, তুমিও কি আমায় ছেড়ে চলে গেলে?

ঈশ্বরপুত্রের এই মর্মান্তিক পরিণতি মৃত্যুর বেশ কিছু পরে হলেও মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তারে সফল হয়েছিল। যীশু মাত্র তিন বছর প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতবাদ প্রথমে ইহুদী ধর্মের মধ্যেই ন্যাজারিন সম্প্রদায়ের মতবাদ হিসেবে গণ্য হচ্ছিল। রোমের আক্রমণে ৭০ খৃস্টাব্দে জেরুজালেম ধ্বংস হয়ে গেলে ইহুদীরা জাতি হিসেবে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। সেই সময় খৃস্টান সম্প্রদায় ইহুদীধর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়। যীশুকে নিয়ে গসপেল লেখা হয় তখন। তাঁকে অবতার হিসেবে তুলে ধরাও হয় ওই সময় থেকে।

মৃত্যুর আগে হারমন পাহাড়ে সেন্ট পিটার নাকি তাঁর মধ্যে দিব্য আলোক দেখেছিলেন। দেখেছিলেন দুজন অশরীরী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে। সেই দুজন ছিলেন নাকি মোজেস এবং ইলাইজা। দৈববাণী শুনেছিলেন – 'যীশু আমার পরম প্রিয় সন্তান। এঁর কথা তোমরা সর্বদাই মন দিয়ে শুনো।' এ কথা সেন্ট পিটার তাঁর শিষ্য সেন্ট মার্ককে বলে যান।

গসপেলে যীশুকে 'ঈশ্বরের বরপুত্র' বলা হয়েছে। সেন্ট জনের সুসমাচারে যীশুর উক্তি – 'আমি ও আমার পিতা একই।' (জন ১০ঃ৩০)

আরো বলেছেন – 'ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন(যে তাঁকে বিশ্বাস করবে, সে কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং অমরত্ব লাভ করবে।' (জন ৩ঃ১৬)

যীশু ছিলেন একজন মহান শিখ'ক ও মহাপু(ষ। তিনি ন্যায়নীতি বিষয়ে শি'খা দিয়েছেন। আচার আচরণ নিয়ে শি'খা দিয়েছেন। ঈশ্বরের কথা বলে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত ও অনুগামীরা যীশুর শি'খা অন্যান্য ধর্মশি'খা থেকে পৃথক করেন। তারা যীশুকে ধর্মপ্রবর্তক রূপে শ্রদ্ধা জানান।

গ্রীক ভাষায় 'ক্রাইস্ট' কথার অর্থ পরিত্রাতা। ইহুদী শব্দ 'মসীহা' মানেও পরিত্রাতা। যীশুকে পরবর্তী কালে পরিত্রাতা বলা হয়। সেই থেকে তাঁর নাম হয়েছে যীশু মসীহা, জেসাস ক্রাইস্ট – যীশুখৃস্ট। ইহুদী বা জুডা ধর্ম যে এক পরমেশ্বরের ধারণা প্রচার করেছিল, তিনি ও তাঁর অনুগামীরা সেই একজন পরমেশ্বরকে স্রষ্টা বলে গ্রহণ করেছেন। নতুন কোন ঈশ্বরের কথা বলেন নি। অবশ্য তাঁকে ইয়াওহে

বা জিহোভাও বলেননি। বলেছেন গড বা ঈশ্বর। সুতরাং খৃস্টধর্মে আমরা আসলে আরেকজন ঈশ্বর লাভ করি না। সেই একজনই প্রভু, একজনই সর্বশক্তিমান। তাঁকে পরম পিতা বলা হয়েছে। নিজেকে যীশু বলেছেন সেই পরম পিতার প্রেরিত সন্তান। আবার বিশ্বজগত সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা ওলড টেস্টামেন্টে দেওয়া হয়েছে তাই খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরাও গ্রহণ করেছেন। স্রষ্টা এক, তাঁর সৃষ্টিও এক।

ঐতিহাসিক যীশুর মায়ের নাম মেরি এবং পিতার নাম জোসেফ। আবার যীশুকে মাতা মেরির কুমারীসন্তান বলা হয়। পরবর্তীকালে মাতা মেরিকে জগন্মাতার মতো পূজনীয়া করে তোলা যীশুর ধর্মাবলম্বীদের বিশিষ্ট অবদান। বলা হয়েছে কুমারী মেরি পবিত্র ঐশী শক্তি (হোলি-ঘোস্ট) দ্বারা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। এভাবে খৃস্টানদের মধ্যেও সর্বশক্তিমান একজন ঈশ্বরের ধারণা থেকে ত্র(মে উদগত হয়েছে ত্রয়ী ঐশী শক্তির ধারণা। তাঁরা হলেন – পরমপিতা, তাঁর পুত্র যীশু মসিহা এবং এক পবিত্র আত্মা (হোলি ঘোস্ট)। কুমারী মেরিকে যুক্ত করলে চারজন ঐশীশক্তির খোঁজ পাই।

ইহুদী ধর্মচিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েও যীশুর ধর্মভাবনা মূল ইহুদী ধর্মভাবনা থেকে পৃথক হল। পরিচিত হল খৃস্টান বলে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে খৃস্টান ধর্মমত সবথেকে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে গৃহীত হয়েছে।

বাইবেলের বংশ পরম্পরা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আ'খরিক অর্থে তার হিসেব করলে নাকি দেখা যায় যে পৃথিবার জন্ম হয়েছে ৪০০৪ খৃস্ট পূর্বাব্দের ২৩শে অকটোবর সকাল ৯টায়। তার মানে ৬০১৪ বছর আগে এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। কিংবা শুধু পৃথিবী নয়, গোটা জগতের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৬৫০ সালে আর্চবিশপ জেমস আশার এই বিখ্যাত হিসেবটি করেছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ৬০১৪ বছর আগে?

ইহুদী-খৃস্টান ধর্ম ভাবনার পরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরো একটি ধর্মমত উদ্ভূত হয়েছিল। আরব ভূখণ্ড ইহুদী-খৃস্টান ধর্মের লালনভূমি থেকে খুব দূরে ছিল না। বলা যায় ইহুদী-খৃস্টান ঐতিহ্য থেকেও। এই ধর্ম ভাবনাটির আবির্ভাব হয়েছিল আরবের পার্বত্য মরুদেশে – রু'খখ' দেশের রু'খখ' ও যাযাবর বেদুইনদের কাছে। প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে সবার শেষে। তবু তা বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হয়ে উঠেছে। এই ধর্মের নাম ইসলাম যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত মহম্মদ।

যীশুর জন্মের আনুমানিক ৫৭৪ বৎসর পরে তিনি জন্মেছিলেন। পিতা ছিলেন আব্দুল্লাহ এবং মাতা আমিনা। জন্ম হয়েছিল মক্কা নগরীতে। মক্কা নগরী ছিল তখন এক বানিজ্যকেন্দ্র। নানা মানুষের বিচরণভূমি। ফলে নানা ধর্মের অনুষ্ঠান হত। ইহুদী-খৃস্টান একেশ্বরবাদী ধর্ম শুধু নয়, বহু-ঈশ্বরবাদী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচরণ পালিত হত।

আধুনিক অর্থে শি'খা বলতে যা বোঝায় তা তিনি লাভ করেন নি। পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে তিনি হিরা পর্বতের গুহায় গিয়ে মাঝে মধ্যে ধ্যান করতেন। ছত্রিশ বছর বয়সে (৬১০ খৃষ্টাব্দে) কোন এক মধ্য রজনীতে তাঁর কাছে কোরাণ উন্মুক্ত হয়। তাঁর চিন্তার মধ্যে সমুদ্রকল্লোলের মতো মহাশক্তিশালী কণ্ঠস্বর জাগ্রত হয়। মহম্মদের হৃদয়পটে সেই বাণী লিখিত হয়েছিল। সেই সকল বাণী তিনি শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেন। পরে তাঁর অনুগামীদের দ্বারা তা কোরাণে গ্রথিত হয়। হযরত মহম্মদ যে ধর্মের কথা বলেন সে ধর্ম আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর নবীদের এবং পূর্বপু(ষ ইব্রাহিমের। আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর বান্দাদের সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য।

যীশুর মত তিনিও ছিলেন একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরু(ষ। ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত এক মহামানব। তিনি বলেছেন একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা। তাঁকে ডেকেছেন 'আল্লাহ' বলে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহর আরেক নাম 'রহমান'। মহম্মদ এই আল্লাহ প্রেরিত একজন রসুল, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। 'আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান(তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনি আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যুগপৎ ব্যক্ত(ও অব্যক্ত(এবং তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।' (সুরা ৫৭।১।১-৩)

আরবী ভাষায় আল্লার বাণী (ওহি) উপনীত হয়েছে হজরত মহম্মদের কাছে আল্লাহর দূত জিব্রাইলের মারফৎ। কোরাণের মত অনুসারে – সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আগে আরো অনেক শি'খক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেমন ইব্রাহিম (আব্রাহাম), নূহ (নোয়া), মুসা (মোসেজ), ঈসা (যীশু) ইত্যাদি। শেষ নবী যাকে পাঠিয়েছেন তিনিই হজরত মহম্মদ। আল্লাহ এক এবং একমাত্র। তাঁর কোন অংশী নেই। কেননা তাহলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান থাকেন না। তাঁর কোন পুত্র হয় না। যীশু ঈশ্বর প্রেরিত পরম পিতার সন্তান – এ কথা ইসলামে মান্য নয়। কেননা আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে পারেন না।

জগৎ-সৃষ্টি সম্পর্কে ওলড টেস্টামেন্টে যেকথা বলা হয়েছে, ইসলামেও সেই একই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

'মানুষ (আদিতে) ছিল এক জাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন।' (সুরা ২।২৬।২১৩) 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য দেবতা নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি।' (সুরা ৩।১।২)

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করো এবং বল না যে, 'আল্লাহ তিন (জন)।' ... আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে – তিনি এর ঊর্ধ্বে।' (সুরা ৪।৬।২৩।১৭১)

চিত্র-১২। তুর্কি টালির উপর লিখিত কোরাণের বাণী।

'তিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন ভার্যা নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। .. তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূ'খখ'দর্শী(সম্যক পরিজ্ঞাত।' (সুরা ৬।১৩।১০১)

সৃষ্টি থেকেই হয় স্রষ্টার প্রমাণ। 'নিশ্চয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে তাদের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পাণি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর বায়ু সকলের প্রবাহের মধ্যে (দিক পরিবর্তনে) এবং এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমনাগমনের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (খোদার মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা ২।২।২০।১৬৪)

এ সকল সৃষ্টি এবং তার নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে।

'মহম্মদ রসুল ব্যতীত কিছু নয়(তাঁর পূর্বে বহু রসুল গত হয়ে গিয়েছে।' (সুরা ৩।১৫।১৪৪) 'মহম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পু(ষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সুরা ৩৩।২২।৫।৪০) 'আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?' (সুরা ২।৩।৩৪।২৫৫)

'বল, তিনি আল্লাহ, অদ্বৈত, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের নির্ভর(তিনি জনকও নন এবং জাতকও নন এবং তাঁর সমতুল কেউই নেই।' (সুরা ১১২।১)

'হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকের উচিৎ সে তার ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু করে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' (সুরা ৫৯।৩।১৮)

'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই র'খক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের অধিকারী। ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা ৫৯।৩।২২-২৪)

'আমি নূহ এবং ইব্রাহিমকে রসুলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও গ্রন্থ। কিন্তু ওদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশ ছিল সত্যত্যাগী। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলগণকে ও মরিয়মপুত্র ঈসাকে এবং তাঁকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম ক(ণা ও দয়া।' (সুরা ৫৭।৪।২৬-২৭)

ওলড টেস্টামেন্টে সৃষ্টির যে কাহিনী বলা হয়েছে ইসলামে তাই সমর্থন করা হয়েছে। ইহুদী-খৃস্টান ঐতিহ্য স্বীকার করা হয়েছে। 'আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করে নি।' (সুরা ৫০।৩।৩৮)

'তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। ... তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট রকমের পশু।' (সুরা ৩৯।১।৫-৬)

'আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি ... পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি ... আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারিবর্ষণ করি ... আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি। এবং পূর্বে অত্যুষ(বায়ুর উত্তাপ হতে জ্বিন সৃষ্টি করেছি।' (সুরা ১৪।২-৩। ১৬-২৬)

মৃত্যুর নয়দিন পূর্ব পর্যন্ত হযরত মহম্মদ নাকি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন। এক ইহুদী রমণীর বিষ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় ৬৩২ খৃস্টাব্দে তাঁর কর্মমুখর জীবনের অবসান হয়।

৩.৩। ঋক বেদের যুগে

নানা দেশের নানা ঈশ্বর ও দেবতার তত্ত্বতালাশ হল যাহক কিছুটা। সেসব দেশে সেকালের মানুষেরা এই আকাশ-ভরা সূর্য তারা নিয়ে গড়া জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে কে কেমন ভেবেছিল, তারও একটু হদিশ পাওয়া গেল। এবার ঘরে ফেরার পালা।

মিশরে নীল নদ, মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস আর চিনে হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীকে কেন্দ্র করে যেমন মানুষের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষেও সিন্ধুনদী ও তার শাখাপ্রশাখাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক সুপ্রাচীন নদীসভ্যতা। তা আর্য সভ্যতা নামে সুপরিচিত ।

আর্য সভ্যতার বিকাশের আগে প্রাক-আর্য প্রাক-বৈদিক সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। সত্যিই এই সভ্যতা প্রাক-আর্য কিনা তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সভ্যতা স্রেফ হরপ্পা সভ্যতা নামে এখন চিহি(ত। একদা তা ছড়িয়ে পড়েছিল গুজরাট থেকে পাঞ্জাব-উত্তর প্রদেশ হয়ে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত আর পশ্চিমে আফগানিস্তান।

সে সময়ের ইতিহাস কেউ লিপিবদ্ধ করে যাননি। লিপির প্রচলন ছিল কিন্তু সে লিপির যতটা নমুনা মিলেছে তা থেকে ভাষা উদ্ধার করা যায় নি। ফলে অজানা থেকে গিয়েছে আরো অনেক কথা। এই সভ্যতা সুমের-ব্যবিলন-মিশরের সমসাময়িক। পুরাতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে সেদিনের যা কিছু আবিষ্কার করেছেন তা থেকে অখণ্ড ভারতের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার কিছু খবর মেলে।

চিত্র-১৩। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত শিলমোহরে দেবমূর্তি।

ধর্ম ও পূজা সেই প্রাচীন যুগেও ছিল নিশ্চয়ই। হরপ্পা সভ্যতায় বোধ হয় প্রচলিত ছিল মাতৃপূজা ও শিবপূজা বা অনুরূপ কোন অর্চনা। এ ছাড়া প্রাকৃতিক শক্তি(যেমন সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃ'খ, আকাশ, পাহাড় ইত্যাদির পূজা তো যে কোন জনজাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত থাকে। এদের মধ্যেও ছিল বলে অনুমান করা যায়।

আর্য সভ্যতার প্রাথমিক বিস্তার কালেরও কোন ইতিহাস নেই। ভারতীয় সভ্যতার প্রথম পরিচয় মেলে ঋগ্বেদ থেকে। তা রচিত হয়েছে সম্ভবত আর্যদের কিছুটা থিতু হয়ে বসার পরে। যুদ্ধবিগ্রহের রেশ তখনো কাটে নি। তাই বোধ হয় যোদ্ধা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা ও তাঁর মহিমা কীর্তন করা ছিল অব্যাহত।

বেদ ভারতীয় সভ্যতার আদি গ্রন্থ। হিন্দুদের শাস্ত্র। এই বেদ কেন্দ্র করে যে সভ্যতা তাই বৈদিক সভ্যতা। 'বিদ' কথাটির অর্থ জানা। ফলে বিদ ধাতু হতে নিষ্পন্ন বেদ কথাটি জ্ঞানার্থক। বলা হয় বেদ অপৌরুষেয় – ঈশ্বর প্রদত্ত। বেদগ্রন্থকে এভাবে স্বীকার করে নিলে তাকে বলা হয় আস্তিক। অস্বীকার করলে নাস্তিক। চারখানি বেদের কথা আমরা জানি। তার মধ্যে প্রথম রচিত হয়েছিল ঋক বেদ। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় নানা ঋষির সূক্তে সমৃদ্ধ হয়ে। প্রকৃতিজগতের যেখানে যত শক্তি বা সৌন্দর্যের উৎস আছে তাতেই দেবত্ব আরোপ করে স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। সেই সব স্তোত্র নিয়েই বেদ। আমাদের সন্ধান শু(এই ঋগ্বেদ থেকে।

'দেব' কথাটির মানে কি? যিনি দান করেন বা যিনি দীপ্ত হন বা দ্যোতিত হন তিনিই দেব। আবার যিনি দ্যুস্থানে অর্থাৎ স্বর্গে থাকেন তিনিও দেব। কিন্তু এমন ব্যাখ্যায় একটা সমস্যা আছে। ঋগ্বেদের যুগে দেখা যাচ্ছে যে, সকল দেবতা স্বর্গে থাকেন না। যেমন, পৃথিবীর দেবতা অগ্নি পৃথিবীতে এবং অন্তরীখে'র দেবতা ইন্দ্র অন্তরীখে' রয়েছেন। স্বর্গবাসী না হলেও তাঁদের দেবতা না বলার কোন উপায় নেই। মনে হয়, দেব সংজ্ঞার অর্থ তাই কিছুটা শিথিল না করলেই নয়। অথবা সংজ্ঞা নিয়ে এতটা মাথা না ঘামালেও চলে হয়তো। আমাদের ল'খ্য ভিন্ন।

ঋগ্বেদে আমরা অনেক দেবতার কথা জানতে পাই। সংখ্যায় তাঁরা তেত্রিশ হতে পারে কিংবা ৩,৩৩৯ জন হতে পারে। কোন সূত্রে বলা হয়েছে তেত্রিশ জন। অন্য সূত্রে ৩,৩৩৯ জন। (সূত্র ৮।২৮।১, ৩।৯।৯ এবং ১০।৫২।৬)

ঋগ্বেদে আমরা ঊনত্রিশ জন দেবতার নাম পাই। এঁরা হলেন – ইন্দ্র, অগ্নি (যার মধ্যে ইধ্ম্য, তনূনপাৎ, অপাংনপাৎ, মাতরিশ্বন, জাতবেদা, নরাশংস, বৈশ্বানর ইত্যাদিরা আছেন), মিত্র, বরুণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পূষণ, আদিত্যগণ (অর্থাৎ অদিতির সন্তানেরা), ব্রহ্মণস্পতি, দ্যৌ, রাত্রি, (দ্র, বায়ু, সবিতা, অদিতি, যম, অশ্বিদ্বয়, ভগ, ত্বষ্টা, ঊষা, অর্জমা, পৃথিবী, সোম (সোমলতা), অপ্‌গণ, পর্জন্য, সরস্বতী (নদী), সূর্য (সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু(), বিশ্বকর্মা (ত্বষ্টা) ও প্রজাপতি।

পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক দেবতার মধ্যেও একজন পরমেশ্বরের ভাবনা অঙ্কুরিত হতে দেখা গিয়েছে (সূত্র ১০।১২৯।৭)। যাই হোক এই সকল দেবতারা সাধ্যদের সঙ্গে স্বর্গে বাস করেন।

আরো কথা আছে। ২।২৭ সূত্রমতে আদিত্যগণ বলতে আমরা ছয়জন আদিত্য আছেন বুঝতে পারি। তাঁরা হলেন – মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দখ' এবং অংশ। অন্যত্র বলা হয়েছে আটজন আদিত্যের কথা – ধাতা, অর্যমা, মিত্র, ভগ, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান এবং অংশ। এখানে দুজন নবাগত ধাতা এবং বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে বারোজন আদিত্যের কথা আছে। এই সকল আদিত্যদের পৃথক দেবতা হিসেবে গণ্য করতে চাইলে মোট দেবতার সংখ্যা বাড়বে।

'দ্যৌ' মানে পৃথিবী কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দ্যৌ-এর সঙ্গে যুক্ত পৃথিবী বন্দনায় পৃথিবী অবম বা সর্বনিম্নলোক এবং দ্যৌ পরম বা সর্বোচ্চ স্থান এমন ভাবা হয়েছে। এককভাবে পৃথিবী সম্পর্কে ৫।৮৪ সূক্তে উল্লেখ আছে। দ্যুকে আবার বিশ্বের পিতা এবং পৃথিবীকে বিশ্বের মাতা বলা হয়েছে। দ্যৌ যেন গ্রীসে জিউস, ইটালিতে জুপিটার আর টিউটনিক জাতির কাছে টায়ার বা টাই হয়ে উঠেছিল।

যারা ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন তারা প্রধানত পশুপালক ছিলেন। চাষবাস ও কারিগরি বিদ্যা জানা ছিল কিন্তু প্রথমে তা অপ্রধান ছিল বলে মনে হয়। রচিত সাহিত্যে পার্থিব সম্পদের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। পশু, অন্ন, ধন, সন্তান ও নিরাপত্তার জন্য আকুতিই বিশেষভাবে ল'খ্যনীয়। বৈদিক দেবতাদের স্তুতি বা প্রশস্তি করা হয়েছে যেন তাঁরা সম্পদলাভে প্রার্থীগণকে সাহায্য করেন। অধিকাংশ সুক্তের মূল সুর তাই। কিছু সূক্তে বিশেষ করে ১০ম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে দার্শনিক ভাবনার উদয় হয়।

ঋগ্বেদের ভাষা অতি প্রাচীন বলে অর্থনির্ণয় করা দুরূহ কাজ। অনেক শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে ভিন্ন হয়েছে। অর্থ বিপর্যয়ে নানা ব্যাখ্যার অবতারণা হয়। যেমন ঋগ্বেদে 'ভগ' মানে পার্থিব ধনসম্পদ বা তার অংশ (ভাগ)। ভগবান মানে ধনবান। আমরা এখন ভগবান বলতে স্রষ্টা ঈশ্বরকে বুঝি। 'ঈশ্বর' কথার প্রতিশব্দ চারটি – রাষ্ট্রী, অর্য, নিযুত্বৎ এবং ইন। 'ব্রহ্ম' অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা। 'ব্রহ্মা' মানে স্তুতিকারী পুরোহিত। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বলতে বোঝায় স্তুতিদেব। নিঘন্টু মতে 'ব্রহ্মণ' অর্থ অন্ন বা ধন। বেদান্তে ব্রহ্মের অর্থ দাঁড়িয়েছে চিন্ময় পরমপিতা।

সেই প্রাচীন ঋগ্বেদের কালে বরুণ এক মহান দেবতা ছিলেন। 'বৃ' ধাতুর অর্থ আবরণ করা তা থেকে বর ও বরুণ মানে আচ্ছাদনকারী। গ্রীকদের আওরানোস এবং আবেস্তার অহুরমাজদার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য অনেক। এই আকাশ দেবতা জগতের নায়ক স্বরূপ। তিনি জল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নির্দেশে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং পৃথিবী শস্যমণ্ডিত হয়। তিনি বিশ্বকে কোলে ধারন করেছেন। তিনি সূর্যকে নির্মাণ করেছেন। সমুদ্রকে স্থাপন করেছেন। ভুবনসমূহের ধারক ও সপ্তসিন্ধুর ঈশ্বর তিনি। তিনি সমস্ত ভুবনের সম্রাট।

১ম মণ্ডলের ২৫-তম সূত্রে প্রথম ব(ণ দেবতাকে কিভাবে স্তুতি জানানো হচ্ছে দেখা যাক। শুনঃশেপ ঋষি বলছেন – 'হে বর্‌ণ! অনাদর করে হননকারী হয়ে আমাদের বধ কর না, ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ কর না। হে বর্‌ণ! রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে (পরিতৃপ্ত করে), আমরা সুখের জন্য সেরূপ স্তুতিদ্বারা তোমার মন প্রসন্ন করি। পখি'গণ যেরূপ নিবাসস্থানের দিকে ধাবিত হয়, আমার ক্রোধরহিত চিন্তাসমূহ সেরূপ ধনপ্রাপ্তির জন্য ধাবিত হচ্ছে। বর্‌ণ বলবান, নেতা ও বহুলোককে দর্শন করেন, কবে আমরা সুখের জন্য তাঁকে আনতে পারব? যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে (মিত্র ও বর্‌ণ) এই সাধারণ হব্য গ্রহণ করেছেন, অগ্রাহ্য করেন না।

চিত্র-১৪। বর্‌ণদেব।

'যিনি অন্তরীখ'গামী প'খীদের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকাসমূহের পথ জানেন। যিনি ধৃতব্রত হয়ে স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় তাও জানেন। যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন, উপরে যাঁরা বাস করেন তাঁদেরও জানেন। ধৃতব্রত ও শোভনকর্মা বর্‌ণ স্বর্গীয় সন্ততিদের মধ্যে সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য এসে উপবেশন করেছেন। জ্ঞানবান লোক তাঁর প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যা সম্পাদিত হয়েছে বা হবে সমস্তই দেখতে পান। সে শোভনকর্মা অদিতিপুত্র আমাদের সকল দিনই সুপথগামী ক(ন, আমাদের আয়ু বর্ধন কর্‌ন।

'বর্‌ণ সুবর্ণপরিচ্ছদ ধারণ করে আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি চারদিকে বিস্তৃত হয়। বৈরিগণ যার প্রতি বৈরতা করতে পারেন না, মনুষ্যপীড়কগণ যাঁকে পীড়া দিতে পারে না, পাপীরা যে দেবের প্রতি পাপাচরণ করতে পারে না। যিনি মানুষের জন্য, আমাদের উদরের জন্য যথেষ্ট অন্ন প্রস্তুত করেছেন। বর্‌ণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট। গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায় আমার চিন্তা নিবৃত্তি রহিত হয়ে তাঁর দিকে যাচ্ছে। হে বর্‌ণ! যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হয়েছে, হোতার ন্যায় তুমি সে হব্য ভ'খণ কর, পরে আমরা উভয়ে আলাপ করব।

'সকলের দর্শনীয় বর্‌ণকে আমি দেখেছি, ভূমিতে তাঁর রথ বিশেষ করে দেখেছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন। হে বর্‌ণ! আমার এ আহ্বান তুমি শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার র'খণাকাঙ্খী হয়ে আমি ডাকছি। হে মেধাবী বর্‌ণ! তুমি

দ্যুলোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রয়েছ, আমাদের খে'মপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণ করে তুমি উত্তর দাও। আমাদের পাশ উপর দিয়ে খুলে দাও, মধ্যের পাশ খুলে দাও, নীচের পাশ খুলে দাও যেন আমরা জীবিত থাকি।' (ঋক।১।২৫)

বর্‌ণদেবতার রূপ ত্র(মাগত আদর্শায়িত হতে হতে বেদের সর্বোচ্চ নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। বর্‌ণ হয়েছিলেন ঋতের নায়ক।

বর্‌ণের কথায় মিত্র দেবতার কথাও এসে পড়ে। অনেক স্তোত্রে মিত্রাবর্‌ণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। বর্‌ণ আর মিত্র অদিতির সন্তান – তাই আদিত্য। 'দিত' ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে ব্যবহৃত হয়। যা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম তাই অদিতি। অদিতি মানে অনন্ত প্রকৃতি, অনন্ত আকাশ, অদিতি মাতা, তিনি পিতা, তিনি পুত্র, সকল দেব, পঞ্চ লোক (গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর ও নিষাদ), জন্ম ও জন্মের কারণ। অদিতির মধ্যে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির আদিরূপ প্রচ্ছন্ন মনে হয়।

চিত্র-১৫। ইন্দ্রদেব।

ঋগ্বেদের কালে সর্বোচ্চ সম্মানিত ও বন্দিত দেবতা যদি কেউ থাকেন তো তিনি ইন্দ্র। তাঁর উদ্দেশে ২৫০টি সূক্ত নিবেদিত। ইনি এক দুর্দমনীয় যোদ্ধা – অহি বা বৃত্রকে সংহার করে মেঘে অব(দ্ধ বারিধারা মুক্ত করেন, শুষ(দানবকে বধ করেন, আর্যজাতির র'খায় দস্যু হত্যা করেন। নগর বা পুর ধ্বংস করেন বলে তাঁর নাম পুরন্দর। অগ্নি ও পুষা তাঁর ভাই। মর্‌ৎগণ সহায়। ত্বষ্টা তাঁর জন্য লৌহ বা পাথরের বজ্র নির্মাণ করে দেন। দুটি হরিৎবর্ণ অশ্ববাহিত স্বর্ণরথে তিনি আরূঢ় থাকেন।

প্রথম যে সূক্তে ইন্দ্রের অর্চনা করা হয়েছে, সেই ১ম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তটি আমরা বর্ণনা করব। ঋগ্বেদের ঋষিদের আকুল আকুতির প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হব। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বলছেন – 'যেরূপ দোহক দোহনহেতু সুদুগ্ধবতী গাভীকে আহ্বান করে, আমরাও সেরূপ র'খা করার জন্য শোভনকর্মা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। হে সোমপায়ী ইন্দ্র! আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোমপান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর। আমরা যেন তোমার সমীপবর্তী সুমতিদের মধ্য থেকে তোমাকে জানতে পারি। আমাদের অতিক্রম করে অন্যের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করো না, আমাদের নিকট এস। অজেয় ও মেধাবী ইন্দ্রের সমীপে যাও। এ মেধাবীর কথা জিজ্ঞাসা কর। সে ইন্দ্র, তোমার বন্ধুদের শ্রেষ্ঠ ধনদান

করেন। আমাদের ঋত্বিকেরা ইন্দ্রের পরিচর্যা করে তাঁকে স্তুতি করুন। হে নিন্দুকগণ! এ দেশ হতে ও অন্য দেশ হতে দূর হয়ে যাও। হে শত্রুখ'য়কারক! শত্রুও যেন আমাদের সৌভাগ্যশালী বলে। আমাদের মিত্রপ'খীয় মনুষ্যরা তো বলবেই। যেন আমরা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সুখে বাস করি। এ সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদস্বরূপ, এ মানুষকে হৃষ্ট করে, কার্যসাধন করে এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা। যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে এ দান কর। হে শতক্রতু! এ সোমপান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের হনন করেছিলে, যুদ্ধে র'খা করেছিলে। হে শতক্রতু! তুমি সে যোদ্ধা! হে ইন্দ্র! ধনলাভের জন্য তোমাকে অন্নবান করি। যিনি ধনের র'খক এবং মহান, যিনি কর্মের পূরয়িতা এবং অভিষবকারীর সখা, সে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে গাও।' (ঋক।১।৪)

ন্যায়পরায়ণ বরুণের আধিপত্য যেন দুর্ধর্ষ ইন্দ্রের কাছে পরের দিকে খর্ব হয়েছিল। আর্যগণ ক্রমশ ইন্দ্রের মতো সমর্থ যোদ্ধার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। ৪র্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্ত বরুণ বলছেন – 'আমি বলবান ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার। আমি রূপবান ও অস্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ আমার যজ্ঞসেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা।'

আর ইন্দ্র বলছেন – 'সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাগণ আমাকে অনুগমণ করে। তারা বৃহ হয়ে সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান ইন্দ্র হয়ে যুদ্ধ করি। আমি অভিভবকর বলশালী, আমি সংগ্রামে ধূলি উত্থিত করি। আমি এ সমস্ত কর্ম করেছি। আমি অপ্রতিহত দৈব বলযুক্ত, কেউ আমাকে নিবারণ করতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উকথ সমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই চলিত হয়।'

অগ্নি দেবতার উদ্দেশে সূক্ত রয়েছে ২০০র উপর। অগ্নি ল্যাটিনে 'ইগ্নিস'। ১ম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটিই অগ্নিদেবতার উদ্দেশে। 'অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান। অগ্নি দেবগনের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।' অগ্নি দূতকার্য করেন, দেবতাদের আহ্বান করেন এবং আনয়ন করেন।

সূর্যকে দেবতা জ্ঞান করা সকল মানব সভ্যতায় প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই এক স্বাভাবিক ঘটনা। তাঁর নামে ১০টি স্তোত্র আছে। ঋগ্বেদের সময় তাঁর সঙ্গে আরো দুজন দেবতার নাম জড়িয়ে আছে। তাঁরা হলেন সবিতা ও বিষু(। এঁরা তিনজনে একই দেবতা বলে মনে হয়। সূর্য হরিৎ নামে সাতটি অশ্বীবাহিত বেগবান রথে আকাশপথে চলেন। সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত। প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র (৩।৬২।১০) সূর্যের উদ্দেশে সবিতার নামে রচিত।

বিষু(তিন পদখে'পে সমস্ত ভুবন জুড়ে অবস্থান করেন। তিনি সকলের স্বামী,

পালনকর্তা, শত্রুরহিত এবং সেচনসমর্থ। তিনি চিরকুমার ও চিরতরুন। তাঁরপৌরুষ। বিষু(গতিবিশেষ দ্বারা বৎসরের চর্তুনবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকার পথে চালিত করেছেন। (১।১৫৫) চর্তুনবতি মানে ৪ গুণ ৯০ দিন অর্থাৎ ৩৬০ দিন। পরবর্তীকালে এই বিষু(তিন প্রধান দেবতাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছেন। বিষু(থেকে বিস্তৃত হয়েছে বৈষ(ব সম্প্রদায়।

মিত্র পৃথিবী ও দ্যুলোকের ধারক। অনিমেষলোচনে সকলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। ভোরে সূর্যোদয় হলে সুবর্ণরথে আরোহণ করেন। সূর্য এই মিত্র ও বরুণের চ'খুস্বরূপ। কখনো মনে হয় মিত্র সূর্যের আনুষঙ্গিক কোন দেবতা।

ঋগ্বেদে শিবের উল্লেখ নেই তবে রুদ্রের নামে তিনটি সূক্ত আছে। এই রুদ্র পরবর্তীকালে শিবে রূপান্তরিত কিনা সে প্রশ্ন জাগে। রুদ্র উগ্র স্বভাবের দেবতা, ক্রোধপরায়ণ কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষক। মরুৎগণের পিতা হলেন রুদ্র এবং মাতা পৃষি((অর্থাৎ ঝড়ের মেঘ)।

অন্তরীখে'র পুত্র হলেন পর্জন্য যিনি মেঘ দিয়ে অন্তরীখ' ব্যাপ্ত করেন। মেঘ হতে বারি বর্ষণ করে জগতের হিত সাধন করেন। পর্জন্য আদি অর্থে মেঘ পরে বজ্রধারী ও বৃষ্টিধারী দেবতা হন। লিথুয়ানিয়ায় বজ্রদেবতা ছিলেন পারকুনাস। পর্জন্যর সঙ্গে ল'খ্যনীয় মিল।

পূষা সূর্যের সুবর্ণ রথ পরিচালনা করছেন। কখনো দূতের কাজ করছেন। রাত্রি তাঁর পত্নী আর ঊষা তাঁর ভগিনী। আবার শুভ্রবর্ণা ঊষা আকাশ-দুহিতা এবং সূর্যের পত্নী। কখনো অবশ্য তাঁকে আদিত্য কন্যাও বলা হয়েছে। গ্রীকদের এয়স-এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। ঊষা অরুণ অশ্বযুক্ত হয়ে রথে চড়ে সূর্যের গমনপথ প্রস্তুত করে দেন। রাত্রিও আকাশ দুহিতা এবং কৃষ(বর্ণা। ঊষা ও রাত্রি পরস্পর বিরোধমুক্ত – একই পথে যাত্রা তাঁদের।

বৃহস্পতি মন্ত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মণস্পতি মন্ত্রের স্বামী, পুরোহিত, এবং মন্ত্র সুন্দরভাবে উচ্চারণে স'খম।

যম মৃতলোকের রাজা, পিতৃলোকের রাজা। কিন্তু তাঁর অবস্থান স্বর্গে। প্রেতাত্মাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তিনি। যম ও যমী দুই ভাইবোন। পিতা গন্ধর্ব (সূর্য ?) এবং মাতা আপ্যাঘোষা (সরণ্যূ বা সূর্যপত্নী ঊষা)।

দেবতা হিসেবে পূজ্য – বায়ু, অপ বা জল, মরুৎগণ, অর্জমা, ত্বষ্টা, সরস্বতী (নদী)। অশ্বিযুগল নামের যুগল দেবতাকে নিয়ে ৫০টি সূক্ত আছে। ত্রিকোন-রথ-চারী এই দেবতার স্বরূপ বুঝতে সমস্যা হয়। ইনি আকাশে আবির্ভূত হন এবং ঊষা তাঁর অনুসরণ করে চলে। তাঁরা চ্যবনঋষিকে জরামুক্ত করেছিলেন। এবং ধজ্রাশ্বকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিষক। সূর্যর দুহিতা সূর্যাকে

বিয়ে করেছিলেন।

বিশ্বকর্মা, পু(ষ, আত্মা, অ'খর ও প্রজাপতি – ঈশ্বরস্বরূপ। এঁদেরও উল্লেখ আছে দেবতাদের দীর্ঘ তালিকায়।

সোম জাতীয় লতা থেকে উৎপন্ন হয় যে সোমরস তা আর্যদের অতি প্রিয় উত্তেজক পানীয়। অতি প্রিয় তাই দেবতা স্থানীয়। সোম আবেস্তার হওমা এবং গ্রীসের ডায়োনাইসসের সমতুল। ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত সোমের উদ্দেশে রচিত। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হয়ে স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে 'খরিত হও।

অনেক গৌণ দেবতা স্তুত হয়েছেন। যেমন পর্বত, ওষধি, বনস্পতি, অরণ্যানী, সোম নিস্কাশনের পাথর, তীরধনুক জাতীয় অস্ত্র।

ঋগ্বেদে সবথেকে বেশি সূক্ত ইন্দ্রকে নিয়ে, তারপর অগ্নি ও সোমলতা। অথচ গুরুত্বের হিসেব কষলে বরুণ দেবতাকে সামনের সারিতে বসাতে হবে। নিরুক্তকার যাস্ক তিনজন দেবতাকে প্রধান বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা হলেন – অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য। এঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার আসনের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী। কখনো বরুণকে প্রধান দেবতা বলে মনে হয়, আবার কখনো ইন্দ্রকে।

সমাজবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিকূল শক্তি থেকে আত্মর'খার জন্য শক্তিমান সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। শুধু আত্মর'খা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও বৃহত্তর শক্তির কাছে সহায়তা প্রার্থনা করা হয়। সেই প্রয়োজনের খাতিরে নানা দেবদেবতার আবিষ্কার। সেই প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই ঈশ্বরের সন্ধানে মানুষের যাত্রা। প্রথমাবস্থায় তাই বহুদেবতাবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায়ও এরকম ঘটেছিল।

ঋগ্বেদের একটা পর্যায় এসে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। বহুদেবতার জায়গায় এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পদধ্বনি শোনা যায়। কয়েকটি বিশেষ সূক্তে এই জাতীয় সূক্তগুলো সবই প্রায় দশম মণ্ডলে সংগৃহীত। এই দশম মণ্ডল পরবর্তীকলের রচনা। অনেকে এই দশম মণ্ডলের সূক্তের প্রাচীনত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সর্বপ্রাচীন ২-৭ম মণ্ডল, তারপর ১ম ও ৯ম মণ্ডল। সবার শেষে ১০ম মণ্ডল।

যাই হোক ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে খোঁজ পাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিয়ে ভাবনার। ভারতীয় ধর্ম সেই প্রথম সর্বেশ্বরবাদের পরিবর্তে একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। বিশ্বে ব্যাপ্ত আছে এক সর্বব্যাপী সত্তা। তিনি ব্রহ্ম বা ভূমা বা আত্মা এই অভিধায় চিহ্নি(ত। ঋক বেদের এই জাতীয় ভাবনার বীজ কালে কালে পল্লবিত হয়েছে উপনিষদের যুগে। আমরা ঈশ্বরীয় ভাবনার প্রথম উদয় হয়েছিল যে সকল

সূক্তে , সেখানে ঈশ্বর কেমন করে আহুত হয়েছিলেন তা জ্ঞাত হব।

শুরু করা যাক ৮১তম সূক্ত বা বিশ্বকর্মা সূক্তটি দিয়ে। এই সূক্তের দেবতা বিশ্বকর্মা এবং রচনা করেছেন যে ঋষি তাঁর নামও বিশ্বকর্মা। বলছেন তিনি -- 'আমাদের পিতা যে যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করতে বসেছিলেন, তিনি অভিলাষ সহকারে ধনের কামনা করে প্রথমে আগত ব্যক্তিদের আচ্ছাদন করে পশ্চাৎ আগতদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন। সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান কি ছিল? কোন স্থান হতে তিনি কিরূপে তিনি সৃষ্টিকর্ম আরম্ভ করলেন? সে বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ করে প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন। সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চ'খু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পা, ইনি দুহাতে এবং বিবিধ পখ' সঞ্চালন করে নির্বান করেন তাতে দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়। সে কোন বন? কোন বৃখে'র কাষ্ঠ? যা হতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হয়েছে? হে বিদ্বানগণ, তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করে দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন?

'হে বিশ্বকর্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের বলে দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্ট কর। হে বিশ্বকর্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্ট কর। চতুর্দিকের সকল লোক নির্বোধ। ইন্দ্র আমাদের .. বুদ্ধিস্ফূর্তি করে দিন। অদ্য এ যজ্ঞে সে বিশ্বকর্মাকে র'খার জন্য ডাকছি, তিনি বাচস্পতি (বাকের অধিপতি), মন তাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তাঁর কার্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদের সকল যজ্ঞ স্বীকারপূর্বক আমাদের র'খা করুন।'

পরের সূক্তে বলা হল --'সে সুধির পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টিদান করে, মনে মনে আলোচনা করে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এ দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হয়ে উঠল তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হয়ে গেল। যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির পরবর্তী যে স্থান সেখানে তিনি একাকী আছেন, বিদ্বানগণ এরূপ বলেন। সে বিদ্বানদের অভিলাষ সকল অন্ন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করে (বহু দেবতা হন)। অন্য সকল ভুবনলোকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হয়।

'স্থাবর ও জঙ্গম স্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠিত হওয়ার পরে যে সকল ঋষি এ সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ অনেক স্তব করতে করতে ধন ব্যয়

করে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। যা দ্যুলোকের অপর পারে, যা এ পৃথিবী অতিত্র(ম করে বিদ্যমান আছে, যা অসুর দেবগণকে অতিক্রম করে আছে, জলগণ এমন কোন গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থেকে পরস্পরকে একস্থানে মিলিত হতে দেখছে? সে অজাত পুর্ুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, এই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করেছিল, এর মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সা'খাৎ করেন। যিনি এ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না, তোমাদের অন্তঃকরণ তা বুঝবার 'খমতা প্রাপ্ত হয়নি। কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে লোকে যেমন নানা প্রকার জল্পনা করে, তারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তবস্তুতি উচ্চারণ করে বিচরণ করে।'

উপরের সূক্তটির মধ্যে সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর-ভাবনার ল'খণ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি বিশ্বকর্মা নামে উল্লিখিত হয়েছেন। দেবকারিগর বিশ্বকর্মা পরবর্তীকালের এক নিম্নশ্রেণির দেবতা। কিন্তু এখানে বিশ্বকর্মা স্রষ্টা। প্রকৃতির নানা শক্তির নিয়ন্তা। তিনি বুঝি শূন্য থেকেই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে বুঝে ওঠা কঠিন। মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে নানা জল্পনা করে মাত্র।

আরেকটি মূল্যবান সূক্ত হল ১২১ সূক্ত(যা ক নামধারী প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত এবং রচনা করেছেন হিরণ্যগর্ভ ঋষি। অপে'খাকৃত আধুনিক এই সূক্তটিতে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব আছে। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা তৃপ্ত করা হবে যিনি সর্বভূতের অধিশ্বর সেই দেবতাকে ছাড়া আর কে পূজিত হতে পারেন!

'সর্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত হয়েই সর্বভূতের অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপন করলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাসম্পন্ন।

'কোন দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করব? যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয় সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এ সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? যাঁর মহিমা দ্বারা এ সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লিখিত হয়, এ সকল দিগ্বিদিক যাঁর বাহুস্বরূপ।

'কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করে রেখেছেন, যিনি অন্তরি'খলোক পরিমাপ করে রেখেছেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? দ্যাবা পৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা

স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল এবং সে দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পারল, যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? প্রভূত পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, তারা গর্ভধারণ করে অগ্নিকে উৎপন্ন করল এবং তা হতে দেবতাদের একমাত্র প্রাণ স্বরূপ যিনি আবির্ভূত হলেন।

'কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? যখন জলরাশি বলধারণ করে অগ্নিকে উৎপন্ন করল, যখন তিনি নিজ মহিমাদ্বারা সে জলের উপরে সর্বভাগে নিরী'খণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হলেন? কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা যাঁর ধারণ'খমতা যথার্থ (বা অপ্রতিহত), যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকরা প্রভূত পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের যেন হিংসা না করেন।

'কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এ সমস্ত আয়ত্ত করে রাখতে পারে নি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।'

দশম মণ্ডলের ১২৫-তম সূক্তের নাম আত্মাসূক্ত। এখানে দেবতা আত্মার মধ্যে এমন এক সত্তার খোঁজ করা হয়েছে যা সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছে। সেই পরমাত্মাকে নিয়ে বলা হচ্ছে -- 'আমি র্দ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বর্ুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। যে সোম প্রস্তর দ্বারা পিষ্ট হয়ে উৎপন্ন হয়, আমিই তাকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষাকে ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করে এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের ভালো করে সন্তুষ্ট করে আমিই তাকে ধনদান করি। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তুসকল বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ ভাবে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তায় সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা 'খয় হয়ে যায়।

'হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য। দেবতারা ও মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। র্দ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই

যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোক ও ভূলোক আবিষ্ট হয়ে আছি। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তক স্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তরিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হয়েছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে।'

দশম মণ্ডলের ৯০ সংখ্যক সূক্তটিকে পুরুষসূক্ত বলে। এই সূক্তটি যখন রচিত হয় তখন আর্যসমাজ ব্রাহ্মণ-'খত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চার বর্ণে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ঋক-সাম-যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ পৃথক করা হয়েছে। ব্যাকারণবিদগণ সূক্তের ভাষাও পরবর্তীকালের বলে সাব্যস্ত করেছেন। এখানে এক বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত সত্তাকে পুরুষ এই নামে কল্পনা করা হয়েছে। তিনিই স্রষ্টা ও ঈশ্বরস্বরূপ। কি তাঁর স্বরূপ?

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রা'খঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।। 'পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চ'খু, ও সহস্র চরণ, তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমিত হয়ে বিরাজমান।

'যা হয়েছে অথবা যা হবে সকলই সে পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহন করেন। তাঁর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপে'খাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর তাঁর তিন পাদ। পরুষ আপনার তিন পাদ নিয়ে উপরে নিয়ে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইল। তিনি তদনান্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। তিনি হতে বিরাটের জন্ম হল এবং বিরাট হতে সেই পুরুষ। তিনি জন্মগ্রহণ করে পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন।

'যখন পরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল, শরৎ হব্য হল। যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপ সে বহি(তে পূজা দেওয়া হল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। সে সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হল। তিনি যে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তারা বন্য এবং গ্রাম্য। সে সর্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হল, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ করল। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্তপঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মাল। তা হতে গাভী ছাগ ও মেষগণ জন্মাল।

'পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল, কয় খণ্ড করা হয়েছিল? এর মুখ কি হল, দু হস্ত, দু উরু, দু চরণ কি হল? এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা

বৈশ্য হল, দু চরণ হতে শূদ্র হল। মন হতে চন্দ্র হলেন, চ'খু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভুবনসকল নির্মাণ করা হল। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হল এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হল। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তাই সর্বপ্রথম ধর্মের অনুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।'

বিশ্বজগতের নিয়ন্তার এবম্বিধ রূপকল্প আমাদের বিস্মিত করে। তিনি পুরুষ, তা থেকে বিরাট এবং তা থেকে পুরুষ হল। আর সেই পুরুষ যজ্ঞে বলিস্বরূপ অর্পিত।

দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্ত কে বলা হয় নাসদীয় সূক্ত। এই সূক্তে সৃষ্টির আদি কারণ সম্পর্কে আর্য ঋষিদের ভাবনা আছে। সৃষ্টির পূর্বে রয়েছেন তিনি পরমাত্মা। তখন অবস্থা কি ছিল? প্রকৃতির যে কার্য ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেবতাজ্ঞানে অর্চনা করে এসেছেন -- তাঁরা তো আদি দেব নন। তাঁরাও সৃষ্ট তবে আদি কারণ কি? আদি কে? সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বুঝি মানুষের অসাধ্য। তাই 'এটা নয় ওটা নয়' এভাবে বর্ণনার চেষ্টা। কাব্যময় সূক্তটি এরকম -- 'সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি-দূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ করে রাখে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল তিনি একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। কোথাও কোন চিহ্ ছিল না, সমস্তই চিহ্(বর্জিত ছিল। আর চতুর্দিক ছিল জলময়। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা তিনি সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন।

'তপস্যার প্রভাবে তিনি এক বস্তু জন্মাল। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা করে অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করলেন। রেতোধা পরুষের উদ্ভব হল, মহিমা সকল (পঞ্চভূত) উদ্ভূত হল। ওদের রশ্মি দুপাশে ও নিচের দিকে এবং উপরের দিকে বিস্তারিত হল, নিচের দিকে স্বধা (অন্ন) রইল, প্রয়তি (ভোক্তাপুরুষ) উপরের দিকে রইলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মাল? কোথা থেকে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর জাত হয়েছেন। কোথা হতে হল তা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, তা তিনিই জানেন যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন!

অথবা তিনিও তা না জানতে পারেন।'

এ ভাবে এক পরমেশ্বরের ধারণায় উত্তরণ হতে থাকে। দেবতারা স্রষ্টা নয় কারণ তাঁরাও সৃষ্ট হয়েছেন। এক একজন এক একটি শক্তির অধীশ্বর হয়েছেন। আরও আগে সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং তা হতে পারে একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বরের দ্বারা। এক নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তির দ্বারা। তাঁকে প্রথম পুরুষ বলা যায়, আত্মা বলা যায়, সৎ বলা যায়। ঋক বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তেও এই বহু থেকে একজন সর্বশক্তিমানে উপনীত হওয়ার পূর্বাভাষ মেলে। তিনি কি সেই এক? দুই প'খীর একজন ভোক্তা অন্যজন দর্শক — তারা কি জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলে মনে হয়? বিপ্রগণ এক আদিত্যকে বহু নামে অভিহিত করে।

'প্রথম জাতকে কে দেখেছিল যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করল? ভূমি হতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হতে? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করতে যায়? ... আমি অজ্ঞান কিছু না জেনেই জ্ঞানী মেধাবীগণের নিকট জানবার চেষ্টা করছি। যিনি এ ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্মরহিতরূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক!'

'দুটি প'খী বন্ধুভাবে একবৃখে' বাস করে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভ'খণ করে, অন্য ভ'খণ করে না — কেবলমাত্র অবলোকন করে।'

'এ আদিত্যকে মেধাবীগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয় প'খবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও বহু বলে বর্ণনা করা হয়। একে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে।' একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

৮ম মণ্ডলের ৫৮ সুক্তে বলা হল 'একং বৈ ইদং বি বভুব সর্বং'। 'এক অগ্নি বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হয়েছেন, এক ঊষা এ সমস্তকে প্রকাশ করেছেন। এ একই সর্ব প্রকারে হয়েছেন।'

ঋগ্বেদে ঋত নামে একটি কথা আছে। ঋত মানে নিয়ম বা সত্য বা যজ্ঞ। ১ম মণ্ডলে ২৪ সূক্তে বলা হয়েছে — 'হে বরুণরাজ! তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হোক, নির্ঋতিকে পরাঙমুখ করে দূরে রাখ, আমাদের কৃত পাপ হতে আমাদের মুক্ত কর।' সায়ণ মতে নির্ঋতি মানে পাপদেবী। আবার ঋত মানে যদি নিয়ম হয়, তবে বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা বোঝায়। হয়তো তা প্রকৃতি ও সমাজ-সংসারের নিয়মানুবর্তিতাও বোঝায়। বরুণের সঙ্গে ঋতের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রখর ইন্দ্রের সময়ে তা বিঘ্নিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের শেষের দিকে বরুণ-ইন্দ্র দেবতাগণ নয়, অন্য এক পরম স্রষ্টার কথা অনুমিত হয়েছে। জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু ভাবনার হদিশও ছিল সেখানে।

৩.৪। উপনিষদের যুগে

ঋগ্বেদের আমলে যে ভাবনার শুরু হয়েছিল, উপনিষদ পর্বে এসে তার তুলনারহিত বিকাশ হয়। বেদের অন্তে বলে উপনিষদ হল বেদান্ত। 'উপ' অর্থে গুরুর উপদেশ হতে লব্ধ জ্ঞান, 'নি' অর্থে নিশ্চিত জ্ঞান এবং 'সৎ' অর্থ যা জন্মমৃত্যুর বন্ধন খণ্ডন করে। শব্দার্থ এভাবে ব্যাখা করা হয়েছে।

উপনিষদে একটিমাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তি রূপে ভাবা হয়েছে এবং সেই ভাবনা আরো পল্লবিত হয়েছে। সেই অপার্থিব সত্তাকে ঈশ্বর বলে ভাবতে পারি। উপনিষদে তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। দার্শনিক চিন্তার নাম ব্রহ্মবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ। ব্রহ্ম কখনো অ'খর কখনো ভূমা নামেও বর্ণিত।

বিশ্ব হল সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম হলেন স্রষ্টা। বিশ্বের মধ্যে ঐশী শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং তা সমগ্রভাবে বিশ্বকে একত্বমণ্ডিত করেছে। ব্রহ্ম সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন, সব কিছু ধারণ করে আছেন এবং সবের অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর সারমর্ম বোঝানো হয়েছে এই বলে — এই সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি ও বিলয়।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। (ছাঃ ৩।১৪।১)

অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত সমুদায়ই ব্রহ্ম, কারণ তিনি হতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাঁতেই লীন হয় এবং তাঁতেই জীবিত থাকে।

মৃন্ময় পাত্রের উপাদান হল মৃত্তিকা আর বিশেষ রূপে প্রকাশ হল ঘট বা হাড়ি বা সরা। মূলতত্ত্ব হল উপাদান আর গৌণতত্ত্ব তার নানা রূপে প্রকাশ। সেভাবে চিন্তা করলে, বিশ্বের মূলতত্ত্ব হল ব্রহ্ম এবং তাঁর উপাদান নানা রূপে ব্যক্ত হয়ে নানা নাম দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

ব্রহ্ম এবং আত্মা এক। সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়ামাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। (মাঃ।২) অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাৎ বা চার পদ বিশিষ্ট।

তিনি যাকে বরণ করেন, তার কাছে প্রকটিত হন — আলোচনা বা প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে লাভ করা যায় না। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ... । (কঠ ১।২।২৩)

অন্যত্র আবার বলা হয়েছে — অতি সূ'খখ' বুদ্ধির প্রয়োগেই তিনি জ্ঞাতব্য। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূ'খখ'য়া সূ'খখ'দর্শিভিঃ। (কঠ ১।৩।১২)

মনকে বিশুদ্ধ করে জ্ঞানপ্রসাদে তিনি লভ্য। যদি কোন মনীষী হৃদয় মন দিয়ে গ্রহণ করতে চান তবে তিনি তার কাছে ধরা দেন। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো ...। (কঠ ২।৩।৯)

ব্রহ্মের অখণ্ড স্বরূপ মন দ্বারাই উপলব্ধি করার বিষয়। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন। (কঠ ২।১।১১)

ব্রহ্ম বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সূর্য, চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, দিনরাত্রি, সবই তাঁর নিয়মে পরিচালিত। বিভিন্ন জীবের অভ্যন্তরে থেকে ব্রহ্মই অজানিতভাবে সেই নিয়ন্ত্রণ চালনা করেন। কিন্তু ব্রহ্ম কেন এই সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন? এর উত্তরে উপনিষদকার বলেছেন যে ব্রহ্ম রস-স্বরূপ, অহৈতুক রস আস্বাদনের জন্য তিনি বহু ও বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হলেন।

অনেকে বলেন – যেহেতু ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি বিরাট পুরুষ, তেজ, অগ্নি, হিরণ্যগর্ভ, কার্যব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম, এবং প্রথম সৃষ্টি সুতরাং তাঁর পখে' অহৈতুক রস আস্বাদন করা বিচিত্র নয়। অনেকের কাছে এই অহৈতুক ঘটনা ঘটা বিচিত্রতম। সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মের দেহ, একাধারে জগতের অতীত অন্যভাবে জগতে ব্যাপ্ত। সৃষ্টি তবু ব্রহ্মের পূর্ণত্বের কোন হানি করে না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। (ঈশ)

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হতে পূর্ণ উদগত হন, পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও কেবল পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। ব্রহ্মই পূর্ণ। পূর্ণত্ব আর অসীমত্ব একই রকমের।

ন তত্র চ(র্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচ(রে।। (কেন ১।৩-৪)

সেখানে চ'খু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, আমরা তাঁকে জানি না, কি প্রকারে এই উপদেশ দিতে হয় তাও জানি না, তিনি সমস্ত বিদিত বস্তু হতে পৃথক, অবিদিত বিষয়েরও উপরে, পূর্ববর্তী আচার্যগণ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের কাছে এ রকমই শুনেছি।

ব্রহ্মকে আত্মা রূপেও চিহ্নি(ত করা হয়েছে। এই আত্মা জন্মে না, মরেও না, এই আত্মা কোন কিছু হতে জন্মায় নি, কোন কিছুই এ থেকে জাত হয় নি, এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, চিরবিদ্যমান। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। (কঠ ১।২।১৮)

অণু হতেও অণু, মহৎ হতেও মহান, আত্মা জীবের হৃদয়গুহায় নিহিত। কামনাবিহীন শোকমুক্ত ব্যক্তি মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ও ধাতু সকলের প্রসন্নতায় আত্মার সেই মহিমা দর্শন করতে পারে।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।। (কঠ ১।২।২০)

আত্মা স্থির হয়েও দূরে ভ্রমণ করতে পারে, শায়িত হয়েও সর্বত্র গমন করতে পারে। তিনি সকল দেহে আছেন অথচ দেহহীন, অনিত্য বস্তুর মধ্যে আছেন অথচ স্বয়ং নিত্য। (কঠ ১।২।২১-২২)

ইনি যাকে বরণ করেন তার কাছেই লভ্য হন। ইনি চিৎশক্তি হতে সর্বপ্রথমে জন্মেছেন। জল প্রভৃতি পঞ্চভূতের আগে জাত হয়েছেন। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সেই পু(ষ দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন। (কঠ ২।১।১২)

প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে প্রকাশিত ঈশ্বরের আরেক রূপে। সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই এক অজানা খেয়ালে। প্রশ্ন উপনিষদের প্রথম প্রশ্নের ৪-সূক্তে বলা হয়েছে – প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন। তপস্যা করে রয়ি (জড় বা ধন বা অন্ন স্থানীয় সোম) ও প্রাণ এই মিথুন যুগলকে উৎপাদন করলেন। আদিত্যই প্রাণ, রয়িই চন্দ্র, মূর্ত ও অমূর্ত সমস্ত কিছুই রয়ি। অমূর্ত থেকে পৃথক যা তাই মূর্ত, তাই রয়ি। সূর্য সর্ব জীবাত্মক ও সমগ্র বিশ্বাত্মক। জীব ও জগত তাঁর প্রকাশ। আত্মা হতেই প্রাণ জন্মে। হৃদয় আকাশে এই আত্মার বাস। সেখানে ১০১টি নাড়ী আছে। প্রত্যেক নাড়ীতে ১০১টি করে শাখা নাড়ী আছে। প্রত্যেক শাখানাড়ীতে ৭২,০০০ প্রশাখা আছে। (প্রশ্ন ৩।৬)

প্রশ্ন উপনিষদের সূক্ত৬।৪-এ আছে -- 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করলেন, প্রাণ হতে শ্রদ্ধা, তা থেকে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন সৃষ্টি করেন। অন্ন হতে বীর্য, বেদসমূহ, কর্ম, লোকসমূহ, এবং লোকসমূহে বিভিন্ন নাম সৃষ্টি করা হল।' 'স প্রানমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ, অন্নম, অন্নাদ্বীর্যং, তপো মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ।'

মুণ্ডক উপনিষদে সূক্ত ১।১।৭-৮-এ আছে -- যেমন মাকড়সা নিজের দেহ থেকে তন্তু সৃষ্টি করে আবার নিজ দেহে তা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ধান্যাদি ওষধিসমূহ উদগত হয়, যেমন জীবিত পুরুষ হতে কেশ জন্মে, তেমনি অ'খর ব্রহ্ম হতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্ম তপস্যা বিস্তার করেন, তা হতে অন্ন, অন্ন হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে সত্য (পঞ্চভূত), সত্য হতে লোকসমূহ এবং লোকসমূহে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ততেতৎ সত্যম। সেই অ'খর পুরুষই সত্য। এই অ'খর পুরুষ হতে প্রাণ মন সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় আকাশ বায়ু অগ্নি জল এবং নিখিল বস্তুজগতের ধারয়িত্রী পৃথিবী উৎপন্ন হয়। মস্তক তাঁর অগ্নি, চ'খু চন্দ্র-সূর্য, কর্ণ দিকসকল, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল বিশ্ব আর পা দুটির জন্য রয়েছে পৃথিবী। সেই পুরুষ থেকে অগ্নি, সোমরস থেকে পর্জন্য (মেঘ), পৃথিবী থেকে ওষধি, পুরুষ হতে স্ত্রীগণে বীর্য সঞ্চার এ ভাবে বহু প্রজা উৎপন্ন হয়। সেই পুরুষ হতে বিবিধ দেবতা জন্মান। সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসকল, প'খীসমূহ, প্রাণ অপাণ বায়ু, ধান ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মার্চ্য এবং বিধিব্যবস্থা উদ্ভূত। সেই পুরুষ থেকে সমস্ত সমুদ্র ও পর্বত জন্মেছে, নদীসকল উৎসারিত হয়েছে, সমুদায় ওষধি (ধান যব ও বিবিধ বৃ'খলতা) এবং মধু ইত্যাদি ছয় প্রকার রস উৎপন্ন হয়। এই অন্নরসের দ্বারা অন্তরাত্মা পঞ্চভূতের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করে। (মুঃ ২।১।১-৯)

সকলই ব্রহ্ম, এই চার পদবিশিষ্ট (চার অবস্থাসম্পন্ন) আত্মা ব্রহ্ম। জাগ্রত অবস্থায় তিনি বৈশ্বানর ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা। তখন তাঁর ৭ টি অঙ্গ, ১৯টি মুখ। তখন তিনি স্থূলবিষয় ভোগ করেন। এটি তাঁর প্রথম পাদ (বৈশ্বানর)।

তাঁর সাতটি অঙ্গ হল — মস্তকস্বরূপ দ্যুলোক, দুটি চ'খু স্বরূপ আদিত্য, প্রাণ স্বরূপ বায়ু, মূত্রাশয়স্বরূপ জল এবং পদযুগলস্বরূপ পৃথিবী। আর উনিশটি মুখ হল — ৫টি প্রাণ, ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্রিয়, এবং মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার নিয়ে ৪টি অন্তঃকরণ। স্বপ্নাবস্থায় তিনি অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতা। তখন তিনি সূ'খ' বিষয় ভোগ করেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় পাদ (তৈজস)। নিদ্রিত অবস্থায় সুষুপ্তিকালে কোন কামনা থাকে না, কোন স্বপ্ন থাকে না। তখন তিনি পৃথক জ্ঞানরহিত প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ, আনন্দঘন, আনন্দভোগী ও জ্ঞানমুখ। সেই প্রাজ্ঞ আত্মা হল তৃতীয় পাদ।

চতুর্থ পাদে তিনি জ্ঞাতা নন, প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নন(দৃষ্টির অগোচর, লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অতীত, মনের অগোচর ও প্রমাণের অতীত। তখন তিনি কেবল আত্মারূপে অনুভবের যোগ্য, জগৎ চরাচর হতে পৃথক শান্ত শিব ও অদ্বৈত। ইনিই আত্মা, ব্রহ্ম কিংবা অ'খর। (মাঃ ২-৭)

ঐতরেয় উপনিষদের শুরুতে সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবনা ব্যক্তহয়েছে। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈ'খত লোকান নু সৃজা ইতি।। (ঐ১।১)

সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র আত্মারূপেই ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াযুক্ত(আর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা চিন্তা করলেন যে আমি লোকসকল সৃষ্টি করব। আত্মার চিন্তাই সৃষ্টি। তিনি চারটি লোক সৃষ্টি করলেন। জল ধারণ করার জন্য অম্ভোলোক — এটি দ্যুলোকের উপরে অবস্থিত এবং দ্যুলোক আশ্রয় করে অবস্থান করে। অন্য তিনটি হল মরীচিলোক (অন্তরীখ' বা আকাশ), মরলোক মানে পৃথিবী

এবং অপ্লোক যা কিনা পৃথিবীর নিচস্থ।

লোক সৃষ্টির পর ঈশ্বর চিন্তা করলেন — এদের জন্য লোকপাল (দেবতা) সৃষ্টি করব। তিনি জল হতে এক পুরুষ উদ্ধার করে অবয়বাদিযোগে তাঁকে গঠন করলেন। সোহদ্ভ এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্ছয়ৎ।

ঈশ্বর সেই পুরুষের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করলেন। তখন পাখির ডিমের মতো সেই পুরুষের মুখগহ্বর উৎপন্ন হল। ক্রমে মুখগহ্বর হতে বাগিন্দ্রিয়, তা হতে অগ্নি দেবতা প্রকাশিত হল। নাসিকার রন্ধ্র দুটি ফুটে উঠল। সেখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং তার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হলেন। অখি'গোলক প্রকাশিত হল। তা হতে দর্শনেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় হতে দেবতা সূর্য প্রকটিত হলেন। দুটি কর্ণবিবর হল। তা হতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় হতে তার অধিদেবতা দিকসমূহ প্রকাশিত হলেন। এরপরে ত্বক, ত্বক থেকে লোম (স্পর্শেন্দ্রিয়), স্পর্শেন্দ্রিয়ের পর ওষধি ও বনস্পতিসকল প্রকাশিত হল। তারপর হৃদয়কমল অভিব্যক্ত হল। তা হতে অন্তঃকরণ এবং তারপর চন্দ্রমা প্রকটিত হলেন। নাভি অভিব্যক্ত হল। নাভি হতে অপান (পায়ু) এবং তা হতে তার অধিদেবতা মৃত্যু আবির্ভূত হলেন। শিশ্ন নির্গত হল এবং তা হতে রেতঃ প্রকাশিত হল। রেতঃ হতে তার অধিদেবতা অপ্ বা প্রজাপতি আবির্ভূত হলেন।

দেবগণ সৃষ্ট হয়ে মহার্ণবে পতিত হলেন। দেবতাগণের উৎপত্তিস্থান ছিল সেই পিণ্ডাকৃতি পুরুষ। পরমেশ্বর পুরুষকে 'খুধা-তৃষ(ার সঙ্গে সংযোজিত করলেন। দেবগণের অধিষ্ঠানের জন্য স্রষ্টা প্রথমে গ(র আকৃতি এক পিণ্ড এবং পরে অশ্বের আকৃতি এক পিণ্ড এনেছিলেন। দেবতারা সেসব যথেষ্ট নয় বলে বিবেচনা করায় তিনি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড এনে দেন। তখন অগ্নি মুখগহ্বরে, বায়ু নাসিকারন্ধ্রে, সূর্য অখি'গোলকে, দিকসমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়ে, চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে, ও প্রজাপতি শুক্র(জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর স্রষ্টা অন্ন সৃষ্টি করলেন। অপ্সমূহ (পঞ্চভূত) হতে স্রষ্টা সংকল্প দ্বারা যে মূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন তাই হল অন্ন। সৃষ্ট হওয়ার পরে সেই অন্ন খাদকগণকে অতিক্রম করে যেতে তৎপর ছিল। আদিপুরুষ অপান বায়ু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করলেন। অপান বায়ু মানে মুখগহ্বর থেকে নিচের দিকে চলা বায়ু।

পরমেশ্বর চিন্তা করেছিলেন — তিনি ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকতে পারে? তাই তিনি মূর্ধাদেশ বিদীর্ণ করে ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে জীবদেহে প্রবেশ করলেন। এভাবে জীবদেহে পরমেশ্বর অনুভবকর্তা ও ভোক্তা হলেন।

এই অ'খর এক হয়েও প্রত্যেক বস্তুতে সমস্তরূপে সমস্ত উৎপত্তিস্থানে বিরাজ

করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে জাত। এই মহাত্মা ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য বা দেবতা-মানুষ-পশু-পাখীর জন্য এক একটি জাল বিস্তার করে আবার প্রলয়কালে সংহার করেন। সর্বব্যাপী ঈশ্বর পূর্ব কল্পনামতো পুনরায় লোকপাল প্রভৃতি সৃষ্টি করে সকলের উপর প্রভুত্ব করে থাকেন।

পরমাত্মাকে ইদন্দ্র বলা হয়। অপরো'খভাবে তিনি দেখেন তাই এই নাম। ব্রহ্মজ্ঞগণ পরো'খভাবে তাঁকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ খণ্ড হতে একাদশ খণ্ড পর্যন্ত অংশে একটি মজার তথ্য আছে। কোন যুগে সূর্যের উদয় ও অস্ত কোনদিকে এবং সেই সময় কোন দেবতার আধিপত্য থাকে তা সবিস্তারে বলা হয়েছে। বসুযুগে সূর্যের পূর্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত হয়। দ্বিগুণ সময় রুদ্র যুগের। তখন সূর্য দখিনে উদিত হবে এবং উত্তরে অস্ত যাবে। তারও দ্বিগুণ সময় আদিত্য যুগে। সূর্য তখন আবার পশ্চিমে উদিত হবে এবং পূর্বে অস্ত যাবে। একই রকমভাবে দ্বিগুণ সময় যাবে মরুৎযুগে। এই যুগে সূর্য উত্তরে উদিত হবে এবং দখিনে অস্ত যাবে। তারও দ্বিগুণ কাল হবে পঞ্চম কল্পে অর্থাৎ সাধ্য যুগে। সূর্য তখন ঊর্ধ্বে উদিত হবে এবং অধোদিকে অস্ত যাবে। এই সাধ্যযুগের শেষে একত্রিশ বসুযুগের অবসান হবে। তারপর? দিনরাত বা সংবৎসরাদি বলে কিছু থাকবে না। সেই ব্রহ্মলোকে সূর্য অনন্তকাল জ্যোতি প্রদান করবে।

সৃষ্টি সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের উনবিংশ খণ্ডে পাই — জগৎ আগে অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল। তা সৎ হল বা সু'খখ' সত্ত্বাবান হল। ডিম্বরূপে পরিণত হল। এক বছর তা স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর বিভিন্ন হল। একভাগ হল রজতময়, অন্যভাগ সুবর্ণময়। রজতময় অংশ হল পৃথিবী আর সুবর্ণময় অংশ দ্যুলোক। যা জরায়ু তা পর্বতাদি, যা উল্ব (সু'খখ'-গর্ভ-বেষ্টন) তা মেঘ ও তুষার, যা ধমনী তা নদীসমূহ বস্তিপ্রদেশের জলসমুদ্র। অনন্তর সূর্য উৎপন্ন হল।

পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন — আগে এই জগৎ সৎরূপে বিদ্যমান ছিল। এক তবু অদ্বিতীয় ছিল। কেউ কেউ বলেন যে জগৎ অদ্বিতীয় অসৎ রূপে ছিল। কিন্তু অসৎ থেকে কি করে সৎ জাত হতে পারে? তাই জগৎ সৎ ছিল। তদৈ'খত বহু স্যাং প্রজায়েয়তি তত্তেজোহসৃজত। সেই সৎ বহু হতে চাইলেন। তাঁর সংকল্পের ফলে তেজ উৎপন্ন হল। তেজ হতে জল। জল হতে অন্ন।

ভূত সমূহের উৎপত্তির তিনটি কারণ হয়ে থাকে — অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ। সৎ স্বরূপ জীবাত্মারূপে তিন দেবতা তেজ-জল-অন্নে প্রবেশ করে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন। অন্ন ভুক্ত হয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয় — পুরীষ, মাংস ও মন।

জল হল — মূত্র, রক্ত ও প্রাণ। তেজ হল অস্থি, মজ্জা ও বাক।

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে। অজাতশত্রু সে কথা বলেছিলেন গর্গবংশীয় বালাকির কাছে। একটি সৎ বা স্থিতিশীল আর অন্যটি ত্যৎ বা অব্যক্ত, মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত। বায়ু ও অন্তরী'খ' অমূর্তরূপ, প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ অমূর্তরূপ, সূর্যমণ্ডলে ও দখিনে চ'খুতে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনি এই অমূর্তের রস।

সে পুরুষের রূপ হলুদ-মাখা পরিচ্ছদের মত পীতবর্ণ, মেষলোমের মত পাণ্ডুবর্ণ, কীটের মত রক্তবর্ণ, ইনি অগ্নি শিখার ন্যায়, শ্বেতপদ্মের ন্যায়, এবং চমকিত বিদ্যুতের ন্যায়। তারপর? নেতি নেতি — নেই নেই। আর কিছু শ্রেষ্ঠ নেই। ব্রহ্মলোক জানার শেষ সীমা। তারপর প্রশ্ন করা চলে না।

তবু যদি কেউ প্রশ্ন করে?

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেছিলেন — মা অতিপ্রা'খী'ঃ। অতিপ্রশ্ন কোরো না।

গার্গী আর প্রশ্ন করেন নি। কিন্তু মানুষের প্রশ্ন করা তো শেষ হয় না। অনন্ত জিজ্ঞাসা তার। তাকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে বেঁধে ফেলা অসমীচীন।

এই হল ব্রহ্মজ্ঞান? মৈত্রেয়ী এরই জন্য উন্মুখ হয়ে বলেছিলেন — যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং, যা দিয়ে অমরত্ব লাভ হয় না তা দিয়ে আমি কি করব?

বলা হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয়। এই অমরত্ব লাভ করলে ঠিক কী লাভ করা হয়? মৃত্যুকে জয় করা হয়? মৃত্যুর পরে আর জন্ম হয় না? মৃত্যুর পরে আবার জন্ম হয় কিনা তাই তো আমরা সঠিক জানি না।

তবু প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা রচিত জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা করলুম। কোন অমরত্বলাভের আশা না করে।

৩.৫ । পুরাণ কথায়

উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের যুগ। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনার যুগ। সেই পরমেশ্বরকে পু(ষ বা আত্মা বা অ'খখ'র কি ব্রহ্ম যে নামেই ডাকা হোক না কেন। দেবকুল পরমেশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁরই আজ্ঞাবহ। জগত এই পরমেশ্বরের সৃষ্টি।

উপনিষদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বেদান্ত দর্শন — শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ। আর যে চারটি দর্শনের কথা জানি তা হল সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায় এবং যোগ দর্শন। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বস্তুবাদী নাস্তিক দর্শন। বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে ঈশ্বর নেই।

উপনিষদের পরে আসে পুরাণকাল। তখন জ্ঞানের বদলে প্রবাহিত হয় ভক্তি পরমেশ্বরের ধারণার পাশাপাশি ফিরে আসে দেবতা, অনেক দেবতা। পুরাণকাল ভক্তির যুগ। আঠারোখানা পুরাণের কথা জানা যায়। শিব, ভবিষ্য, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্দ, কূর্ম, বামন, ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ দেবতা শিবের মাহাত্ম্য প্রচার করে। বিষু(, ভাগবত, গরুড় ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বিষু(দেবতার মহিমা কীর্তন করে। পদ্ম ও ব্রহ্মপুরাণ ব্রহ্মার মহিমা প্রকাশক। আগ্নেয়পুরাণ অগ্নিদেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করে। পুরাণের সাথে সাথে এসেছে দুটি মহাকাব্য — রামায়ণ এবং মহাভারত।

পুরাণের সময়ে একজন পরমেশ্বরের পরিবর্তে স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ভূমিকায় দেখা গেল ত্রিমূর্তিকে। ব্রহ্মা, বিষু(ও মহেশ্বর এঁরা হলেন ভক্তিযুগের প্রধান তিন দেবতা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতা। বলা হল — পরমেশ্বর এক হলেও এই তিন গুণে (সত্ত্ব-রজ-তম) জড়িয়ে পড়ে দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য ব্রহ্মা-বিষু(-মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন। (সূত্র-শ্রীমদভাগবত ২।২৩-২৫)। মহেশ্বর একক ও অকৃত্রিম। ব্রহ্মা বিষু(র নাভিপদ্ম থেকে জাত। ফলে তাঁর স্থান বিষু(র নিচে। আবার কোথাও ব্রহ্মার ললাট বা মুখ থেকে শিব উদ্ভূত বলা হয়েছে। পুরাণকালে কখনো দেবতাদের পিতামহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, কখনো জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ বিষু(শ্রেষ্ঠ আবার কখনো আদিদেব মহাদেব শ্রেষ্ঠ। আবার স্কন্দপুরাণে তিনজনকেই একাত্ম কল্পনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের আমলের বিষু(অনেক পরিবর্তিত হয়েছেন পুরাণের সময়। বেদে বিষু(অপ্রধান ছিলেন কিন্তু পুরাণে অন্যতম প্রধান। বেদে ইন্দ্র, ব(ণ ও অগ্নির সর্বোচ্চ স্থান ছিল(তা পুরাণকালে খর্ব হয়েছে। তাঁরা পর্যবসিত হয়েছেন কেবলমাত্র লোকপাল হিসেবে।

ঋগ্বেদে বিষু(প্রথম সারির দেবতা ছিলেন না। ইন্দ্রসখা বিষু(র মহিমা ইন্দ্রের তুলনায় ছিল নগণ্য। বিষু(কখনো সূর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। তাঁর যে তিন পাদের কথা বলা হয়েছে তা সূর্যের উদয়াচল, অস্তরী'খখে' অবস্থান এবং অস্তাচলের কথা। পরে তিনি যজ্ঞ হয়েছেন। আবার তিনি অগ্নির সমার্থক হয়েছেন। আর পুরাণের কালে এসে সেই বিষু(অন্যতম প্রধান হয়েছেন। তিনি হয়েছেন পালনকর্তা। কখনো তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দশটি অবতার রূপের কথা বলা হয়েছে। দশটি রূপভেদ হল — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশু রাম, রামচন্দ্র, কৃষ(, বলরাম, বুদ্ধ ও কলকি অবতার। বুদ্ধকে বিষু(র অবতার হিসেবে গণ্য করা বিশেষ অর্থবহ। কোথাও তাঁর সাত অবতার রূপের কথা বলা হয়েছে। কোথাও বিশ, আবার কোথাও ষাট অবতারের কথাও আছে। প্রত্যেক অবতার রূপের সঙ্গে জড়িত একটি কাহিনী। নারায়ণ রূপেও বিষু(পূজিত হন।

ঋগ্বেদে অঙ্গিরসবংশীয় কৃষ(নামে এক ঋষি সূক্ত রচনা করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূক্ত ৩।১৭।৬-এ একবার দেবকীনন্দন কৃষে(র নাম উল্লিখিত হয়েছিল। তিনি ঘোর ঋষির শিষ্য ছিলেন। পুরাণে ও মহাকাব্যে আরেকজন কৃষে(র ব্যাপক আধিপত্য ও প্রচার দেখা যায়। বিষু(পুরাণে কৃষ(ও বিষু(একই দেবতা। মহাভারতের কৃষ('খ'ত্রিয়-যদুবংশের শাখা বৃষি(বংশীয় বসুদেবের পুত্র। তিনি মথুরা ও পরে দ্বারকায় বাস করতেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে কৃষ(আভির বা গোপ জাতির সংস্কৃতিতে লালিত। ইনি বৃন্দাবনলীলার নায়ক, যশোদাদুলাল, চিরকিশোর, রসিকশেখর বিশেষতঃ রাধাকৃষে(র যুগল রূপে আরাধিত। অনেকে বলেন, খৃস্টধর্মীয় প্রাচীন আভির বা গোপ জাতির লোককথার মিশ্রণ থেকে কৃষে(র এই রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমরা বেদোক্ত সূর্য-অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষু(এবং পুরাণোক্ত বিষু(র সঙ্গে সঙ্গে পাই সূক্ত -রচয়িতা ঋষি কৃষ(, যাদব কৃষ(তথা মহাভারতের কৃষ(। বিষু(কৃষে(র রূপভেদ।

দা(ময় জগন্নাথ কৃষ(তথা বিষু(র আরেক রূপ।

বৌদ্ধধর্মে আছে ত্রিরত্ন বা 'পরমেশরা' — বুদ্ধ, সংঘ এবং ধর্ম। পু(ষোত্তম জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তারই আত্মীকরণ কি না প্র্ন। অথবা ইনি কি কোন অনার্য দেবতা ছিলেন? সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর নামে বিষু(র আরেক মূর্তি পূজিত হয়। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে এই নতুন দেবতার সৃষ্টি হয়।

রুদ্র, শিব ও দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন একই দেবতা। ঋগ্বেদের আমলে রুদ্র কল্পিত হন ধ্বংসের দেবতারূপে। তাঁর জটাজুট অগ্নিশলাকার ন্যায়। তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে

বিশ্ব কেঁপে ওঠে। এই রুদ্র আরোগ্যের দেবতাও ছিলেন। কোন কোন পুরাণে বলা হয় রুদ্র ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে জাত, কোথাও তিনি ব্রহ্মার ললাট থেকে জন্ম নিয়েছেন বলা হয়েছে, কোথাও মন থেকে। রুদ্রই অগ্নি। প্রখর রুদ্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হয়তো অনেক 'খ'মাশীল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পূজা ব্যাপকভাবে লিঙ্গপূজা হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে বলে অনেকে ভাবেন। তিনি সম্ভবত প্রাক-বৈদিক দেবতা। প্রাক-আর্য সম্প্রদায় তাঁর পূজা করত। শিবের তিন পত্নী – সতী, উমা ও গঙ্গা। আবার তাঁকে ভূতনাথ, শ্মশানচারী ও কামুক দেবতা রূপেও চিত্রিত করা হয়েছে। শিবপূজা ও লিঙ্গপূজা সমার্থক। বিষু(ও শালগ্রাম শিলা রূপে পূজিত হন।

ত্রিমূর্তির অন্যতম ব্রহ্মা। উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন নির্গুণ পরমাত্মা। তিনি ব্রহ্মা নন। বিষু(র নাভিপদ্ম থেকে জাত হন এই ব্রহ্মা। মহাসলিলে ভাসমান হিরণ্ময় অণ্ডমধ্যে জন্ম হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মার – মনুসংহিতায় এমন বলা হয়েছে। প্রজা সৃষ্টি করা তাঁর কর্ম। তিনি দেবতাদের পিতামহ। চতুরানন।

চিত্র-১৬। ব্রহ্মা।

ইন্দ্র-বরুণ-অগ্নি ছাড়া অপ্রধান দেবকুলের মধ্যে আছেন – সূর্য, চন্দ্র, পবন, গণেশ, কার্তিকেয়, মদন, যম, কুবের, দ'খখ' ইত্যাদি। ঋগ্বেদের সময়কালে দেবী হিসেবে পূজ্যা ছিলেন – ঊষা, রাত্রি, এবং মাতা পৃথিবী।

পরমেশ্বরের লিঙ্গভেদ নেই কেননা তা থাকার কথা নয়। যদিও তাঁকে পু(ষ বলা হয়েছে, তবে তা লিঙ্গাত্মক কিনা তা প্রশ্নেময়। পুরাণের সময় শক্তির দেবী হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেন দুর্গা বা পার্বতী। উমা তাঁরই আরেক চিত্রকল্প। রূপভেদে ইনি দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কালি, শ্যামা ও চণ্ডী। মহাশক্তি আবার মুক্ত কেশী, তারা, ছিন্নমস্তা, জগৎগৌরী, প্রত্যাংগীরা, অন্নপূর্ণা, গণেশজননী, কৃষ(ত্রে(াড়া রূপেও পূজিতা। দশমহাবিদ্যার পূজার কথাও বলা হয়েছে – সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি। এই সরস্বতী নদী হিসেবে ঋগ্বেদে বন্দিতা সরস্বতী নন। ইনি বাক দেবী। আরো অনেক মাতৃপূজা আছে যেমন ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, তুলসী, মঙ্গলচণ্ডী, ওলাইচন্ডী, সন্তোষী মাতা ইত্যাদি।

ভক্তি যুগে ভক্তি প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর অভাব হয়নি। বৃ(পূজা

আছে, যেমন, বটপূজা ও অশ্বত্থ পূজা। পশুপূজা আছে, যেমন, গরুড়, জটায়ু ও সম্পাতি। আছে নদীপূজা ও হনুমান-সুগ্রীব-নল-নীল-সুষেণদের পূজা। আছে নবগ্রহ, নবপত্রিকা, ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন, দখিণরায়, বাশুলী, মানিকপীর ইত্যাদি গ্রাম্যদেবতা। ঋগ্বেদের আমলের তেত্রিশ দেবতা পুরাণ ও তার পরবর্তী যুগে সত্যিই তেত্রিশ কোটি দেবতায় পরিণত হয়েছে যেন।

জগতসৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন ভাবনাও রূপান্তরিত হয়েছে। স্রষ্টা এখানে বাসুদেব নারায়ণ। ব্রহ্মা নারদমুনিকে সৃষ্টির যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা শ্রীমদভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বলা হচ্ছে – নিজের মায়া দিয়েই বহুরূপ হতে ইচ্ছুক মায়াধীশ পরমেশ্বর নিজের মধ্যে লীন থেকেই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যদৃচ্ছাক্রমে কাল-কর্ম-স্বভাব ধারণ করেন। পু(ষবিধৃত কাল থেকে সত্ত্ব-রজ-তম এই গুণগুলির বি'খে'াভ সৃষ্টি হয়। স্বভাব থেকে রূপান্তর সৃষ্টি আর কর্ম থেকে মহৎ-তত্ত্বের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব-রজ দ্বারা আলোড়িত হয়ে মহৎ-তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হলে তম-প্রধান দ্রব্যগুণ ক্রিয়াত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব প্রকাশ পায়। এর ভেদে আবার তিন রকমের প্রকাশ হয় – সত্ত্বপ্রধান, তৈজস এবং তামস।

পঞ্চভূতের আদি কারণ তামস-অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে আকাশের আবির্ভাব হয়। তার মাত্রা (সূক্ষ্মরূপ) আর গুণ (অসাধারণ ধর্ম) হল শব্দ। আকাশের বিকার থেকে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুর উৎপত্তি। বায়ুর বিকার হলে তা থেকে রূপধর্মবিশিষ্ট তেজের অভ্যুদয় হয়। তেজের বিকার থেকে রসাত্মক জলের সৃষ্টি হয়েছিল। জলের বিকারে গন্ধবান পৃথিবীর উৎপত্তি। বিকারবিশিষ্ট সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে মন আর বৈকারিক দশ দেবতা – দিক, বায়ু, সূর্য, ব(ণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি সৃষ্ট হয়েছিলেন। তৈজস অহঙ্কার থেকে বিকারের ফলে দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়গণ, মন আর গুণভাবগুলি মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দেহরূপ আয়তন নির্মাণে সমর্থ হয়নি। ভগবৎ-শক্তির সঙ্গে যুক্ত(হয়ে তারা সদসৎ-প্রধানের গুণভাব অর্জন করল আর সমষ্টি ও ব্যক্তিরূপ অণ্ডাত্মক শরীরের সৃষ্টি হল। হাজার হাজার বছর ধরে এই অণ্ডটি জলে শায়িত ছিল। অবশেষে কাল-কর্ম-স্বভাবস্থিত হিরণ্যগর্ভ পু(ষ এই অচেতন অণ্ডকে সঞ্জীবিত করলেন। হাজার হাজার উরু, পা, হাত, বুক, মুখ আর মাথা বিশিষ্ট পু(ষ অণ্ডটি ভেঙে বেরিয়ে এলেন। মনীষীরা কল্পনা করেন, এই পু(ষের কোমর থেকে নীচের দিকের অঙ্গ দ্বারা সাতটি আর জঘন থেকে ওপরের দিকের সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাতটি –এই মোট চৌদ্দটি ভুবনের সৃষ্টি হয়েছে।

চৌদ্দটি ভুবন নির্মাণ হয় এই প্রকারে। মাথা থেকে ব্রহ্মলোক, বুক থেকে মহর্লোক, গ্রীবা থেকে জনলোক, স্তন থেকে তপোলোক, নাভি থেকে ভুবর্লোক,

হৃদয় থেকে স্বর্লোক, পা থেকে ভূর্লোক নির্মিত হয়। আর কটিদেশ থেকে অতল, ঊরু থেকে বিতল, জানুতে থেকে সুতল, জঙঘাদেশ থেকে তলাতল, গুলফ থেকে মহাতল, পায়ের অগ্রভাগ থেকে রসাতল, আর পদতল থেকে পাতাল গঠিত হয়।

বিরাট পু(ষের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বাগিন্দ্রিয়গুলি ও আগুন। জিহ্বা থেকে হব্য-কব্য-অমৃত এই তিন প্রকার অন্ন, রস ও বরুণ। নাসারন্ধ্র থেকে পাঁচটি প্রাণ ও বায়ু। ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ওষধিসকল, দুরকমের গন্ধ। চোখ থেকে রূপ ও তেজ, অখি'গোলক থেকে দুটি সূর্য ও স্বর্গ, কান থেকে দুটি দিক ও নানা তীর্থ, শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে আকাশ ও শব্দ। রোম থেকে উদ্ভুত হয়েছে সকল উদ্ভিদ। চুল, (শ্রু ও নখ থেকে মেঘ-বিদ্যুৎ-পাথর-লোহা। বাহু থেকে অনেক লোকপাল ও শাসক-পালকেরা। এই পু(ষের শি(েই জলের, শুত্রে(র, লোকসৃষ্টির, পর্জন্যের এবং প্রজাপতির উৎস। তাঁর উপস্থ সন্তানার্থ সম্ভোগের তাপনিবৃত্তির স্থান। তাঁর পায়ু যমের, মিত্রের ও মলত্যাগের স্থান। তাঁর গুহ্যদেশ হিংসা, নির্ঋতি নামক অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের স্থান। তাঁর পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম ও অজ্ঞানের স্থল। নদনদীরা এঁর নাড়ি, অস্থিরাশি থেকে উদ্ভুত হয় পাহাড়সকল। উদর হল প্রকৃতি, বিবিধ রস, সমুদ্ররাজি ও প্রাণীগনের প্রলয়স্থান। এঁর হৃদয় লিঙ্গদেহের আশ্রয়। শ্রীহরির মন হল ধর্মের, ব্রহ্মা-নারদমুনির, ব্রহ্মকুমার সনকাদির, তত্ত্ববিজ্ঞানের, এবং সত্ত্বগুণের আশ্রয়।

অতএব এই বিশ্ব শ্রীনারায়ণে অধিষ্ঠিত, যিনি স্বয়ং নির্গুণ হলেও সৃষ্টিকার্যে মায়া অবলম্বন করে সগুণ হয়েছেন। তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। মহেশ্বর তাঁরই অধীনে সংহার করেন আর স্বয়ং তিনি বিষু(রূপে সব পালন করেন। এ কথা ব্রহ্মা নারদকে বলেছিলেন। অন্তত পুরাণকার সেরকম কথা আমাদের বলেন।

পরমেশ্বর থেকে যখন পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সকল, মহতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মাল, তখন তার নাম হল সৃষ্টি। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন তখন তার নাম বিসৃষ্টি।

এই পু(ষ যখন অণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি নিজের আশ্রয়ের জন্য শুদ্ধ জল সৃষ্টি করলেন। নিজের সৃষ্ট জলে তিনি সহস্র বৎসর অবস্থান করলেন। পুরুষ (নর) থেকে উৎপন্ন বলে সেই জলকে নার বলা যায় এবং তিনি নারে আশ্রয় করায় নারায়ণ হলেন। বহুদিন পরে, এক তিনি, নানাত্ব ইচ্ছা করে যোগশয়ন থেকে উত্থিত হয়ে মায়া দিয়ে হিরন্ময় বীর্যটি তিনভাগে ভাগ করলেন – অধিভূত, অধ্যাত্ম আর অধিদৈব (ভূত, ইন্দ্রিয় আর দেবতা)। (শ্রীমদভাগবত ২।১০।১-৩৫)

সেই পু(ষের হৃদয়স্থ আকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি(, মনঃশক্তি(আর দেহশক্তি(জন্মাল। তারপর হল প্রাণ। তাঁর অন্তরে 'খু'ধাতৃষ(া হল। তখন একে একে বিদীর্ণ হল মুখ, জিহ্বা, নাসারন্ধ্র ইত্যাদি এবং সেখানে জন্মাল রূপ-রস-–গন্ধ-স্পর্শ, ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের অধিষ্ঠাতা প্রকৃতি ও দেবতা। এ সবই ভগবানের স্থূলরূপ –

মায়া দ্বারা সৃষ্ট। প্রতিকল্পে যে সৃষ্টি হয় তার সাধারণ নিয়ম এটাই।

ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কি? এ বিষয়েও পুরাণকার বক্ত(ব্য রেখেছেন। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরের দিকে ৫০ কোটি যোজন বা ৪০০ কোটি মাইল বিস্তৃত। তার বাইরে রয়েছে খি'তি, অপ্, তেজ, ম(ৎ, ব্যোম এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এই সাতটি আবরণ। ব্রহ্মাণ্ড তা দিয়ে মোড়া। খি'তির আবরণের পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ডের ১০ গুণ, ফলে তার বিস্তৃতি হল ৪,০০০ কোটি মাইল। অপ-এর বিস্তৃতির পরিমান ৪০,০০০ কোটি মাইল, তেজের ৪,০০,০০০ কোটি মাইল, ম(ৎ-এর ৪০,০০,০০০ কোটি মাইল, আর ব্যোমের ৪,০০,০০,০০০ কোটি মাইল। অহঙ্কারতত্ত্বের ৪০,০০,০০,০০০ কোটি মাইল। এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সবই সেই অ'খ'র – ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন।

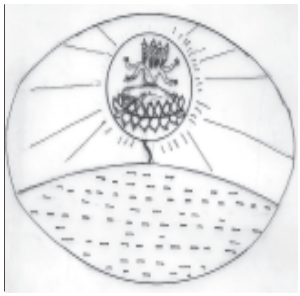

চিত্র-১৭। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা।

এই ব্রহ্মাণ্ড ১১টি ইন্দ্রিয়, ৫টি মহাভূত এই ১৬ রকম বিকার এবং প্রকৃতি-মহৎতত্ত্ব-অহঙ্কারতত্ত্ব আর ৫টি তন্মাত্র নিয়ে মোট আট প্রকার প্রকৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র। তারপর সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার নামে চার ঋষি। এই ঋষিরা প্রজা সৃষ্টিতে অসম্মত হওয়ায় জন্ম হল নীললাল কুমারের। তাঁর আরেক নাম রুদ্র। ১১জন রুদ্র এবং রুদ্রাণী মিলে প্রজা সৃষ্টি করলেন। সেই প্রজাকুল স্রষ্টার মনোমত হল না।

এরপর ব্রহ্মা স্বয়ং ধ্যানস্থ হয়ে দশ পুত্রের জন্ম দিলেন। তাঁরা হলেন – মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দ'খ্খ' ও নারদ। এ ছাড়া জন্ম হয়েছিল ধর্ম, অধর্ম, কাম, ত্রে(াধ, লোভ, সরস্বতী, সমুদ্র, রা'খ্খ'স, কর্দমমুনি, এবং বাক নামে এক কন্যা। তারপর ব্রহ্মা থেকে দ্বিধাবিভক্ত(হয়ে জন্মাল স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপা। এঁদের পাঁচ সন্তান ও তাঁদের সন্তান সন্ততিতে এই জগৎ পরিপূর্ণ হল।

অগ্নিপুরাণে সৃষ্টি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাই তা এই রকম – সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র অব্যক্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন, রাত্রি দিন কিংবা আকাশ কিছুই ছিল না। অনন্তর সৃষ্টিকালে পরমপু(ষ বিষু(প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়ে 'খো'ভিত করলেন। তখন

সেই প্রকৃতি হতে মহতত্ত্ব ও মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হল। ঐ অহঙ্কার দ্বিবিধ – বৈকারিক ও তামসিক।

বৈকারিক অহঙ্কার হতে শব্দতন্মাত্র আকাশ, আকাশ হতে স্পর্শতন্মাত্র বায়ু, বায়ু হতে রূপতন্মাত্র অগ্নি, অগ্নি হতে রসতন্মাত্র জল ও জল হতে গন্ধতন্মাত্র পৃথিবী এবং তামস অহঙ্কার হতে তৈজস দশ ইন্দ্রিয়, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা ও মন উৎপন্ন হয়(মন একাদশ ইন্দ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর ভগবান প্রজা সৃষ্টির কামনায় অগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন। তাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিখি'প্ত হল। ... তা হতে সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হয়ে সলিলোপরি ভাসতে লাগল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং সমুৎপন্ন হলেন, স্বয়ং সম্ভূত বলেই তিনি স্বয়ম্ভু নামে খ্যাত হন।

হিরণ্যগর্ভ ঐ অণ্ডে সংবৎসরকাল থেকে তা দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তারই এক খণ্ডে স্বর্গ অপর খণ্ডে পৃথিবীর সৃষ্টি হল। ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যে যে শূন্যতা রইল, ব্রহ্মা তাতে আকাশ সৃষ্টি করলেন। অনন্তর ব্রহ্মা জলোপরি পৃথিবী স্থাপনপূর্বক তার সকল ভাগে দশদিক নির্মাণ করলেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, রতি, বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ এবং ইন্দ্রধনু প্রভৃতির সৃষ্টি করলেন। পরে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তাঁর বকত্র হতে ঋক, যজু ও সামবেদ সৃষ্ট হল। ... তৎপরে ভুজ হতে উচ্চাবচ ভূত, সনৎকুমার ও ক্রোধ হতে রুদ্রের সৃষ্টি হল। পরিশেষে ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র আবির্ভূত হন। তাঁরা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ।

অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় দেহ দ্বিধা বিভক্ত করে অর্দ্ধভাগে পু(ষ ও অর্ধভাগে নারীরূপী হয়ে সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

বিষু(পুরাণে সৃষ্টির আয়ু কত তার একটা পরিমাপ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার ১ দিন মানে ৪০০০ যুগচত্র(। প্রত্যেক যুগচত্রে(৩০০০ দৈব বৎসর হয়। প্রত্যেক দৈব বৎসর মানে ৩৬০ মানুষী বৎসর। এই হিসেবে ব্রহ্মার ১ দিন বা ১ কল্প মানে ৪৩২ কোটি মানুষী বৎসর। ব্রহ্মার একদিনে ব্যাপ্ত ১৪ জন মনুর রাজত্বকাল। এক মনু থেকে অন্য মনুর রাজত্বকালে অর্থাৎ মন্বন্তরে ভগবান সত্ত্বময় হয়ে পু(ষাকার অবতারমূর্তি ধরেন। এইভাবে মনুদের দ্বারা বিশ্বকে রখ্খা কলেন। কল্প শেষ হলে সমুদ্র বিখুব্ধ হয়, বিরাট ঢেউ ওঠে আর ত্রিভুবন ভেসে যায়। সৃষ্টি ধ্বংস হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ১০০ বৎসর। ঐ এক আয়ুষ্কাল পর্যন্ত এক সৃষ্টি বিদ্যমান থাকে। আমরা প্রথম কল্পের সপ্তম মনু বৈবস্বত মনুর সময়কালে রয়েছি।

বিষু(পুরাণে জগত সৃষ্টির যে বর্ণনা আছে তা মোটামুটিভাবে একরকমের। তবু কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন বলা হয়েছে –

প্রলয়কালে দিবা রাত্রি আকাশ ভূমি আলো অন্ধকার বা অন্য কিছুই ছিল না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অজেয় একমাত্র প্রকৃতি ও পু(ষ ও ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন। প্রকৃতি ও পু(ষ বিষু(র স্বরূপ থেকে পৃথক। কাল নামে বিষু(র অপর এক রূপের দ্বারা প্রকৃতি ও পু(ষ সৃষ্টিকালে পরস্পর সংযুক্ত(ও প্রলয়কালে বিযুক্ত হন। তখন এই জগতকে একটি সমুদ্রে পরিণত করে পরমেশ্বর নাগপর্যঙ্কে শয়ন করেন। তারপর জাগ্রত হয়ে ব্রহ্মারূপে পুনরায় সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য তাঁরই তিন নাম – ব্রহ্মা, বিষু(ও শিব। ... নার বা জলে অয়ন বা আশ্রয় করে থাকেন বলে ভগবানের আরেক নাম নারায়ণ। তিনি বরাহ রূপ ধারণ করে পাতাল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবীর জলে নিমগ্ন না হয়ে সমুদ্রের উপর নৌকার ন্যায় ভাসতে থাকেন। তারপর নারায়ণ পৃথিবীকে সমান করে তার উপরে পর্বত স্থাপন করে সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত(করেন।

ব্রহ্মার জঘন থেকে অসুরদের, মুখ থেকে দেবতাদের, পার্শ্বদেশ থেকে পিতৃগণ জন্ম নিয়েছিল। ব্রহ্মা রজোমাত্রাত্মিকা তনু গ্রহণ করে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। রজোপ্রধান অন্য দেহ ধারণ করাতে ব্রহ্মার খুধা ও কোপ জন্মাল। সে সময় যারা রখ্খ'া-কর বলেছিল তারা হল রাখ্খস এবং যারা ভখ্খণ-কর বলেছিল তারা য'খ্খ' হল। ক্রমে গন্ধর্ব, অপ্সর, পিশাচ, কিন্নর, পশুপাখি, মৃগ ও উরগ সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা ধ্যানে যে মানসপ্রজা সৃষ্টি করেছিলেন তাদের দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি না হওয়ায় নয় মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। আর তাঁর ত্রে(াধ থেকে (দ্র জন্মাল। ব্রহ্মার আদেশে রুদ্র স্ত্রী ও পু(ষরূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে প্রজা সৃষ্টির পথ সুগম করে তুলেছিল।

ভারতে দুটি মহাকাব্য লিখিত হয়েছে। রামায়ণ এবং মহাভারত। রামায়ণে আছে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনালেখ্য। এই দশরথনন্দন অযোধ্যার রাম – বিষু(র অবতার। সুতরাং নতুন কোন দেবতা নয়। আবার নতুন একটি রূপ ধারণ করার জন্য নতুন দেবতাও বটে। ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর পত্নী সীতা অন্যতম পূজ্য দেবতাযুগল। সেইসঙ্গে পূজালাভ করে বসে রামভক্ত বীর হনুমান। কখনো রামসীতার সঙ্গে ভাই ল'খ্খ'ণ।

মহাভারতে সে রকমভাবে কোন নির্দিষ্ট দেবতার মহিমা কীর্তন করা মুখ্য দায় ছিল না। তবু প্রধানত বাসুদেব কৃষ(ও তাঁর সখা অর্জুনের প্রশস্তি কীর্তিত হয়। মহাভারতে রাধা নেই। নেই রাধাকৃষ(যুগলরূপে পূজা। মহাভারতে আছে কৃষ(ার্জুন।

সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শন বিশেষ ভাবে বিবেচ্য – পুরাণকারগণ সাংখ্য মতবাদ দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। উপনিষদের পরবর্তীযুগে এই ভাবনা বিকশিত

হয়েছিল। সাংখ্যদর্শনে দুটি সত্ত্বা আছে – পু(ষ ও প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম মহত্তত্ত্ব এবং তার পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্ব।

অহঙ্কারতত্ত্বের দুই প্রকার পরিণাম – পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং দুই প্রকার ইন্দ্রিয় (বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং আন্তর-ইন্দ্রিয়)। বাহ্য-ইন্দ্রিয় আবার দুই প্রকার – কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক, হস্ত, পাদ, লিঙ্গ ও গুহ্য) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রবণ, ত্বক, চোখ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ)। মন হল আন্তর ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্র থেকে জন্মায় পঞ্চভূত (ি'খ'তি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ)। প্রকৃতি সহিত প্রাকৃত পদার্থ ২৪টি। পু(ষ এক। সব মিলিয়ে মোট ২৫টি তত্ত্ব। এই পঁচিশটি তত্ত্ব দিয়ে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি ও পু(ষ অনাদি ও নিত্য। পু(ষ অকর্তা। প্রকৃতিই প্রধান। প্রকৃতি বস্তু। তার উপাদান কারণ হয় না।

তো এই হল প্রচলিত ধর্ম ভাবনায় নানা সম্প্রদায়ের দেবদেবী ও ঈশ্বরের কথা।

অগ্নি উপাসক ইরানীরা আজো অহুরমাজদার পূজা করে।

একেশ্বরবাদী ইহুদীরা করে জিহোভার বন্দনা।

খৃস্টধর্মে অর্চনা হয় পরমপিতা প্রভুর, তাঁর সন্তান যীশু এবং যীশুমাতা মেরির।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ আরাধনা করে আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রসুল হযরত মহম্মদের।

হিন্দু ভাবধারায় একজন পরমেশ্বরের অর্চনা তত্ত্বগত। প্রকৃতপ'খে' পূজা হয় বিষ্ণু(, শিব, রাম, কৃষ(, হনুমান, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি বহুবিধ দেবদেবীর।

আদি বৌদ্ধদের কোন ঈশ্বর-দেবদেবী নেই। তাদের পূজা মূলত তথাগত বুদ্ধের। পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যেও বহুবিধ দেবতার উদ্ভব হয়।

জৈন সম্প্রদায়ের মানুষেরাও প্রধানত মহাবীর এবং অন্যান্য তীর্থঙ্করের পূজা করে থাকে। পরে অন্যান্য দেবদেবীরা কল্পিত হন।

সৃষ্টি নিয়ে বাইবেলে পরিচ্ছন্নভাবে যা বলা হয়েছে তা ইহুদী খৃস্টান এবং মুসলমানদেরও কথা। হিন্দু ভাবনায় সৃষ্টির ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। তা এক এক শাস্ত্রে এক এক রকম। বাইবেলের মতো সুনির্দিষ্ট নয়।

স্রষ্টা ছেড়ে অতঃপর আমরা যাব সৃষ্টির আরেক ব্যাখ্যানে।

৪। তৃতীয় পর্ব । বিজ্ঞান ভাবনায়

৪.১। বিজ্ঞান সম্পর্কে দুচার কথা

ঈশ্বর ও দেবতা নিয়ে ধর্মভাবনায় যত কথা আছে, আমরা তার সামান্য কিছুর নাগাল পেলাম। সৃষ্টির কথা সেখানে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তা নিয়ে সঠিকভাবে কেউ মাথা ঘামায়নি। সৃষ্টির যথাযথ ব্যাখ্যায় নিয়োজিত বিজ্ঞান।

এই জগৎ কি মিথ্যা বা মায়া? একমাত্র ঈশ্বরই সত্য? অদৃশ্য ঈশ্বর সৎ না হয় হলেন, কিন্তু জগৎ অসৎ মিথ্যা বা মায়া – এটা কি বাস্তবে মানা যায়? শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, চোখের সামনে যা দেখছি, তা কি অসৎ হয়? গাছপালা, পশুপাখি পুত্রকন্যা মানুষজন নদনদী পাহাড়পর্বত ঘরবাড়ি জামাকাপড় – এসব কেউ অসৎ মিথ্যা বা মায়া ভাবে না। তা ভেবে জীবন কাটাতে পারে না। যে খাদ্য খেয়ে খিদে মেটে, তা কি কেউ অসৎ বলে ত্যাগ করবেন? অবশ্যই করবেন না। তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে অসৎ খাদ্য খাবেন, অসৎ জামাকাপড় পরবেন, অসৎ বাসস্থানে বসবাস করবেন এবং অসৎ গাড়িঘোড়ায় চেপে হিল স্টেশনে বেড়াতে যাবেন। সৎ ঈশ্বরের আরাধনা করা তো ঠিক আছে, কিন্তু জগৎকে অসৎ মিথ্যা মায়া বলা নিছক অসত্যভাষণ।

বিজ্ঞান সত্যসন্ধানের অমোঘ হাতিয়ার। এখানে জগৎ সৎ। ঈশ্বর? জানা নেই।

অনেক বিজ্ঞানী বিজ্ঞানচর্চার ফাঁকে ফাঁকে ঈশ্বরচর্চা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন। বিজ্ঞান সোজাসুজি ঈশ্বর নিয়ে চর্চা করতে পারে না। ঈশ্বর বস্তুময় নন। ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন তথ্য হতে পারে না। বিজ্ঞান যেটা পারে তা হল সৃষ্টিকে বোঝা। জগতের আদবকায়দা খুঁজে দেখা।

বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত তথ্যকে কোনো মানুষ অস্বীকার করেন না। বিজ্ঞানী কিংবা অবিজ্ঞানী সকলেই আবিষ্কৃত তথ্য ও নিয়মাবলী সত্য বলে মেনে নেন। যুক্তি(সম্মত বলেই মেনে নিতে বাধ্য হন। তারপর তারা তাদের বিশ্বাসের জমিটি হয়তো আবার গোছগাছ করে নেন। আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি থেকে সৃষ্টি ও সৃষ্টিরহস্য বুঝতে চেষ্টা করব। আর সেই সঙ্গে দেখতে চেষ্টা করব যে তা থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে কোন হদিশ মেলে কিনা।

আমরা এখন বিজ্ঞানকে মানি। খুব মানি বলবো না, উপর উপর মানি। বিজ্ঞানের হাত ধরে চলা প্রযুক্তিকে আরো বেশি করে মানি। কেননা প্রযুক্তির কলাকৌশলে আমরা

আকণ্ঠ মুগ্ধ। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা উৎপন্ন সুফলগুলি উপভোগ করতে অতীব উদগ্রীব। আধুনিক সভ্যতা শুধু শহরে নগরে কী বন্দরে নয়, গ্রামেগঞ্জে খেতেখামারে হাটেমাঠেবাটে এককথায় সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ভোগ্যপণ্য উপভোগ না করে জীবনধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব।

পাশ্চাত্যে নবজাগরণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রার শুরু। এখনো তা অব্যাহত। স্টিম ইঞ্জিন আর বিদ্যুতের আবিষ্কারের ফলে কলকারখানা স্থাপিত হয়। কালে কালে বিবিধ পণ্যের বিশাল জগতের সূচনা করে। রেডিও-ফ্রিজ-টিভি-এয়ারকণ্ডিশনার-ওয়াশিংমেশিন-মোটরগাড়ি-রেলগাড়ি-জাহাজ-উড়োজাহাজ-মেট্রোরেল-মনোরেল-রোপওয়ে কত কি ব্যবস্থা আছে। কত উন্নত হয়েছে রোগনির্ণয় করার উপকরণ, ওষুধপত্র সার্জারি, মাইক্রোসার্জারি ইত্যাদি। উন্নত হয়েছে বায়োটেকনোলজি। হয়েছে ফলনের বৃদ্ধি। মানুষের চরিতাভিধান লেখা থেকে কোষের মধ্যে যে অণুসজ্জায়, সেই জিনের স্বরূপ পর্যন্ত বস্তুগত হল বলে। চাঁদে যন্ত্র নয়, মানুষ পর্যন্ত পা রেখেছিল সেই কবে! এই তো সেদিন মঙ্গলগ্রহ থেকে আমরা খুবলে এনেছি মঙ্গলময় কিছু ধূলো-মাটি-পাথর। দেবগুরু বৃহস্পতির গর্ভে আছড়ে পড়েছিল 'সুমেকার লেভি' নামের ধুমকেতুর ভাঙা টুকরোগুলো আর দেবগুরুর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে আগুনের প্রবল প্রতাপ। সেসব আমরা ঘরে বসে দেখেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কী আশ্চর্য কেরামতি!

হিসেব কষে দেখুন, কত অল্প সময়ের মধ্যে এই সাফল্য এসেছে। এই নবজাগরণের সূত্রপাত মাত্র পাঁচশ' বছরের পুরোনো কথা। কোপার্নিকাসের আবিষ্কার থেকে। আর বিংশ শতাব্দীর অবদান তো অসামান্য। হ্যাঁ, এই শতাব্দী দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে ঠিকই। তবে প্রযুক্তির একাধিক দিগন্তও খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞান পৌঁছে গিয়েছে সূর্য-গ্রহাদি ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে, মহাকাশের কোন সুদূর অতীতে, ব্রহ্মাণ্ডের তারকাপুঞ্জে, বস্তুর গভীরে লুকিয়ে থাকা হৃৎপিণ্ডে, প্রাণময় বস্তুর জটিলতম গঠনে।

সবার আগে একটা কথা বোঝা দরকার। বিজ্ঞান আসনে একটি বিশেষ ধরণের চর্চার ধারা। যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে এই ধরণের চর্চা প্রযুক্ত হয়, সেটাই বিজ্ঞানসম্মত চর্চা হয়ে উঠতে পারে। এই ধারা অনুসরণ করে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। বাস্তব জ্ঞান অর্থাৎ কিনা বস্তুগত যথার্থ জ্ঞান।

বিজ্ঞান কোন আপ্তবাক্য মেনে নেয় না বা পরী'খ্‌খা'বিহীন কোন বিশ্বাস মেনে নেয় না। কোন মনে-হওয়া-হয়ি নেই এখানে। যা বোঝাতে চান, তা হাতেনাতে যাচাই করে দেখান। তথ্যে ও তত্ত্বে। যুক্তি ও প্রমাণে। বিজ্ঞানের বিশ্বাস একান্ত যুক্তিপ্রমাণ নির্ভর। শুধু বিশ্বাস নয়। যাচাই করার জন্য নিরী'খ্‌খা-তত্ত্ব-প্রয়োগ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিরী'খ্‌খা থেকে একটা ধারণা গড়ে নিতে হবে। তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়াবে

একটি তত্ত্ব বা থিয়রি। সেই তত্ত্ব থেকে কোন পূর্বাভাষ পাওয়া চাই। পরী'খ্‌খা করে ওই পূর্বাভাষটির সত্যতা যাচাই করা হবে। যদি পরী'খ্‌খা'লব্ধ ফলাফল আগাম অনুমানের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে তত্ত্বটা টিকে গেল। নয়তো তত্ত্বটা নিয়ে আরো ভাবতে হবে। এটাই সাধারণভাবে বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি। সত্যসন্ধানের পথ। অনেক সময় একজন বিজ্ঞানী পারেন না প্রত্য'খ্‌খ' একটি পরী'খ্‌খা করে উঠতে। তখন আমরা পরো'খ্‌খ' প্রমাণের খোঁজ করি।

প্রশ্ন করা মানুষের চিরকালের স্বভাব। বিজ্ঞানীর তো আরো বেশি। তাদের প্রশ্ন করা চলতেই থাকে, চলতে থাকবে বুঝি অনন্তকাল ধরে। উত্তর পেলেও প্রশ্নের শেষ নেই। জানারও শেষ নেই। এভাবে জানা, অজানাকে জানা, অজানাকে জানার বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলা, আরো অজানাকে খুঁড়ে বার করা এসব নিয়ে বিজ্ঞানের কাজকারবার। যোগ বা ধ্যান করে বিজ্ঞানসাধনা হয়না। আর বিজ্ঞান নয় কোন ম্যাজিক। এখানে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে না। চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলে আপ্লুত না হয়ে জানতে চেষ্টা করতে হবে ঐ ঘটনা ঘটার কারণ কী। নির্দ্বিধায় কেউ কিছু বললেই মেনে নেবে না। যাচাই করা হলে তারপরে মানামানি।

এরকম হয়েছে যে একদা বিজ্ঞানের কিছু সত্য বেশ কিছুকাল ধরে সত্য ছিল। নতুন আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল সেই সত্যটা আর সত্য নেই অথবা সম্পূর্ণ সত্য থাকেনি। অর্ধসত্য বা আংশিক সত্য হয়ে উঠেছে। অর্ধসত্য বা আংশিক সত্য কি সত্য? নাকি তা মিথ্যা? আসলে তা সত্যও বটে আবার মিথ্যাও। খানিকটা সত্য এবং খানিকটা মিথ্যা। অনেক ে ত্রেই, সত্য নিছক সত্য এবং মিথ্যা নিছক মিথ্যা, এমন সরল হয়না। সংজ্ঞা দিয়ে সত্যকে যদি একটা গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখা যায়, তবে গণ্ডির ওপারে মিথ্যা। কিন্তু সত্য-মিথ্যার সীমান্তে দাঁড়ালে অনেক হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। দিনটা বোঝা যায়, রাতটাও বোঝা যায়। কিন্তু দিনরাতের মাঝখানে সকাল কিংবা সন্ধ্যার বিভেদসীমা মুহূর্ত দিয়ে বাঁধা শক্ত।

টলেমির ভুল ধরেন কোপার্নিকাস। তাঁর হিসাব শুদ্ধ করেন কেপলার। গ্যালিলিও দেখালেন, অ্যারিস্টটল ভুল করেছেন। নিউটন যে গভীর বিশ্বসত্য আবিষ্কার করে যান তা আইনস্টাইন এসে সংশোধন করলেন। ডালটন যে অবিভাজ্য পরমাণুর কথা বলেছিলেন, টমসন তার হৃদয় ভেদ করে বার করলেন আরো ছোট এক কণা — ইলেকট্রন। একসময় ভাবা হয়েছিল যে এই সৌরজগতটাই বিশ্বজগৎ। পরে দেখা গেল জগৎ আরো বড়ো। অনেক অনেক বড়ো। একটা ছায়াপথ বা একটা নীহারিকা নয়। কয়েক লাখ তারকাপুঞ্জ নিয়ে গড়া এই বিশ্ব।

এ সব দেখেশুনে বার্নার্ড শ' লিখেছিলেন — ধর্ম সবসময় সঠিক। ধর্ম সব সমস্যার সমাধান করে দেয় এবং জগৎ থেকে সমস্যা দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে। ধর্ম দেয়

নিশ্চিন্তি, স্থায়িত্ব, শান্তি এবং পরমত্ব। যে উন্নতিকে আমরা ভয় পাই, তা থেকে ধর্ম আমাদের র'খ্খ'া করে। বিজ্ঞানের কাজ ঠিক উলটো। বিজ্ঞানের সবসময় ভুল আর ভুল নিয়ে চলা। এ দশটা সমস্যা সৃষ্টি না করে কোন একটা সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

বিজ্ঞানের জ্ঞান অজ্ঞানকে উন্মোচিত করে। এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরো সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে। এভাবেই জগতে রহস্যের সমাধান হয়ে চলেছে ও নতুন রহস্যের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বৃহত্তর ে'খ'ত্রে উত্তরণ হচ্ছে। আদিতে কোন মহাজ্ঞানী যাই বলে যান না কেন, সেটা যাচাই না করে মেনে চলা বিজ্ঞানে মানা।

আমরা জানি, কার্য থেকে কারণ খোঁজা হয়। সেই কারণও অন্য কারণের কার্য। এমনিভাবে কার্যকারণের পরম্পরা চলতে থাকে। তা অনুসরণ করে সমস্যার গভীরে যাওয়া হয়। কতদূর এ পরম্পরা চলে? সে প্রশ্নের জবাব এখনো দেওয়া যাবে না। আস্তিক দার্শনিকেরা শেষ কারণ বলেছেন ঈশ্বর। তারপর আর কারণ হয়না। বিজ্ঞানে এমন ভাবনা অচল। কারণ বস্তুর কারণ বস্তুই, অবস্তু নয়। বাস্তবতার কারণ বাস্তবতাই, অবাস্তব কিছু নয়।

মীমাংসার জন্য তর্কযুক্তি হয়। তা সুতর্ক। স্রেফ তর্ক করে বিপ'খ্খ'কে হারানো জন্যও তর্কযুক্তির প্রয়োগ হয়। তা কুতর্ক। তর্ক জুড়তে হলে 'কেন' প্রশ্ন করতে হয় বটে কিন্তু কেন দিয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর হয় না। কিছু ে'খ'ত্রে তো প্রশ্নই হয় না। কেন কুকুরের দাঁড়ি সবুজ? কেন মানুষের তৃতীয় নয়ন ফুটে ওঠেনি? এসব যথার্থ প্রশ্ন নয়। তাই যথার্থ উত্তর হয় না।

আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কেন প্রশ্নটার উত্তর খোঁজা ঠিক বিজ্ঞানের কাজ নয়। প্রকৃতিজগতে 'কেন' নেই, আছে 'কীভাবে'। আমরা কীভাবে জগতের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে গেলাম, সে কথাটা জানার চেষ্টা করি। বস্তুর বর্তমান অবস্থা জানতে বস্তুর পূর্বতন অবস্থা কী ছিল, জানতে চেষ্টা করি। বস্তুর স্বরূপ বুঝতে চাই। বর্তমান থেকে অতীতে যাই। দৃশ্যমান জগৎ থেকে অদৃশ্য জগতের দ্বারদেশে। সীমিত গণ্ডী থেকে বৃহত্তর গণ্ডীতে চলে যাই। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করি। জানার বৃত্তটা বেড়ে চলে কেননা অজানার বৃত্তটাও একই সঙ্গে আবিষ্কৃত হতে থাকে। যা হয়েছে তা কীভাবে হল —এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা 'কেন'র উত্তর পেতে চেষ্টা করি। কেন প্রশ্নটাই উদ্দেশ্যমূলক। মনে হয় স্রষ্টা বা কর্তা বুঝি কোন উদ্দেশ্য থেকে ওই কার্য করেছেন। 'কেন'-র উত্তর স্রষ্টার ভাবনার মধ্যে নিহিত। কেন হল বললে আগে থেকে এই হওয়ার একজন কর্তা আছেন, ধরে নেওয়া হয়।

সৃষ্টির শুরু বিশ্বসৃষ্টি থেকে। বিশ্বসৃষ্টি মানে হল বস্তুর সৃষ্টি। একবার হয়ে যাওয়ার পরে জগৎ বিবর্তিত হয়ে চলেছে। নানা রূপে তার প্রকাশ হচ্ছে। সমগ্র সৃষ্টিকে আমরা

প্রথম পর্যায়ে তিনটি পর্বে ভেবে নিতে পারি — বিশ্বসৃষ্টি, তারামণ্ডল সৃষ্টি ও ন'খ্খ'ত্র সৃষ্টি। বিশ্ব, মহাবিশ্ব, বিশ্বজগৎ — একই অর্থ বহন করে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি
তারামণ্ডল সৃষ্টি
ন'খ্খ'ত্র সৃষ্টি - আদিম ন'খ্খ'ত্র।
- পরবর্তী পর্যায়ের ন'খ্খ'ত্র।

ন'খ্খ'ত্রদল কখনো গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে বৃহৎ পরিবার হিসেবে বিরাজ করে। অন্তত এরকম একটা বৃহৎ পরিবারের খোঁজ আমরা বিস্তারিত জানি। আরো কিছু এমন গ্রহ-ন'খ্খ'ত্রের খোঁজ আছে। এরকমই একটি নখ্খ'ত্র হল আমাদের সূর্য। গ্রহ-উপগ্রহ-ধুমকেতু নিয়ে জন্মেছে। শুধু তাই নয়, নিষ্প্রাণ বস্তু অন্তত একটি গ্রহে জটিলতম প্রকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে প্রাণ ও চেতনার। সৃষ্টির এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি পর্ব। তিন পর্বে ক্রমান্বয়ে সৌর পরিবার সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে প্রাণ ও জীবকোষে এবং সবশেষে চেতনাসম্পন্ন মানুষের।

সৌর জগৎ সৃষ্টি — সূর্য-ন'খ্খ'ত্র ও গ্রহমণ্ডলীসহ সৌর পরিবারের সৃষ্টি।
পৃথিবী গ্রহে অপ্রাণ থেকে প্রাণময় জগতের সৃষ্টি।
প্রাণ থেকে চেতনা-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব।

অতঃপর বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করব। শুরু করব একটু পিছন থেকে। প্রাচীন সভ্যতায় কিছু মানুষ খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ সম্পর্কে ভাবনা শুরু করেছিলেন। মধ্যযুগে সভ্যতার নবজাগরণের পর আবার তা জাগ্রত হয়। ইতিহাসের হাত ধরে চলতে চলতে আমরা বিজ্ঞানচেতনার এই বিকাশ খানিকটা হলেও বুঝতে পারব। দেখব সত্য ও জ্ঞান ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। এটা না বুঝলে বিজ্ঞান বোঝা যায় না। সৃষ্টিকে বুঝতেও আমরা সফল হব না।

৪.২। জগৎ ও বিশ্ব

ত্রিশ হাজার বছর আগেকার কথা। ফ্রান্সের ব্লাঁকার্ডে মানুষের তৈরি একটি পাত পাওয়া গিয়েছিল যার উপর খোদাই করা হয়েছে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি। জগৎ সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধিৎসার সেটাই প্রথম স্বা'খ্ব'র।

সভ্যতার উষালগ্নে প্রাচীন মানুষের জগৎ সম্পর্কে ধারণাগুলি আজকে খুবই অদ্ভুত লাগতে পারে। তবে সেদিন তাদের কাছে সেই সব অদ্ভুত ধারণাগুলি ছিল সত্য।

কেউ ভেবেছিল — জগৎ বাসুকি নাগের ফণার উপর থিতু হয়ে আছে।

কেউ ভাবত — চারটে মত্ত হাতির মাথার উপর বসে আছে।

অন্য কেউ ভাবত — কচ্ছপের পিঠের উপর থালার মতো বসানো রয়েছে এই জগৎ।

জগৎ বলতে তারা বুঝত শুধু পৃথিবী। তাও গোটা পৃথিবী নয়। কারণ তখনো গোটা পৃথিবীর কথা সকলে জানে না। আকাশে রয়েছে সূর্য-চন্দ্র-তারা। ওই উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডগুলি জগতের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আপাতদৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয়। সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে আরো পাঁচটি স্থির আলোক দীপ্তি। মিটমিটে ন'খ্ব'ত্রের থেকে আলাদা। ওদের গ্রহ বলা হল। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি — তখন এই পাঁচটি গ্রহের কথা শুধু মানুষের জানা। আকাশের চিত্রপটে খোদিত রয়েছে বারটি ন'খ্ব'ত্রমণ্ডল। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। আরো অনেক ন'খ্ব'ত্র রয়েছে আকাশে।

জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার সূত্রপাত গ্রীক সভ্যতায় অধিকতর উজ্জ্বল। গ্রীক ইতিহাস আমাদের গোচরে এসেছে অনেক বেশি বলে হয়তো এমন মনে হয়। তার মানে এই নয় যে অন্যান্য সভ্যতায় বিজ্ঞানভাবনা একেবারে ছিল না। হয়তো কেন নিশ্চিত ছিল। আমরা ঠিকঠাক জানতে পারিনি।

গ্রীসের ইতিহাসে আমরা প্রথম যে মনীষীর খোঁজ পাই, তিনি এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) *থ্যালেস* (আঃ ৬৩৬-৫৪৬ খৃঃপূঃ)। ইনি জানতেন ৫৮৫ খৃস্টপূর্বাব্দের ২৮শে মে সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা। অথচ সেদিন মিডিয়া ও লিডিয়ার যুদ্ধরত সেনারা অকালে অন্ধকার নেমে আসার ভয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিল। থ্যালেস ভাবতেন — জগতের মূল উপাদান হল জল।

মনীষী *অ্যানাক্সিমিনিস* ভাবতেন — বায়ু হল মূল উপাদান। *পিথাগোরাস* (আঃ৫৮২-৫০৭ খৃঃপূঃ) নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত স্কুলের জ্যামিতি থেকে। সামোস দ্বীপের

মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন — পৃথিবী গোলাকার(চাঁদের নেই কোন নিজস্ব আলো।

এফিসাসের *হেরাক্লিটাস* (আঃ৫৩৫-৪৭৫ খৃঃপূঃ) আবার বুঝেছিলেন — এই জগৎ মানুষ বা দেবতার সৃষ্টি নয়। এ এক অনন্তকালের সৃজন(পরিবর্তনশীল এ জগতে এক নদীজলে দুবার স্নান করা যায় না।

জগৎ সম্পর্কে কিছু ভাবনা ছিল অ্যানাক্সোগোরাস এবং এম্পিডকলস-এর। মনীষী *সক্রেটিস* (আঃ৪৭০-৩৯৯ খৃঃপূঃ) এথেন্সের মানুষদের প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন। প্রশ্নহীন আনুগত্য নয়। আর এই প্রশ্ন করতে শেখানোই তাঁর কাল হল। তাঁর হাতে উঠল বিষপাত্র।

অ্যাডবেরার *ডেমোক্রিটাস* (আঃ৪৬০-৩৭০ খৃঃপূঃ) আবার একটা মজার ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। একদিন সমুদ্রসৈকতে হাতে আপেল নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন — এই গোটা আপেল কাটলে আমরা দুটো টুকরো পাব, আরো কাটলে এক চতুর্থাংশ, তারপর এক অষ্টমাংশ, এক ষোড়শাংশ ইত্যাদি পেতে থাকব। এমনি করে টুকরো করতে করতে আমরা 'খু'দ্র থেকে আরো 'খু'দ্র অংশে পৌঁছে যেতে যেতে এক সময় নিশ্চয়ই সবচেয়ে 'খু'দ্রতম আপেলকণা পেয়ে যাব। উনি সেই 'খু'দ্রতম কণার নাম দিলেন অ্যাটম। আমরা যাকে বলি পরমাণু।

সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন *প্লেটো* (আঃ৪২৮-৩৪৮ খৃপূঃ)। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন ভারতবর্ষ জয় করতে আসা গ্রীকবীর আলেকজান্দারের শি(ক। ইনিও প্রথিতযশা পণ্ডিত। নাম *অ্যারিস্টটল* (৩৮৪-৩২২ খৃঃপূঃ)। নানা বিষয়ের উপর জ্ঞান আহরণ করে তিনি জগৎ সম্পর্কে এক সমগ্র ধারণা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর মনে হয়েছিল — এই বিশ্বজগৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে। জগৎ গঠিত হয়েছে একটির মধ্যে একটি করে গোলক পুরে। পেঁয়াজের পরতের মতো এরকম মোট আট গোলক আছে। পৃথিবী রয়েছে সমস্ত গোলকের কেন্দ্রে। তার বাইরে একটি গোলকে রয়েছে সন্দীপ্ত সূর্য, আরেকটিতে চন্দ্র। পাঁচটা গ্রহ রয়েছে আর পাঁচ গোলকের পরিধিতে। অষ্টম গোলকে খোদিত অন্যান্য তারকামালা। এমন ধারণার প্রবক্তা যখন স্বয়ং এরিস্টটল, তখন কে তার বিরোধিতা করতে পারে?

সামোস দ্বীপের *অ্যারিস্টার্কাস* (আঃ৩১০-২৩০ খৃঃপূঃ) বলেছিলেন — একেবারে উলটো কথা। সূর্য নাকি জগতের কেন্দ্রে আর পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে। এমনটা কি হতে পারে? যখন অ্যারিস্টটলের মতো প্রথিতযশা পণ্ডিত বলছেন, পৃথিবী হল জগতের কেন্দ্র তখন পৃথিবীই জগতের কেন্দ্র। আর অন্য কথা মানা-না-মানার প্রশ্ন নেই।

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কালে আরো একজন জগতের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তার নাম *ক্লডিয়াস টলেমিয়াস* (১০০-১৭০ খৃঃ)। লোকে তাঁকে বলে টলেমি। অ্যারিস্টটলের আটটা গোলকের ধারণা সঠিক। চন্দ্র

বুধ শুক্র সূর্য মঙ্গল বৃহস্পতি শনি – এই সাতটি দিব্য দীপ্তি প্রথম সাতটি গোলকে আর অন্যান্য স্থির ন'খ্খ'ত্র অষ্টম গোলকে রয়েছে। তার বাইরে স্বর্গলোক। গ্রহকুল ও সূর্য বৃত্তাকার প্রদখি'ণ পথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তার মধ্যে মঙ্গল গ্রহ মাঝেমাঝে সামনে চলতে চলতে হঠাৎ কিছুসময়ের জন্য পিছনে সরে যেতে থাকে। ব্যাপারটা অনেকে ল'খ্খ'্য করেছিলেন। টলেমি এরকম হওয়ার একটা ব্যাখ্যা দিলেন। গ্রহগুলি শুধু বৃত্তাকার প্রদখি'ণ পথে ঘুরছে না, ঘুরছে বৃত্তের মধ্যে আরেকটি ছোট বৃত্তপথে (Epicycle)। গোটা আশি ছোট ছোট বৃত্তপথ অনুমান করলেন বড় প্রদখি'ণ পথে। তা দিয়ে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহগুলির এগিয়ে চলা এবং মাঝেমাঝে পিছিয়ে আসার একটা ব্যাখ্যা দিতে তিনি সফল হলেন। সেই থেকে টলেমির লেখা 'অ্যালমাগেস্ট' পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বাইবেল স্বরূপ হয়ে ছিল অনেক কাল। বিশেষ করে স্বর্গলোকের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।

আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী *আর্যভট্ট* (আঃ৪৭৬-?) একটি

চিত্র-১৮। টলেমির জগতে কেন্দ্রে পৃথিবী, অন্য গ্রহ-তারা ও সূর্য প্রদখি'ণরত।

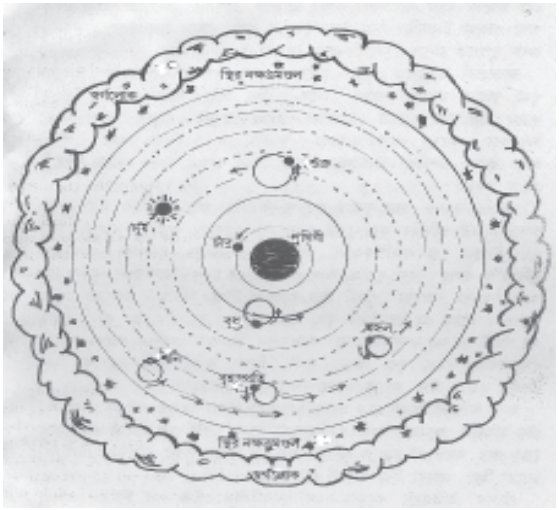

বই লিখেছিলেন 'আর্যভট্টিয়' নামে। তিনি জানতেন পৃথিবী নিজের অ'খ্খ'রেখায় ঘুরতে ঘুরতে দিনরাতের সময়সীমা বদলে চলেছে। আর্যভট্টই একমাত্র ভারতীয়দের গর্ব। অন্য মুনিঋষিগণ স্বর্গলোক, বিষ(লোক, ইন্দ্রলোক, নানা প্রকার দিব্যলোক, পাতাল, কতশত ভুবন আছে, তা নিয়ে গবেষণা করেই গেলেন।

এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। হাজার বছরেরও বেশি সময়। ইউরোপে এল নবজাগরণ। যে বিপুল ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল গ্রীসে, তা আরবদের দ্বারা ইউরোপে পুনরুজ্জীবিত হল।

বিশ্বজগতের স্বরূপ নিয়ে টলেমির পর সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন পোল্যাণ্ডের এক ধর্মযাজক *নিকোলাস কোপার্নিকাস* (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃঃ)। খালি চোখে আকাশ পর্যবে'খ্খ'ণ করতে করতে তিনি আবিষ্কার করেন যে জগতটা যেমন সকলে ভাবছে মোটেই তেমন নয়। পৃথিবী নয়, সূর্য রয়েছে জগতের কেন্দ্রে। এই সার সত্যটা বুঝতে পারলেও চার্চের ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করতে সাহস করেননি। মধ্যযুগে প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। অবশ্য আজো নয়। চার্চ যে ধর্মবিশ্বাস থেকে জগতের ব্যাখ্যা করেছে, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার বিপদ অনেক। পঁচিশ বছর ধরে তিনি চুপচাপ ছিলেন। একেবারে মৃত্যুশয্যায় এসে তিনি তাঁর বইটি ছাপার জন্য অনুমতি দিলেন।

ইতিমধ্যে একটি যুগান্তকারী যন্ত্র, টেলিস্কোপ, আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষই তা আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্রটিই পেরেছিল দূরের মানুষকে কাছে টানতে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বহুদূর ব্যাপ্ত মহাকাশে। ইটালির পিসা নগরের *গ্যালিলিই গ্যালিলিও* (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ) নিজের ১৬১০ খৃষ্টাব্দে টেলিস্কোপ বানিয়ে আকাশ দেখতে বসলেন।

তিনি আবিষ্কার করলেন যে বৃহস্পতি গ্রহটির চারধারে চারটি উপগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এদের একথা আগে জানা ছিল না। ঈশ্বর কি তবে এদের নির্মাণ করেননি?

সহকর্মী প্রফেসর ক্রোমিনিনিকে এই উপগ্রহের কথা বলেছিলেন। উনি তা বিশ্বাস করছেন না।

বললেন – কই আগে তো এমন কথা শুনিনি। আপনি ভুল বলছেন। বৃহস্পতির কোন উপগ্রহ থাকতে পারে না।

– ঠিক আছে, একবার টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে দেখুন না। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

– আমি যখন জানি যে বৃহস্পতির কোন উপগ্রহ নেই, তখন খামোখা যন্ত্রে চোখ দিতে যাব কেন?

প্রফেসার ক্রোমিনিনি টেলিস্কোপে চোখ রেখে সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকলেন। অটল রইলেন তার বিশ্বাসে। আর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে গেলেন। একে কি অন্ধবিশ্বাস বলা যায়? পরে সারা দুনিয়া জেনেছে যে গ্যালিলিও ঠিক কথাই বলেছিলেন। কথাটা এজন্যে বলা যে কখনো কখনো মানুষ অন্ধবিশ্বাসের জোরে চোখের সামনে ঘটা বাস্তবতাকেও অক্লেশে অস্বীকার করতে পারে। তাহলে দেখুন, বিশ্বাসে কখনো কখনো অবস্তুও মেলে।

গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্বের কথা জানতেন এবং সেই ধারণার কথা প্রচার করতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানে পরী'খ্খা'-নিরী'খ্খা' করার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে প্রথম পরী'খ্খা'-বিজ্ঞানী (Experimantal Scientist) বলা যায়। তিনি গতিবিদ্যার জনকও বটে।

বাইবেল-বিরোধী বিশ্বতত্ত্বের কথা বলে কোপার্নিকাসের শাস্তি হয়নি। শাস্তি হয়েছিল গ্যালিলিওর। তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁর তত্ত্ব নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এর কারণ বোধ হয় এই যে গ্যালিলিওর কাজকর্ম ক্রমশ চার্চ-বিরোধী জনচেতনা জাগ্রত করছিল। চার্চ তাতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সুখের কথা, ৩৫০ বছর পরে হলেও ১৯৯২ সালে ভাটিকান চার্চ বারো বছর অনুসন্ধান করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গ্যালিলিও সঠিক ছিলেন, তবে চার্চের ভুলটাও ছিল নিতান্ত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিওর জিত হয়। চার্চের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতেও মহত্ত্ব আছে।

জোহানেল কেপলার (১৫৭১-১৬৩০ খৃঃ) গ্রহগুলির প্রদখি'ণের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সূর্যকে তিনি স্থাপন করলেন গ্রহের উপবৃত্তাকার পথের দুটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রে। আগে ধারণা ছিল গ্রহের প্রদখি'ণ পথ হল একটি বৃত্তাকার। কেপালার দেখালেন — না তা নয়। গ্রহগুলির প্রদখি'ণ পথ উপবৃত্তের মতো।

আরো একটা মজা হল, প্রত্যেক গ্রহ তার প্রদখি'ণ পথের এক এক অংশে এক এক রকম গতিতে ছুটছে। কোথাও আস্তে আবার কোথাও জোরে। অবশ্য তারও একটা নিয়ম আছে।

টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১ খৃঃ) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের হিসেব কষে বললেন — ৮০ লাখ কিলোমিটার।

কিছুদিন পরে কেপলার বললেন — ওটা হবে ২ কোটি ৪০ লাখ কিলোমিটার।

তারপরে গিওভান্নি ডোমেনিকো ক্যাসিনি (১৬২৫-১৭১২ খৃঃ) সেটা বাড়িয়ে করলেন — ১৪ কোটি কিলোমিটার।

সৌরজগতকে অনেক ছোটখাট ভাবা হয়েছিল। আসলে তা নয়। এটি অনেক বড়ো। খেয়াল করে দেখবেন — মানুষের পর্যবে'খ্খ'ণ খ'মতা যত বেড়ে যাচ্ছিল, সৌরজগতের

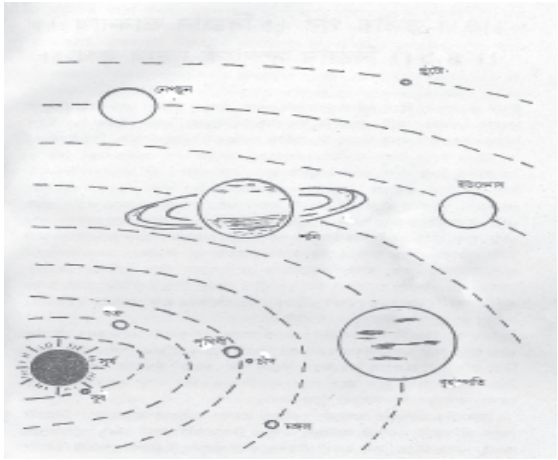

চিত্র-১৯। বিজ্ঞান ভাবনায় সৌরজগৎ - সূর্য কেন্দ্র করে গ্রহকুল প্রদখি'ণরত।

আয়তনও সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে জগতের আয়তন বৃদ্ধি? হ্যাঁ অনেকটা সেই রকমই বটে!

১৭৮১ সালে খোঁজ মিলল সপ্তম গ্রহ ইউরেনাস-এর। টেলিস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ওটাই হল প্রথম গ্রহ যা যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে আবিষ্কার করা হল। এখন আর উপগ্রহ নয়, খোঁজ মিলল আস্ত একটা গ্রহের যার কথা আগে কেউ কোন শাস্ত্রে বলে যাননি। আবিষ্কারক বৃটিশ বিজ্ঞানী *উইলিয়াম হার্সেল* (১৭৩৮-১৮২২ খৃঃ)।

এযাবৎ নয়টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্য জ্যোতিষ-কল্পিত রাহু-কেতু নেই। আছে ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো।

বিজ্ঞানে *স্যর আইজাক নিউটন* (১৬৪২-১৭২৭ খৃঃ) ধূমকেতুর মতো উদিত হলেন। তাঁর আবিষ্কার বিপ্লবের সূচনা করল। শুধু বিজ্ঞানে নয়, তাঁর প্রভাব পড়ল দর্শন ও সমাজ-জীবনেও। তিনি যে বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করলেন, তা তাঁর নামেই খ্যাত হল। আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষের সূত্র। বিশ্বজগতের প্রথম সার্বিক নিয়ম এটি। আলো নিয়ে গবেষণা করলেন।

গ্যালিলিও আর নিউটনের হাতে রচিত হল ধ্রুপদী বিজ্ঞান। জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এক অমোঘ নিয়মে। কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে বাঁধা সে নিয়ম। সর্বত্র বিরাজ করছে নিয়মের শৃঙ্খলা। সুনিয়ন্ত্রিত ও অনন্ত। এর ফলে সমকালীন দার্শনিক ভাবনায় প্রতিফলিত হল যান্ত্রিকতা ও যুক্তিবাদ।

নিউটনের বন্ধু *এডমণ্ড হ্যালি* (১৬৫৬-১৭৪২ খৃঃ) আবিষ্কার করে ফেললেন মহাকাশের আরেক বিচিত্র বস্তু – ধূমকেতু Comet। নির্দিষ্ট একটি ধূমকেতুকে দেখা যাচ্ছিল ছিয়াত্তর বছর পর পর ফিরে আসতে। ধূমকেতুটি ১৪৫৬ সালে এসেছিল, তারপর ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে ফিরে আসে।

এই সব নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে গ্রহ-ন(ত্র-ধূমকেতু-তারামণ্ডল নিয়ে গড়া বিচিত্র মহাকাশের একটা চালচিত্র ত্র(মশ ফুটে উঠতে থাকে। এই জগৎটা কেমন? কী তার আকার? কীই বা তার ব্যাপ্তি?

অষ্টাদশ শতকের বৃটিশ যন্ত্রবিদ ও দার্শনিক *টমাস রাইট* (১৭১১-১৭৮৬ খৃঃ) জগতের সামগ্রিক ছবি নিয়ে ভাবতে বসলেন। তখন বেশ কিছু নতুন তথ্য হাতে এসে গিয়েছে।

মনে হচ্ছে জগৎটা যেন এক বিশাল গোলক। অজস্র ন'খ'ত্র দিয়ে ভরা। কাছের ন'খ'ত্র খালি চোখে দেখা যায় বটে কিন্তু দূরের ন'খ'ত্র ধরা পড়ে কেবলমাত্র টেলিস্কোপে। আরো দূরের ন'খ'ত্রপুঞ্জ টেলিস্কোপেও ঠিকভাবে ধরা পড়ে না। দেখা যায় আলোর ঝর্ণা হয়ে। এদের বলে নীহারিকা (Nebula)। কোটি কোটি ন'খ'ত্র দিয়ে তৈরি এরা।

সাধারণভাবে ন'খ'ত্রগুলো মোটামুটি একই তলে আছে এবং একই অভিমুখে ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কে জানে! আমাদের সূর্যকে মনে হচ্ছে চ্যাপটা থালার মতো এই ডিস্কের মধ্যেকার এক ছোট ন'খ'ত্র।

রাইট মোটামুটিভাবে আমরা যে তারামণ্ডলে (Galaxy) রয়েছি, সেটাই দেখেছিলেন। তিনি বিশ্ব বলতে আমাদের তারামণ্ডলের কথাই বুঝেছিলেন।

জার্মান বিজ্ঞানী-দার্শনিক *ইমানুয়েল কান্ট* (১৭২৪-১৮০৪ খৃঃ) ভারী সুন্দরভাবে বলেছিলেন – আমরা বোধহয় বাস করছি দ্বীপের মতো এক বিশ্বে। কোন এক দ্বীপে-বিশ্বে (Island Universe)। এমনি আরো অনেক দ্বীপ-বিশ্ব আছে এ জগতে। এরা ভেসে বেরাচ্ছে মহাবিশ্বে।

কান্ট এবং পরে *পিয়েরে সাইমন মার্কুইস দ্য ল্যাপলেস* (১৭৪৯-১৮২৭ খৃঃ) দুজনেই সৌরজগৎ সৃষ্টি নিয়ে এক ধারণার কথা বলেন। সৌরজগৎ শুরু হয়েছিল গ্যাসের মেঘ থেকে। তা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে সূর্যের। পরে অন্যান্য গ্রহের।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এসব দুর্লভ ঘটনা ঘটেছে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে। ভারতে তখনো রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে উঠতে

পারেন নি। বিজ্ঞান নিয়ে আর কে ভাবতে বসবে?

বি(েজগৎ সম্পর্কে ধারণাটা কেমন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল।

প্রথমে মানুষ ভেবেছিল পৃথিবী হল গোটা জগৎ আর আকাশ হল ন'খ'ত্রভরা এক ঢাকনা। তাতে রয়েছে সূর্য-চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহ। তার উপরে আছে ন'খ'ত্রমণ্ডলী। ঠিক কতটা দূরত্বে আছে ওই সব ন'খ'ত্রমালা, সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

পরে জানা গেল, দূর ন'খ'ত্রমালার মধ্যে যে আলোর ঝর্ণা দেখা যায়, তা আসলে অনেক অনেক ন'খ'ত্রের জটলা। অনেক ন'খ'ত্র মিলে তৈরি করেছে সেই সব ছায়াপথ – নীহারিকা। আর অনেক নীহারিকা মিলে সৃষ্টি হয়েছে এই জগতের।

টেলিস্কোপ যন্ত্রে যত ধরা পড়তে লাগল দূর আকাশের আলোকদীপ্তি, জগৎ ততই বড়ো আর জটিল হয়ে ধরা দিতে শুরু করল। তা' বলে মানুষের কৌতূহল তো থমকে যাওয়ার নয়। আরো দূর ন'খ'ত্রের হদিশ পেতে বানানো হতে লাগল বড়ো আর বড়ো টেলিস্কোপ।

এ ব্যাপারে অগ্রণী দেশ হয়ে উঠল মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র। ক্যালিফোর্নিয়ার সান-জোসের মাউন্ট হ্যামিলটন পাহাড়ে ছিল লিক অবজার্ভেটরি – ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি রিফ্রাকটিং টেলিস্কোপ ছিল সেখানে। *জর্জ এলেরি হেইল* ছিলেন স্বনামধন্য টেলিস্কোপ-অবজার্ভেটরি নির্মাতা। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করলেন ৪০ ইঞ্চি ব্যাসের ইয়র্কস টেলিস্কোপ। ১৯১৮ সালে বানালেন ১০০ ইঞ্চি মাপের বিশাল হুকার টেলিস্কোপ – মাউন্ট উইলসন-এ। ১৯৪৮ সালে তৈরি করা হল বিশাল ২০০ ইঞ্চি মাপের হেইল টেলিস্কোপ। বসানো হল ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালোমার-এ।

এডোয়ার্ড পিকারিং (১৮৪৬-১৯১৯ খৃঃ) আর তাঁর সহকারিণী *হেনরিয়েটা লেভিট* (১৮৬৮-১৯১১ খৃঃ) এক অদ্ভুত ধরনের ন'খ'ত্র আবিষ্কার করলেন। তাদের নাম সেফিড ন'খ'ত্র। এজাতীয় ন'খ'ত্রের পরিবর্তনের পর্যায়কাল ও প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। দূরবীনে ধরা পড়ে ন'খ'ত্রের আপাত-ঔজ্জ্বল্য। তা থেকে সিফিড ন'খ'ত্রের দূরত্বের হদিশ মেলে।

এজনার হার্টজপ্রাঙ্গ (১৮৭৩-১৯৬৭ খৃঃ) সেই আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে হিসেব কষে দেখলেন যে ম্যাগেল্লান মেঘপুঞ্জ নামের আলোক-ঝর্ণা রয়েছে একটু-আধটু নয়, প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। এই দূরত্বের মান বোঝা গেল কি? তবে আসুন, একটু বিশদে যাওয়া যাক।

আলোর গতিবেগ ১ সেকেণ্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার। এই গতিবেগ নিয়ে সে যদি ১ বছর চলে তবে আলো যে দূরত্ব অতিত্র(ম করবে সেটাই ১ আলোকবর্ষ দূরত্ব।

১ বছর মানে ৩৬৫ দিন = ৩৬৫x২৪ ঘন্টা = ৩৬৫x২৪x৬০ মিনিট
= ৩৬৫x২৪x৬০x৬০ সেকেণ্ড।

সুতরাং, ১ আলোকবর্ষ = ৩৬৫x২৪x৬০x৬০x৩,০০,০০০ কিলোমিটার।
অর্থাৎ ৯,৪৬,০৮০ কোটি কিলোমিটার।

এবার ভেবে দেখুন, সূর্য থেকে পৃথিবীতে সূর্যালোক ছুটে আসতে পথ অতিত্র(ম করতে হয় ১৪ কোটি ৯০ লাখ কিলোমিটার। সময় নেয় মাত্র ৮ মিনিট ১৬ সেকেণ্ড। তাহলে সূর্য-পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব (সৌরদূরত্ব) তার থেকে আরো কতগুণ দূরত্বের মাপ হল ১ আলোকবর্ষ? ৬৩,৪৯৫ গুণ সৌরদূরত্ব।

মার্কিন বিজ্ঞানী *হারলো শ্যাপলি* (১৮৮৫-১৯৭২ খৃঃ) গবেষণা শুরু করেন আমরা যে জগতের বাসিন্দা তা নিয়ে। ১৯১৮ সালে। মাউন্ট উইলসন পর্যবে'খ্খ'ণ কেন্দ্র থেকে।

বলে রাখা দরকার যে আমাদের তারাজগতের নাম রাখা হয়েছে দুগ্ধসরণী (মিল্কিওয়ে)। শ্যাপলি দেখলেন — সূর্য ও তার গ্রহজগৎ আসলে দুগ্ধসরণী তারামণ্ডলের এক প্রান্তে পড়ে আছে। মোটেই সে তারাজগতের কেন্দ্রবিন্দু নয়। অর্থাৎ জগতের কেন্দ্র নয়।

সে কী কথা! আমরা পৃথিবীর মানুষেরা হলাম অমৃতের পুত্রসকল, ঈশ্বরের নির্মাণ এবং ঈশ্বরের প্রিয়তম, এই জগতের দ্রষ্টা, আমাদের স্থান নেই সৌরজগতের কেন্দ্রে বা তারামণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে? একপ্রান্তে উপে(ত হয়ে পড়ে আছি? এভাবে জগতের কেন্দ্র থেকে কে আমাদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? বিজ্ঞান?

এরকম ভাবনা মোটেই মানুষের কাছে তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না। আমরা নয়, এমন কী, সূর্যও নয় জগতের কেন্দ্র? সেও পড়ে আছে জগতের এক প্রান্তে নগণ্য এক ন'খ'ত্র হয়ে?

আরেক মার্কিন বিজ্ঞানী *হেবার কার্টিস* (১৮৭২-১৯৪২ খৃঃ) গবেষণা করছিলেন কুণ্ডলিত নীহারিকা (Spiral Nebula) নিয়ে। তিনি ল'খ্খ'্য করলেন — দূরের নীহারিকাগুলো যেন আমাদের তারাজগতের মতোই। যেমন, অ্যানড্রোমিডা নামের এক তারাজগৎ আছে এবং তাকে দেখা যাচ্ছে আমাদের তারাজগতের বাইরে।

কার্টিসের চোখে এমনটা দেখা গেলেও বিজ্ঞানী শ্যাপলি তা মানতে রাজি নন। এই প্রশ্ন নিয়ে দুজনের মধ্যে জমে উঠেছে বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত কার্টিসের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হল। আমাদের তারাজগতের বাইরে আরো তারাজগৎ আছে? জগৎ কি তাহলে একাধিক তারাজগৎ দিয়ে তৈরি? হ্যাঁ, তাইতো দেখা যাচ্ছে। জগতটা কী আশ্চর্যরকমের বড়ো আরো বড়ো হয়ে উঠছে।

১৯১৬ সালে মনীষী *অ্যালবার্ট আইনস্টাইন* (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃঃ) আবিষ্কার করেন

আপে'খ'কতার তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। তার উপর ভিত্তি করে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের রূপান্তর ঘটল। নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব রচিত হল। পরের বছর এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরলেন।

মনীষী আইজাক নিউটন যে মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, সেই সূত্র অনুসারে, মহাবিশ্বের সকল বস্তু অন্য সকল বস্তুকে আকর্ষণ করছে। যে বস্তুর ভর যত, ততই তার আকর্ষণ-'খ'মতা। আবার যে বস্তু যত কাছাকাছি অন্য বস্তুকে বাগে পায়, ততই তার আকর্ষণ করার 'খ'মতা প্রবল হয়। ১৬৮৭ সালে বিজ্ঞানের দুর্লভ গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া'-তে এসব কথা লিখে গিয়েছেন বিজ্ঞানী নিউটন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে — তাহলে গোটা জগতে গ্রহ-ন'খ'ত্র-নীহারিকা-তারাজগতে যত বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তারাও তো মহাকর্ষের এই অমোঘ নিয়মের আওতায় পড়ছে। মহাকর্ষের টানে সমস্ত বস্তুরও তো এক জায়গায় জড়ো হয়ে এক মহাপিণ্ডে পরিণত হওয়া উচিৎ ছিল। কই তা হয়নি তো। কেন?

১৬৯২ সালে রিচার্ড বেন্টলি ঠিক এই প্রশ্ন টাই করেছিলেন নিউটনকে। তার উত্তরে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী বললেন — জগৎ যদি এক সীমিত স্থানে আবদ্ধ থাকত, তবে তাই হত। তবে আমি বলছি, জগৎ হল অসীম এবং অনন্ত। ন'খ'ত্রপুঞ্জের বস্তু সেই অসীম মহাজগতে সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। এমনভাবে যে চারদিক থেকে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণের টানে ধরে রেখেছে নির্দিষ্ট জায়গায়। এক জায়গায় জড়ো হতে দিচ্ছে না। অসীম বিশ্ব হওয়ার জন্য এর কোন কেন্দ্র নেই যেখানে সমস্ত বস্তু জড়ো হয়ে যেতে পারে। বিশ্ব হল অসীম, অনন্ত এবং শাশ্বত। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এক শাশ্বত নিয়মে বেঁধে রেখেছেন।

নিউটন এভাবে জগতের সৃষ্টি এবং স্রষ্টা নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দিলেন বটে কিন্তু নিজেই বুঝি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারেন নি নিজের ব্যাখ্যায়। অসীম বিশ্বপরিসরেও এভাবে নিখুঁত ভারসাম্য রেখে বিশ্বের চিরস্থায়িত্ব বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ। প্রায় অসম্ভব। তাহলে বিশ্ব রয়েছে কী করে? ঈশ্বর জানেন। অথচ নিউটনের প'খে' মহাকর্ষের আকর্ষণের জন্য বিশ্বের সঙ্কোচন নাকচ করতে এক প্রসারণের ধারণা করা সম্ভব ছিল। তাহলে অন্তত তাঁর অনন্ত বিশ্বের ধারণাটা মজবুত হত।

১৯১৭ সালে আইনস্টাইন সাধারণ আপে'খ'কতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে বিশ্বের নির্মাণ নিয়ে ভাবতে বসে দেখলেন — জগতটা মোটেই সুস্থিত অপরিবর্তনীয় দাঁড়াচ্ছে না।

জগৎ বলতে তখন আমরা দুগ্ধসরণী তারাজগতকেই বুঝছি। তা এখানে কত ন'খ'ত্রের উদয় হচ্ছে আর বিলয় হচ্ছে। অজস্র ন'খ'ত্রের বস্তুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত এই জগতে মহাকর্ষের আকর্ষণজনিত বল প্রবলতম হলে বিশ্ব ক্রমশ সঙ্কুচিত হত। তখন

জগৎ আর অসীম ও অপরিবর্তনীয় থাকত না। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বিশ্বের এমন সঙ্কোচনের কোন খবর নেই। তাহলে কি ধরেই নেওয়া যায় যে বিশ্বের কোন সঙ্কোচন নেই? একটি মহাপিণ্ডে পরিণত হওয়ার কোন সুযোগ নেই?

এদিকে পরিবর্তনশীল জগতের ধারণাটি আইনস্টাইনের মোটেই পছন্দের নয়। জোর করে আমদানী করলেন তাঁর বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে এক অনাবিষ্কৃত কারণ। তাঁর গণিতের মধ্যে এনে ফেললেন এক রহস্যময় ফ্যাক্টর – গামা ফ্যাক্টর। বলা হল যে গামা ফ্যাক্টরের ধর্ম হল মহাবিশ্বের মহাকর্ষ কাটিয়ে উঠে বিশ্বকে অপরিবর্তনীয় ও সুস্থিত করে তোলা।

বুঝুন, বরেণ্য বিজ্ঞানীর একটি ফ্যাক্টর আমদানীর প্রয়োজনটা কী রকম আশ্চর্যজনক! তাঁর উদ্ভাবিত গণিত যখন পরিবর্তনশীল জগতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তখন তিনি সেই গণিতের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কেননা বিজ্ঞানীর দৃঢ় বিশ্বাস – ঈশ্বর নির্মিত এ জগৎ কিছুতেই অমন পরিবর্তনশীল, অস্থির এবং অশান্ত হতে পারে না। জগতকে হতে হবে সুস্থির, সুস্থিত এবং অবাধ। কেননা স্রষ্টা যে মহান ঈশ্বর।

হল্যাণ্ডের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী *উইহেলম ডি-সিটার* (১৮৭২-১৯৩৪ খৃঃ) ঐ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে অন্যরকম এক বিশ্বের ধারণায় পৌঁছলেন। তিনি ধরে নিলেন যে জগতের মোট বস্তুর পরিমাণ খুবই কম। জগতটা যদি এভাবে বস্তুবিরল ভাবা যায়, তাহলে বিশ্বে বিকর্ষণ শক্তিই প্রবল হয়ে উঠবে। আকর্ষণ শক্তির মান হবে নগণ্য। এমনটি হলে বিশ্ব প্রসারিত হতে বাধ্য। বিশ্বময় বিকর্ষণ শক্তির দাপটে। তখন দূর নক্ষত্র থেকে ভেসে-আসা আলোর বর্ণালী (Spectrum)-তে দেখা দেবে আলোর লালচ্যুতি (রেড শিফট)। যত দূর নক্ষত্র থেকে আলো আসবে, ততই তার লালচ্যুতি বেশি হবে।

লক্ষ্য করবেন, একই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে দুজন বিজ্ঞানী দুটি তত্ত্ব খাড়া করে দুটো ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন। আইনস্টাইনের বিশ্ব হল স্থিরবিশ্ব যেখানে বস্তু আছে কিন্তু গতিহীন অবস্থায়। আর ডি-সিটারের বিশ্ব হল অস্থির প্রসারণশীল বিশ্ব যেখানে বস্তু কম কিন্তু তা গতিময়।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আরো এক বিজ্ঞানী বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা গড়ার চেষ্টা করছিলেন। ১৯২২ সাল নাগাদ। তিনি রুশ বিজ্ঞানী *আলেকজান্দার আলেকজান্দ্রোভিচ ফ্রিডম্যান* (১৮৮৮-১৯২৫ খৃঃ)। বিশ্বকে তিনি আবার অপরিবর্তনীয় ভেবে নিলেন না। বেশি মূল্য দিলেন আপেক্ষিকতাবাদের গণিতকে। তিনি দুটো শর্ত ধরে নিলেন – প্রথমত, যে দিকেই তাকানো যাক না কেন, বিশ্বের চিত্রটা মোটামুটি একই দেখা যাবে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকেই দেখা যাক না কেন, বিশ্বকে আমরা একই রকম দেখতে পাব।

এই অনুমান থেকে ফ্রিডম্যান দেখালেন যে তারাজগতগুলি পরস্পর পরস্পর থেকে দ্রুতহারে দূরে সরে যেতে পারে। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী হাবল ঠিক তাই প্রমাণ করলেন।

ফ্রিডম্যানের শর্ত ধরে জগতের স্বরূপ নির্ণয় করতে বসলে আমরা জগতের তিনটি সম্ভাব্য মডেল খুঁজে পাই।

প্রথম মডেল অনুসারে – বিশ্বের সম্প্রসারণ যদি এমন হয় যে তা বিশ্বের মোট মহাকর্ষ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারে না, তখন বিশ্বের প্রসারণ ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে এক সময় শূন্য হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে বিশ্বের সঙ্কোচন। প্রবল মহাকর্ষের প্রভাবে বিশ্ব বর্তুলাকার ধারণ করবে। জগৎ হবে অবাধ কিন্তু সসীম। তার আদি-অন্ত থাকবে না বটে কিন্তু অসীমও হবে না। মহাকালও হবে না অসীম কিছু। ফ্রিডম্যান এই সমাধানের কথাই বলেছিলেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় মডেল অনুসারে – জগতের সম্প্রসারণের হার যদি প্রবলতর হয়, তবে বিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলবে। অনন্তকাল ধরে। জগৎ তখন হবে অসীম এবং অপরিমেয়। এর শুরু যদিও বা থাকে কিন্তু শেষ নেই। আদি থাকলেও অন্ত নেই।

জগতের তৃতীয় রূপটি হল আগের দুই রূপের মাঝামাঝি। এখানে সম্প্রসারণ-শক্তি এবং মহাকর্ষের আকর্ষণ-শক্তি সমান। ফলে প্রসারণ কমতে কমতে শূন্য হতে চেষ্টা করবে। বিশ্ব হবে তখন অসীম এবং অপরিমেয়।

এই যে তিনটি সম্ভাব্য বিশ্বরূপ, এর মধ্যে কোন মডেল আমাদের বিশ্বের বেলায় ঠিক ঠিক প্রযোজ্য?

ভেস্টো মেলভিন স্লিফার (১৮৭৫-১৯৬৯ খৃঃ) লোয়েল মানমন্দির থেকে দূরের নীহারিকা লক্ষ্য করছিলেন। ভারী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে ৪৫টি নীহারিকার মধ্যে অন্তত ৪৩টি নীহারিকার বেলায় আলোর বর্ণালীতে লালচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তারাজগতে এত বেশি লালচ্যুতি দেখা যাচ্ছে কেন?

আমরা জানি যে আলোক-উৎস যদি দ্রষ্টার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তবে সেই আলোর বর্ণালীতে লাল রঙের অবস্থান, স্বাভাবিক আলোর বর্ণালীতে লাল রঙের অবস্থান থেকে সরে যায়। তারই নাম লালচ্যুতি (Red Shift)। ঠিক তেমনি করে যদি আলোক-উৎস দ্রষ্টার কাছে সরে আসতে থাকে, তবে তার আলোর বর্ণালীতে নীলচ্যুতি ঘটে থাকে। স্লিফার ৪৩টি নীহারিকার বর্ণালীতে লালচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন এবং তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অধিকাংশ নীহারিকা দূরে সরে যাচ্ছে। এর মানে তো দাঁড়ায় বিশ্ব

প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্ব কি তবে ফুলেফেঁপে উঠছে গ্যাসভরা বেলুনের মতো?

মার্কিন বিজ্ঞানী *এডুইন হাবল* (১৮৮৯-১৯৫৩ খৃঃ) মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিনে চোখ রেখে পর্যবে'খ'ণ চালিয়ে দেখলেন – বহু দূরের তারামণ্ডল থেকে আসা আলোর বর্ণালীতেও লালচ্যুতি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে যত দূরে আছে, তার লালচ্যুতি তত বেশি।

১৯২৩ সালে অ্যানড্রোমিডা তারামণ্ডলের মধ্যে আলাদা করে ন'খ'ত্রগুলো পর্যবে'খ'ণ করা সম্ভব হল। সেখানে পাওয়া গেল কিছু সেফিড তারা। সুবিধে হল বিজ্ঞানীদের। ওই সেফিড ন'খ'ত্র থেকে অ্যানড্রোমিডার দূরত্ব অনুমান করে ফেলতে পারল। দেখা গেল অ্যানড্রোমিডার দূরত্ব ৯ লাখ আলোকবর্ষ। বর্তমানে অবশ্য এই মাপটা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ আলোকবর্ষ।

আমরা জানি অ্যানড্রোমিডার মতো হাজার হাজার নীহারিকা-তারামণ্ডল ছাড়িয়ে আছে মহাকাশে অনেক দূর পর্যন্ত। এরা পরস্পর পরস্পরের থেকে তীব্র গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্ব আয়তনে বাড়ছে। ডি-সিটার তাহলে তো ঠিকই ভেবেছিলেন। ফ্রিডম্যানের মডেলও সেকথা বলেছিল।

১৯২৯ সালে হাবলের যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রকাশিত হল। বিশ্বের প্রসারণের প্রত্য'খ্খ' প্রমাণ মিলল। জগৎ নয় স্থির ও চিরন্তন।

আইনস্টাইন এরপর তাঁর গামা ফ্যাক্টর ত্যাগ করলেন। মহৎ প্রাণের মানুষ বলেই সোজাসুজি মেনে নিলেন – এই ধ্রুবকটি আমদানী করা তাঁর জীবনের বড়ো ভুল।

বিশ্ব ঠিক কেমন, এখনো কিন্তু তা স্পষ্ট হল না। বোঝা যাচ্ছে, জগৎ এক শাশ্বত নিয়মের অনন্ত প্রকাশ নয়। সবের মধ্যে ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। অতিবৃহৎ জগতের সেই ভাঙাগড়া-খেলার ধারণা করার জন্য অতি'খু'দ্রের ধারণা থাকা দরকার।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমরা মনুষ্যগণ পরিভ্রমণ করে চলেছি একান্ত একাকী। অপার বিস্ময়মাখা কোন অনির্দিষ্ট অভিমুখে কে জানে!

৪.৩। জগতের উপাদান

জগৎ বস্তুময়। তো সেই জগতের উপাদান কী?

আচ্ছা, জগৎ বললে আমরা ঠিক কী বুঝি? গ্রহ ন'খ'ত্র ধূমকেতু মহাকাশ বুঝি। আরো বেশি করে বুঝি পৃথিবীর উপরে বসে যা কিছু দৃশ্যমান সেই সব বস্তুরাশি। আমরা চারপাশে যা কিছু দেখছি সে সবই বস্তুময় পদার্থ। পাহাড় পর্বত মরুভূমি বেলাভূমি জল বাতাস গাছপালা পশুপাখি ধাতু-অধাতু। এসব পদার্থের মধ্যে কিছু কঠিন, কিছু তরল ও কিছু বায়বীয়। এরা কি সব বিভিন্ন মূল বা মৌলিক পদার্থ? নাকি এরা আরো মূল কোন উপাদান দিয়ে তৈরি?

প্রশ্নটা মানুষকে অনেকদিন আগে থেকেই ভাবাচ্ছিল।

কেউ ভেবেছেন সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান হল জল। কেউ বলেছে আগুন। কেউ বলেছে – মাটি, আগুন, বাতাস ও জল। অ্যারিস্টটল তার সঙ্গে জুড়েছিলেন এক আধিভৌতিক উপাদান – কুইন্টো এসেন্সিয়া।

ভারতীয় ভাবনায় জগতের মূল উপাদান পাঁচটি পদার্থ – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল) এবং ক্ষি'তি (মাটি)। সাংখ্য দর্শনে জগতের মূলে আবার পঁচিশটি তত্ত্ব আছে যার মধ্যে পাঁচটি ভূত বা ভৌত পদার্থ।

বিজ্ঞানের দৌলতে এখন আমরা জানি জগতের উপাদান ক্ষি'তি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম বললে কাজের কিছু বলা হয় না। অথবা ভুল বলা হয়। জগৎ গঠিত ৯২টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। তার কিছু ধাতু, কিছু অধাতু। কিছু কঠিন, কিছু তরল ও কিছু গ্যাসীয়। বেশ কয়েকটি মৌল গবেষণাগারে জন্মেছে। তাদের ধরা হলে মৌলপদার্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮। সংখ্যাটি বাড়তেও পারে। দুই বা ততোধিক মৌল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জুড়ে গিয়ে যৌগ পদার্থ গঠন করে। আমরা বস্তুরূপে যা দেখি, তার অধিকাংশ যৌগ পদার্থ। কখনো মৌল বা যৌগ রাসায়নিক নিয়মে যুক্ত না হয়ে মিশ্র পদার্থ গঠন করে। যেমন মরুৎ (বায়ু) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনজাত যৌগ।

আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা হলেও জল যে যৌগ পদার্থ এবং তা দুটি মৌলপদার্থের মিলনে জন্মায়, সে কথা কবে জানা হল? মাত্র ২১৯ বছর আগে। *হেনরি ক্যাভেণ্ডিস* (১৭৩১-১৮১০ খৃঃ)-এর পরী'খ'া থেকে। তার আগে কত যুগ যুগ ধরে আমরা জলবৎ তরলং জেনে এসেছি যে জল জগতের মূল উপাদান।

বায়ুর বেলায়ও তাই। অক্সিজেন আবিষ্কার করেছেন *কার্ল উইলহেম স্কিল* (১৭৪২-১৭৮৬ খৃঃ) এবং *জোসেফ প্রিস্টলি* (১৭৩৩-১৮০৪ খৃঃ)। মাত্র ২২৬ বছর আগে।

সভ্যতার কোন আদিকাল থেকে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে ফেলেছিল। জেনেছিল নানা ধাতু মিশিয়ে সঙ্কর ধাতু তৈরির প্রক্রি(য়া। কিন্তু বস্তু গঠনের মূল উপাদানসমূহ চিনতে পারেনি। পরী'খ'া-নিরী'খ'া করতে জানলেও বিজ্ঞানসম্মত পরী'খ'া করতে শেখেনি তখনো। তা শুরু হয়েছে নবজাগরণের পর।

বিজ্ঞানী *ল্যাভয়সিয়র* (১৭৪৩-১৭৯৪ খৃঃ)-এর সময় জানা ছিল ৩০টি মৌলিক পদার্থের খবর। ১৮১৪ সালে বার্জিলিয়াসের সময় ৪৯টি। মেণ্ডেলেভের সময়, মানে ১৮৬৯ সালে, প্রায় ৬৩টি। ১৯২৫ সালে আমরা ৮৮টি মৌলিক পদার্থের খোঁজ পেয়েছি। মানুষের সভ্যতা সুপ্রাচীন তবু বস্তুজগাতের মৌলিক পদার্থের উপাদানগুলি কী, তা জানতে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়েছে।

এর আগে আমরা গ্রীক পণ্ডিত ডেমোক্রি(টাস মারফৎ অ্যাটম (Atom)-র কথা জেনেছি। এদেশে মহর্ষি কনাদ এবং গৌতমের জন্য কণার ধারণার সূত্রপাৎ হতে দেখেছি। বিজ্ঞানে (দ্রতম অস্তিত্ব হিসেবে কণার সঠিক ধারণার প্রবর্তন করেন বৃটিশ রসায়নবিদ *জন ডালটন* (১৭৬৬-১৮৪৪ খৃঃ)। তিনি বললেন – জগতের সমস্ত বস্তুই (দ্রতম এবং অবিভাজ্য পরমাণু কণা দ্বারা গঠিত(প্রত্যেকটি মৌল একই রকমের পরমাণু দ্বারা এবং বিভিন্ন রকমের মৌল বিভিন্ন রকমের পরমাণু দ্বারা নির্মিত(রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মৌলের পরমাণুরা অংশগ্রহণ করে।

বস্তুর উপাদান হিসেবে সেই প্রথম 'খু'দ্রতম কণা পরমাণুর খবর পেলাম। চর্মচ'খে' পরমাণু দেখতে পেলাম না বটে, তবু কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। এবং সত্য বলে মানতে পারলাম।

কিছুদিন পরে ডালটনের প্রস্তাবিত পরমাণুর ধারণা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। *জোসেফ গে-লুসাক* (১৭৭৮-১৮৫০ খৃঃ) দুটি গ্যাসের সংযোজনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ডালটনের পরমাণু সংক্রান্ত ধারণা দিয়ে সে সূত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখা গেল যে 'পরমাণু অবিভাজ্য' এমন ধারণা টিকছে না। তাহলে তত্ত্বের দশাটা কী হবে?

সমস্যার সমাধান করলেন ১৮১১ সালে *অ্যামেডিও অ্যাভোগাড্রো* (১৭৭৬-১৮৫৬ খৃঃ)। এসব খবর স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য হিসেবে লভ্য বটে তবু মানুষের যুক্তিবাদী জ্ঞান দানা বাঁধে কম। তাই পুনরাবৃত্তি।

অ্যাভোগাড্রো আমদানী করলেন আরেক কণার ধারণা – অণু (Molecule)।

বললেন – 'বস্তুর 'খু'দ্রতম কণা পরমাণু' ডালটনের এ প্রস্তাব ঠিকই আছে। নতুন কথাটা হল মৌলের পরমাণু তৈরি করে মৌলের অণু যা বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম বজায় রেখে প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। পরমাণু তা পারে না। যেন অণু প্রকৃতিজগতের বস্তু কিন্তু পরমাণু সৃষ্টির হাতিয়ার।

যৌগিক পদার্থের 'খু'দ্রতম অবস্থা অণু এবং তা কয়েকটি মৌল পদার্থের পরমাণু দিয়ে গড়া। যেমন জলের 'খু'দ্রতম কণা হল জলের অণু এবং তা দুটো হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।

মৌল পদার্থের অণু কিন্তু এক বা একাধিক পরমাণু দ্বারা নির্মিত হতে পারে। যেমন একটি অক্সিজেন অণু দুটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা তৈরি। শুধু একটি পরমাণু দ্বারা গঠিত মৌল অণুর বেলায় অণু-পরমাণুর ভেদাভেদ ঘুচে যায়।

পদার্থের 'খু'দ্রতম কণা কত 'খু'দ্র? চোখে দেখা গেলনা যাদের, তাদের কথা কেমন করে জানা গেল?

১৮৮৫ সালে *জোসেফ লস্কমিডট* অনুমান করেছিলেন পরমাণু হবে নিরেট গোলক। তার ব্যাস ১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের একভাগ। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১ গ্রামের ১০০০ কোটি-কোটি-কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত 'খু'দ্র ও হালকা?

শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১ সিসি (ঘন-সেন্টিমিটার) গ্যাসের মধ্যে ২,৬৮,৬৭৮ কোটি-কোটি সংখ্যক অণু থাকতে পারে। অণু-পরমাণু জগতের মহা'খু'দ্রতা এসকল তথ্য থেকে যদি কিছুটা অনুমান করা যায়!

পৃথিবীতে নানা পদার্থের মধ্যে কিছু আশ্চর্যজনক পদার্থের দেখা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিকে বলে তেজস্ি(য় পদার্থ (Radio-active Matter)। এসকল পদার্থ থেকে তেজরাশি নির্গত হয় এবং কোন প্ররোচনা ছাড়াই। তার মানে আপনা-আপনি, খুব আশ্চর্য ঘটনা তো! বস্তুর মধ্যে আবার দেবতাদের মতো তেজরাশি থাকে? দেবতাদের থাক বা না-থাক অন্তত রেডিও-অ্যাক্টিভ বস্তুর তেজ আছে।

তারও আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল আরেক তেজ-র(মি এক্সরে (X ray)। ১৮৯৫ সালে। *উইলহেলম কনরাড রন্টজেন* (১৮৪৫-১৯২৩ খৃঃ) এই বিকিরণটির হদিশ দেন। আমরা এখন হাড়গোড় ভাঙলে হরদম এই তেজময় র(্মির খোঁজখবর করি। এমন তেজর(্মির কথা কোন ধর্মগ্রন্থে লেখাটেখা হয়নি কিন্তু। কেননা তা তখন মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি।

পরের বছর *আঁতোয়া হেনকি বেকরেল* (১৮৫২-১৯০৮ খৃঃ) তেজস্ি(য় পদার্থ থেকে নির্গত আরেক রকমের বিকিরণের কথা বললেন। *মেরি কুরি স্লোডায়াস্কা* (১৮৬৭-১৯৩৪ খৃঃ) আবিষ্কার করেন দুটি নতুন মৌল যাদের তেজস্ি(য় ধর্ম আছে। মৌল দুটির নাম রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম।

১৮৯৭ সালে কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের বিজ্ঞানী *জোসেফ জন টমসন* (১৮৫৬-১৯৪০ খৃঃ) এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে পরমাণুই

বস্তুর 'খু'দ্রতম উপাদান বা কণা নয়। আবিষ্কৃত হল পরমাণুর এক গঠন-কণা ইলেকট্রন Electron । এটি ঋণাত্মক তড়িৎ-গুণ সম্পন্ন কণা। ভর হাইড্রোজেন কণার থেকে হাজার গুণ কম। ইলেকট্রিক চার্জ হাইড্রোজেন আয়নের সমান। আয়ন মানে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক চার্জ আছে এমন পরমাণু যা নিস্তড়িৎ নয়।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে ডালটনের অবিভাজ্য পরমাণুর ধারণা চুরমার হয়ে গেল।

বিজ্ঞানের ধারাই হল এমন যে এখানে শেষকথা বলাটা বড়োই কঠিন। তবে কি তা ভুল কথা? হ্যাঁ, পরে তা ভুল, কিন্তু সেই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে অধিকতর সত্য। তাই ডালটনের ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালের অগ্রগতি হয়েছে।

অনতিকালের মধ্যে *আর্নেস্ট রাদারফোর্ড* (১৮৭১-১৯৩৭ খৃঃ) আর একটি চমৎকার পরী'খা করে দেখালেন – পরমাণুর গঠন কী হতে পারে। ১৯১১ সালে পরী'খা করে তিনি জানতে পেরেছিলেন – পরমাণুর অন্তঃস্থলে রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রীন (Nucleus)। অত্যন্ত অত্যন্ত ঘনবদ্ধ অবস্থায়। তার বাইরে ইলেকট্রন কণা কেন্দ্রীনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অনেকটা সৌরজগতের মতো চিত্র। সূর্য যেন পরমাণুর কেন্দ্রীন এবং ইলেকট্রন তার গ্রহ।

পরে *আর্নল্ড জোহানেস উইলহেলম সমারফেল্ড* (১৮৬৮-১৯৫১ খৃঃ), *নীল হেনড্রিক ডেভিড বোর* (১৮৮৫-১৯৬২ খৃঃ) এবং আরো অনেকে মিলে পরমাণুর জটিল গঠনের উপর আলোকপাত করেন।

অতি'খু'দ্র জগতের হিসেবনিকেশ করতে পরে নতুন এক তত্ত্ব এল – কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তখন ধ্রুপদী বিজ্ঞানের যে ধারা গ্যালিলিও-নিউটনের সময় থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল, তা সূক্ষ্ম ও 'খু'দ্র বস্তুকণার ক্ষে'ত্রে জোর ধাক্কা খেল। পরমাণুর কণা নাকি কখনো বুলেটের মতো কণাময় আবার কখনো তরঙ্গবিভঙ্গে বিভোর। আরো আশ্চর্য, তাদের যেমনটি দেখতে চাওয়া হবে, তারা নাকি তেমনটি হয়ে দেখা দেবে। এ যে একেবারে ঈশ্বরের মতো। তা নিয়ে বোর এবং আইনস্টাইনের মধ্যে জোর কাজিয়া লেগেছিল। সে বিবাদ অসমাপ্ত আজো।

ইতিমধ্যে পরমাণুর কেন্দ্রীনে বর্তমান থাকে যে ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা, তার আবিষ্কার হয়েছে। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড সেই কণার নাম দিলেন প্রোটন (Proton)। তেরো বছর পরে বৃটিশ বিজ্ঞানী *জেমস চ্যাড*উইক (১৮৯১-১৯৭৪ খৃঃ) আবিষ্কার করলেন কেন্দ্রীনে অবস্থিত তৃতীয় কণাটি। নিস্তড়িৎ কণাটির নাম নিউট্রন (Neutron)।

এভাবে কোন মৌলের পরমাণু গঠনে খুঁজে পাওয়া গেল তিনটি পারমাণবিক কণা –ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণার ভর খুবই কম। ধনাত্মক প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রনের ওজন সে তুলনায় খুব ভারী। পরমাণুর প্রায় সবটা ভর

যেন পরমাণুর কেন্দ্রে-থাকা প্রোটন-নিউট্রনের ভর।

পৃথিবীতে যদি ১০০ কোটি ধরনের বস্তু থাকে তবে তা তৈরি করার জন্য কেবলমাত্র ৯২টি মৌলিক পদার্থ দরকার।এই ৯২টি মৌলিক পদার্থ তৈরির জন্য রয়েছে ৯২টি জাতের পরমাণু। আরো জানা গেল যে ৯২টি পরমাণু মাত্র তিনটি কণা দিয়ে গঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, মাত্র তিনটি কণা দিয়ে। কী করে?

সবচেয়ে ছোট এবং হালকা পরমাণু হল হাইড্রোজেন। এটি ১টি প্রোটন এবং ১টি ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি।

হিলিয়াম পরমাণুতে রয়েছে ২টি ইলেকট্রন, ২টি প্রোটন এবং ২টি নিউট্রন।

কার্বন পরমাণুতে ৬টি ইলেকট্রন, ৬টি প্রোটন এবং ৬টি নিউট্রন।

এমনিধারা পারমাণবিক কণার সংখ্যা বাড়িয়ে গেলে আমরা পাই নানা রকমের পরমাণু। শুধু তাই নয়, কিছু কণার সংখ্যার সামান্য হেরফের করে পেয়ে যাব মৌল পরমাণুর মতো আরেক জাতের বস্তুর অস্তিত্ব – আইসোটোপ।

লোহা আর সোনার মধ্যে পার্থক্য তাহলে স্রেফ ইলকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন সংখ্যার? আর কিছু নয়। না, নয়। বিশ্বাস করুন আর না করুন, লোহার গুণাবলী কিছু পারমাণবিক কণার বিশেষ সজ্জার উপর নির্ভরশীল। ২৬টি ইলেকট্রন, ২৬টি প্রোটন এবং ৩০টি নিউট্রন কণা নিয়ে লোহার পরমাণু কণায় যে গুণ বর্তমান, তা নেই লোহার পরমাণু-কণার উপাদানের মধ্যে। আবার ৭৯টি ইলেকট্রন, ৭৯টি প্রোটন এবং ১১৮টি নিউট্রন নিয়ে সোনার স্বর্ণময়তা বেঁচে আছে বটে তার অণু-পরমাণুতে, কিন্তু তার ভিতরের কণারা সে গুণে কানা। তাদের গুণ অন্য প্রকার।

গুণ কি তবে একসময় হঠাৎ করে বস্তুর বিশেষ গঠনে জন্মে? নিশ্চয়ই তাই।

আরো দেখুন, জলের অণু গড়ে উঠেছে একটি অক্সিজেন এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে। এই অক্সিজেন-হাইড্রোজেনের পরমাণু কি জলের বীজস্বরূপ? অথচ তাতে নেই জলের কোন গুণ। তাই বলা যে অবস্থান্তরে গুণের জন্ম হয়। বিশেষ শর্তে জাত হয়, নতুন ধর্মের বস্তু যা তার উপাদানে নাও থাকতে পারে। কথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। হয়তো চেতনার উন্মেষ ব্যাখ্যা করতে এই কথাটি খুব প্রাসঙ্গিক।

আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি পারমাণবিক কণাগুলো নিয়ে এত'খ'ণ গলা ফাটালাম বটে কিন্তু ওরাই বস্তুকণার শেষকথা নয়। দেখা গেল সকল কণার আবার প্রতিকণা (Anti-particle) আছে। যেমন, ইলেকট্রনের প্রতিকণা হল পজিট্রন (Positron)। তেমনি অ্যান্টি-প্রোটন এবং অ্যান্টি-নিউট্রন আছে প্রতি-কণা হিসেবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আলো হল ফোটন (Photon) কণার প্রবাহ। নিউট্রিনো (Neutrino) নামে ভরহীন ও তড়িৎহীন ছয় ধরনের কণার খোঁজ মিলেছে। এরা

যেন প্রায় অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান এমনই অতীব 'খীণ বস্তু।

প্রোটন-নিউট্রন কণা ভেঙে এখন আরো মৌলিক কণার খোঁজ মিলেছে। তাদের নাম কোয়ার্ক। খোঁজ মিলেছে আরো শতাধিক কণার। জগতের নানা বস্তুগঠনে এই সব বিচিত্র কণাদের কাজ কী তা এখনো তেমন করে স্পষ্ট হয়নি।

কাজ করতে শক্তি (Energy) খরচ করতে হয়। কাজ করা মানে এক অর্থে শক্তির রূপান্তর। আমরা আসলে কোন বস্তু বা শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না, ধ্বংসও করতে পারি না। যা করি, তা বস্তুরূপের বা শক্তিরূপের রূপান্তর। অথবা শক্তিস্তরের পরিবর্তন।

শক্তি এবং বস্তুকণা মূলত সমার্থক। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সে কথাই সূত্রাকারে তুলে ধরেছেন — $E = mc^2$।

বস্তুকণা ভেঙে শক্তি নির্গত হয়। যেমন হয় সূর্যের ভিতরে কিংবা মানুষের তৈরি পারমাণবিক চুল্লিতে। আমরা নানা প্রকার শক্তি র সঙ্গে পরিচিত —আলোক শক্তি , বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, চুম্বক শক্তি ইত্যাদি। যন্ত্রের সাহায্যে শক্তি র রূপান্তর ঘটিয়ে নানা কাজ করতে স'খ'ম হয়েছি।

বস্তুকণা ছাড়া জগতে আছে আলো এবং আলোর মতো নানা রশ্মির বিপুল বিকিরণ – তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (Electro-magnetic Radiation)। আলো, তাপ, তড়িৎ, চুম্বক, এক্সরে, গামা-রে, রেডিও-তরঙ্গ – এ সবই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ। তফাৎ শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের।

দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ০.০০০১ থেকে ০.০০০০২ সেমি। রেডিও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০ সেমির থেকে বেশি। আবার গামা বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ সেমির ১ কোটি ভাগেরও কম।

নানা রকমের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য নানা রকমের বিকিরণ পাওয়া যায়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল রঙের আলো লাল হওয়ার কারণ তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মির বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা আমাদের চোখের রেটিনা এবং মগজের কেরমতিতে লাল বা নীল রঙের অনুভূতির সৃষ্টি করছে। এসব কথা বিশ্বাস করা যায় কেননা বিজ্ঞানীরা তা পরী'খ'া করে দেখেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্ররাও হরদম তা পরী'খ'া করছে। দৃশ্যমান না হলেও এই সব কণা-রশ্মি-শক্তি বাস্তব বস্তু। এদের অস্তিত্বের নানা রকমের প্রমাণ আছে।

বস্তু এবং বিকিরণ চালিত হয় চার রকমের বল দ্বারা – তাড়িৎ-চুম্বকীয় বল (Electro-magnetic Force), অভিকর্ষজ বল (Gravitaional Force), মৃদু বল (Weak Force) এবং দৃঢ় বল (Strong Force)।

নিউটন অভিকর্ষজ বলের কথা বলে গিয়েছেন। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে আমরা তা প্রত্য'খ' করি।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের কথা বলে যান *ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল* (১৮৩১-১৮৭৯ খৃঃ)। তড়িৎশক্তি এবং চুম্বকশক্তি আসলে একই বলের প্রকাশ।

তেজস্ক্রিয়তা এবং পরমাণু আবিষ্কারের পর মৃদু বলের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণ এই মৃদু বল। আর ঘনবদ্ধ কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রোটন-নিউট্রন দৃঢ় বলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে।

মহাশূন্য থেকে আসা আরেক রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, পরী'খ'া করে আরো অনেক 'খ'ণস্থায়ী মৌলকণার খোঁজ মিলেছে। যেমন, পাই-মেসন বা পায়ন, মিউয়ন, কেয়ন, ল্যাম্বডা ইত্যাদি কণা। আমাদের জাগতিক বস্তু গঠনে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন কণা যথেষ্ট ছিল। তো নতুন এইসব কণা দিয়ে কী হবে কে জানে!

আমাদের মৌল উপদানের সন্ধান কি সাঙ্গ হল? নাকি আরো মৌল কোন উপাদান থাকা সম্ভব? ১৯৬৩ সালে *মারে গেলম্যান* (জন্ম - ১৯২৯ খৃঃ) এবং *জর্জ সোয়াইগ* (জন্ম - ১৯৩৭ খৃঃ) প্রস্তাব করলেন আরেক স্তরের মৌলকণার। তাঁরা বললেন – হ্যাড্রন (Hadron) দলের মধ্যে পড়ে যে সকল কণা তারা আরো তিনটি 'খু'দ্র কণা দিয়ে তৈরি। তাদের নাম রাখা হল কোয়ার্ক (Quark)।

হ্যাড্রন দল বলতে বোঝায় সেই সব জাতের কণা যাদের উপর দৃঢ় বল ক্রিয়া করে। পরে অবশ্য দেখা গেল, তিন রকমের নয়, মোট ছয় রকমের কোয়ার্ক থাকা সম্ভব – আপ, ডাউন, স্ট্রেঞ্জ, চার্ম, বটম এবং টপ কোয়ার্ক। বিজ্ঞানীরা পাঁচ রকম কোয়ার্কের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। টপ কোয়ার্কের খোঁজ চলছে। ইলেকট্রন কণার চার্জ যদি একক ধরা হয়, তবে এই কণাদের চার্জ হয় এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ।

প্রত্যেক কোয়ার্ক আবার তিন রকম রঙের (Color) হতে পারে। রঙ মানে চরিত্র। এই রঙিন কোয়ার্কগুলো যুক্ত থাকে আঠালো কণা গ্লুয়ন Gluon দিয়ে। কোয়ার্ক আর গ্লুয়ন তাহলে বোধকরি পদার্থের আদিমতম মৌলরূপ। এখন পর্যন্ত।

বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, আরো সূ'খ্'খ' বস্তুকণার কথা – সুতোর মতো গড়ন তাদের। এখনো অবশ্য সেসব ভাবনার স্তরে সীমাবদ্ধ।

জগতের বস্তুসমূহ মৌল উপাদানের খোঁজ করতে করতে বিজ্ঞান কোথায় এসে পৌঁছেছে, দেখুন তো? খি'তি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম ছাড়িয়ে বিরানব্বই রকমের মৌলপদার্থ হল, তারপর এল সূ'খ্'খ'কণা পরমাণু, পরমাণুর পরে আরো সূ'খ্'খ'কণা ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন। আর এখন ইলেকট্রন জাতীয় লেপটন এবং কোয়ার্ক-গ্লুয়ন-ফোটন ইত্যাদি হয়ে উঠল মৌলতম উপাদান।

বিজ্ঞানে উপাদান নিয়ে চর্চা শেষ হয়নি। মানুষকে আরো জানতে হবে। রহস্যের জট আরো উন্মোচিত হবে। ধৈর্য ধরতে হবে তার জন্য।

বিজ্ঞানীরা ম্যাজিসিয়ান নন। বিজ্ঞানও নয় কোন যাদুবিদ্যা। এক লহমায় সবকিছু জানা যাবে না। আচ্ছা, ঈশ্বর কি এতসব মৌল, পরমাণু, পারমাণবিক কণা, কোয়ার্ক-গ্লুয়ন-নিউট্রিনো জানতেন? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা?

৪.৪। বিশ্বসৃষ্টি

সূর্য-চন্দ্র আর পাঁচটা গ্রহ নিয়ে গড়া জগৎ কালে কালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে তারামণ্ডলে, তারপর তারামণ্ডল ছাড়িয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাব্যাপ্তির মধ্যে বিরাজমান দেখতে পেলাম। আরো বিস্মিত হলাম প্রসারণশীল বিশ্বরূপ দর্শন করে। শ্রীকৃষে(র বিশ্বরূপ দর্শনের থেকেও বিস্ময়কর এই দর্শন।

অনেক বিজ্ঞানী অনেক ভাবনাচিন্তার পরে অনেক পরী'খ'া-নিরী'খ'া করে আমাদের এই বিশ্বরূপ দেখালেন। অবশ্য যারা দেখতে চাইলেন বা দেখতে পারলেন, তাদের দেখালেন। শুধু তাই নয়, তারা আরো দেখালেন, কত সূক্ষ্ম আর কত 'খু'দ্রতম পদার্থ দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি।

তা না হয়, বোঝা গেল, কিন্তু জগৎ সৃষ্টি হল কী করে?

আইনস্টাইন, ডি-সিটার বা ফ্রিডম্যান – এঁরা জগতের রূপ নিয়ে ভাবনার পরে বিজ্ঞান জগৎ মেতে উঠেছিল 'খু'দ্র জগৎ নিয়ে আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে। সেই সময় বেলজিয়ান যাজক-বিজ্ঞানী *জর্জ হেনরি লেমাত্রে* (১৮৯৪-১৯৬৬ খৃঃ) পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বের রহস্য সন্ধানে। ১৯২৭ সালে প্রকাশ করলেন *আদিম-পরমাণু প্রকল্প* (Hypotheses of Primordial Atom)।

আমরা জানি, প্রকল্প হল কিছু তথ্য ও প্রমাণিত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়া এক অগ্রবর্তী ভাবনা। সেটা তখনো থাকে প্রমাণের অপে(ায়। তো সেই রকম একটি প্রকল্প রচিত হল তারামণ্ডলের লালচ্যুতি এবং আইনস্টাইনের সাধারণ আপে'খি'কতার তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। লেমাত্রে বললেন – এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি-জাগতিক-পরমাণুর মতো অবস্থা থেকে। কী করে জানা গেল?

আজকে আমরা দেখছি, বিশ্বের তারামণ্ডলগুলো একটি আরেকটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আগামী দিনে আরো প্রসারিত হবে। এবার তাহলে পিছনে ফিরে তাকানো যাক। সময়ের কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে অতীতের দিকে পাড়ি দিলে আমরা কি পাবো? দেখতে পাব ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে এই বিশ্ব। হতে হতে তা তো সীমায়িত হবে এক আদিম বস্তুপিণ্ডে। বিশ্বের প্রসারণ শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই আদিম বস্তুপিণ্ড থেকে। মহা-অতীতে সেই আদিম পিণ্ডের নাম দেওয়া হল *আদি-জাগতিক-পরমাণু* (Primordial Atom)।

তার মানে ওই (ুদ্র বস্তুপিণ্ডের মধ্যে জগতের সমস্ত বস্তু ঠাসা ছিল একসময়। ফলে তার ঘনত্ব ছিল অসম্ভব রকমের বেশি। কতটা ঘন সেই বস্তুপিণ্ড হতে পারে? একটা ধারণার চেষ্টা করা যাক। বলা হচ্ছে যে সূর্যের থেকে মাত্র ৩০ গুণ বেশি আয়তনের

মধ্যে বিশ্ব ঠাসা ছিল। অথবা ভাবা যেতে পারে, ৪০০-৫০০ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে সবকিছু সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এক সিসি (ঘন সেন্টিমিটার) বস্তুর ওজন যদি হয় ১ গ্রাম, তবে সেসময় আদিম বিশ্বের ১ সিসির ওজন ছিল ২৫০ কোটি টন।

এটাই বিজ্ঞানের ব্রহ্মাণ্ড। এই আদিম পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ড। তাই বলে ভেবে বসবেন না যেন পুরাণকার ব্রহ্মাণ্ড বলতে লেমাত্রের এই আদি-জাগতিক-পরমাণুর কথা বলেছেন।

আসলে মানুষ তো অণ্ড থেকে প্রাণের সূচনা হতে দেখেছে। সৃষ্টি হতে দেখেছে। বীজ থেকে হয়েছে বৃ'খ'। আমরা অণ্ড শব্দ দিয়ে প্রাণের সূচনা তথা সৃষ্টির সূচনা বুঝতে চেষ্টা করেছি। কল্পনা করেছি যে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা স্রষ্টা। স্রষ্টা থেকে সৃষ্ট এই জগতের আদি জগৎ। এমনধারা বিশ্বাসের জন্য বিশ্বের সেই অণ্ডের নাম রাখা হয়েছিল ব্রহ্মাণ্ড। এরকম ভাবনা ছাড়া জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে আর কোন ভাবনার উদয় হওয়া তখন তো সম্ভবও ছিল না।

লেমাত্রের আদি-জাগতিক-পরমাণু ছিল অতিঘন অবস্থায়। পরমাণু কেন্দ্রীনের মতো অতিঘনবদ্ধ অবস্থায়। তারপর ওই পরমাণুটি কোন এক বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। আর তার বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিস্ফোরণের দমকের রেশ আজো শেষ হয়নি। আজো তার বস্তুপুঞ্জ ছিটকে-ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূরাঞ্চলে। তার মানে বিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করেছিল মহাবিস্ফোরণেপ পর। আজও সেই প্রসারণ হচ্ছে। তাই আমরা বিশ্বকে প্রসারণশীল দেখতে পাচ্ছি।

...

১৯৪৮ সালে ফ্রিডম্যানের ছাত্র *জর্জ গ্যামো* (১৯০৪-১৯৬৮ খৃঃ), তাঁর শিষ্য *র‍্যালফ অ্যালফার* (১৯২১-২০০৭ খৃঃ) এবং *হান্স অ্যালব্রেখট বেথে* (১৯০৬-২০০৫ খৃঃ) নেমে পড়েছিলেন আদিম বিশ্বের রহস্য সন্ধানে। সৃষ্টির আদি কালে ঠিক কী ঘটনা ঘটতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করলেন। বিজ্ঞান জগতে তাঁদের ওই গবেষণা নিবন্ধ '*আলফা-বিটা-গামা পেপার*' নামে পরিচিত।

এত(ণে কি আমরা ধরতে পেরেছি যে বিশ্বসৃষ্টি মানে হল আসলে বস্তুর সৃষ্টি? বস্তুকণা, বিকিরণ আর বলের সৃষ্টি। তো সে সবের সৃষ্টি হল কী করে?

তিন বিজ্ঞানীর ভাবনা শুরু হল — বর্তমানে জগতে যে সব বস্তু দেখতে পাচ্ছি, তা কি মৌল কোন উপাদান থেকে শুরু হয়েছিল? এটা জানা গিয়েছে যে বর্তমান বিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম হল প্রধান উপাদান। ধরা যাক, বিশ্বের আদিতে ছিল নিউট্রন কণা এবং বিকিরণের এক মিশ্রণ। অত্যন্ত উষ(তাপমাত্রায় ছিল মিশ্রণটি। তারপর উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে এক বিস্ফোরণের ফলে ঘনবদ্ধ বস্তুরাশি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। বিজ্ঞানীরা পরী(াগারে দেখেছেন — নিউট্রন কণা থেকে জন্মায় ইলেকট্রন-প্রোটনের কণা। অর্থাৎ ইলেকট্রন এবং হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন।

বিশ্ব যত প্রসারিত হচ্ছিল, তার তাপমাত্রা তত কমতে শুরু করল। এভাবে কিছুটা চলার পর বিস্ফোরণের ধাক্কায় বেগমত্ত পারমাণবিক কণাগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্তহতে চেষ্টা করল। চেষ্টা করল প্রোটন-নিউট্রন ঘনবদ্ধ জোট হয়ে ভারী পরমাণু কেন্দ্রীন তৈরি করতে। প্রথমে গঠিত হল ডয়েটেরিয়াম মানে ভারী হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীন ১টি প্রোটনের সঙ্গে ১টি নিউট্রন যুক্ত করে। পরে ১টি প্রোটনের সঙ্গে ২টি নিউট্রন জুড়ে হল ট্রিটিয়াম কেন্দ্রীন। বিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং তাপমাত্রা তাল মিলিয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এরপর গঠিত হল ২টি প্রোটন এবং ১টি নিউট্রন দিয়ে হিলিয়াম-৩ কেন্দ্রীন। আরো পরে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন দিয়ে হিলিয়াম-৪ কেন্দ্রীন। পদার্থবিদ্যা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে যে হিলিয়াম-৪ কেন্দ্রীন বস্তুর এক টেকসই সুস্থিত রূপ।

নিউট্রন থেকে পারমাণবিক বিত্রি(য়াপর্ব শুরু করলে ধাপে ধাপে এভাবে আমরা পৌঁছে যাই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম কণার সৃষ্টিতে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রধান উপাদানগুলির গঠনে। বিশ্বসৃষ্টির এই ঘটনাত্র(মের নাম রাখা হল *আদি-কেন্দ্রীন-সংযোজন প্রক্রিয়া* (Primordial Nucleo-synthesis ।

বর্তমানে বিশ্বজগতে আমরা যত বস্তু দেখি, তার শতকরা ৯৯ ভাগই হল হাইড্রোজেন-হিলিয়াম। মাত্র ১ ভাগ অন্যান্য মৌল। অর্থাৎ গ্যামোর আদি-কেন্দ্রীন-সংযোজন প্রক্রি য়া অনুসারে আমরা বিশ্বের ৯৯ ভাগ বস্তু গঠনের রহস্য *জেনে ফেলেছি*।

দ্বিতীয়ত, হিসেব কষে দেখা গিয়েছে — পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় নিউট্রন থেকে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম তৈরি হলে ঐ মিশ্রণের মধ্যে হিলিয়ামের অনুপাত দাঁড়ানোর কথা শতকরা ৩৩ ভাগ। আর, কী আশ্চর্য, জগতপারাবারে আমরা ওই একই অনুপাতের হিলিয়াম দেখতে পাই।

এ দুটি নিরী'খ'া গ্যামোর সপ'খে' জোরালো যুক্তি হিসেবে উপস্থিত হল। বিশ্বের প্রসারণ তো একটি বাস্তব ঘটনা। তাও গ্যামোর সৃষ্টিতত্ত্বে স্থান পেয়েছিল।

এই তিনটি যুক্তি প্রমাণ ছাড়া আরো একটি প্রমাণের সম্ভাবনা তত্ত্বগতভাবে অনুমান করা হচ্ছিল। বিশ্ব আদি সময়কালের উত্তাপ থেকে ঠাণ্ডা হয়েই চলেছে। বিস্ফোরণের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে যখন ৩০০০ কেলভিন (২৭২৭ ডিগ্রি সেঃ) দাঁড়িয়েছিল, তখন বস্তু থেকে বিকিরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে মহাজাগতিক বিকিরণ বস্তু থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে। এখনো কি তা মহাজগতে বিচরণ করছে? হয়তো করছে। যদি করেও, তবে এতকাল পরে তার তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে খুব কম দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়।

ওই বিকিরণের নাম রাখা হল *অবশিষ্ট বিকিরণ* (Residual Radiation)। অঙ্ক কষে দেখা হয়েছে যে অবশিষ্ট বিকিরণের মান এখন তাপমাত্রার হিসেবে হবে ৫ থেকে ৫০ কেলভিনের মধ্যে।

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপান্তে এই যে ভাবনার বিকাশ হচ্ছিল, বিজ্ঞানী মহলে তার একটা মজাদার নাম জুটল। বিগব্যাং থিয়োরি — *মহাবিস্ফোরণ* তত্ত্ব Big Bang Theory । *স্যর ফ্রেড হয়েল* (১৯১৫-২০০১ খৃঃ) এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। ঠাট্টা করে তিনিই গ্যামোর প্রকল্পের নামটা দিয়েছিলেন — বিগ ব্যাং কারণ তত্ত্বমতে বিশ্ব নাকি দুম (ব্যাং) করে এক মহাবিস্ফোরণে জন্ম নিয়েছিল! ঠাট্টা করে বলা বলেও তত্ত্বের ওই নামটাই টিকে গেল।

এই ফাঁকে বিগ ব্যাং থিয়োরির বিরোধী যে বৈজ্ঞানিক মতবাদটি রয়েছে, তার কথা একটু বলে নেওয়া যাক। এর নাম *শাশ্বত বিশ্বের* তত্ত্ব (Steady State Theory)। বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যর ফ্রেড হয়েল, *টমাস গোল্ড* (১৯২০-২০০৪ খৃঃ) এবং *হার্মান বণ্ডি* (১৯১৯-২০০৫ খৃঃ) এই তত্ত্বের প্রবক্তা।

তাঁদের মতে — আসলে বিশ্বের কোন আদি-অন্ত নেই। বিশ্ব অনাদি অনন্ত। বিশ্ব শাশ্বত। চিরকাল এমন ছিল এবং চিরকাল এমনটাই থাকবে। তবে যে বিশ্বের প্রসারণ হচ্ছে? তা হচ্ছে। মনে করুন, একদিকে বিশ্বের প্রসারণ হচ্ছে, অন্যদিকে প্রসারিত স্থানের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে শূন্যতা যার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নতুন বস্তুপুঞ্জ। তা দিয়ে নতুন তারামণ্ডলের সৃজন সম্ভব হচ্ছে। এভাবে প্রসারণও চলছে আর অনবরত নতুন সৃষ্টিও চলছে। জগৎ এমনি করে এক শাশ্বত জগতের মধ্য দিয়ে চলেছে।

শাশ্বত বিশ্বতত্ত্বের প্রবক্তারা বৈজ্ঞানিক মহলে যেন খানিকটা ব্রাত্য। বিগব্যাং থিয়োরি অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সমর্থনধন্য। অবশ্য এই তত্ত্বের বিরুদ্ধেও অনেক প্রশ্ন আছে। যেমন ধরুন, সিংগুলারিটি Singularity নিয়ে সমস্যা আছে। সিংগুলারিটি?

বিগব্যাং তত্ত্বে বিশ্বের জন্মমুহূর্তটিকে চিহ্নিত করা হয় সিংগুলারিটি নামে এক ধারণা দিয়ে। এ হল জগৎ সৃষ্টির সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত — মহাকালের শুরু যে সময় থেকে। আমরা এর ভাষান্তর করব '*মহাবিন্দু*' কথা দিয়ে।

এই মহাবিন্দু অবস্থাটা তুলনারহিত অনন্য। এ এক তাত্ত্বিক বর্ণনা। কেননা মহাবিন্দু সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পুঁজি বা বর্তমান গণিতশাস্ত্র দিয়ে সঠিক করা যায় না। এর জন্য নতুন ধরনের গণনা দরকার — তেমন গণিত এখনো অনাবিষ্কৃত। কিছু অনুমান করা যাচ্ছে মাত্র।

এভাবে ভাবা হয়েছে — জগৎ এই মহাবিন্দু থেকে উদ্ভূত। সৃষ্টি এই মহাবিন্দু অবস্থা থেকে জাত। দেশ-কালের শুরু এই অবস্থান থেকে। আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে মহাবিন্দুর খুব নিকটস্থ অবস্থার কিছু তাত্ত্বিক অনুমান করে উঠতে পারি। ঠিক মহাবিন্দুর দেশকালে ও সময়কালে পৌঁছতে পারছি না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মিলন ঘটিয়ে নতুন তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত প্রযোজ্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে।

আরেকটা মুস্কিল হচ্ছে যে হাবলের সূত্র অনুসারে হাবল ধ্রুবকের মান (H) বারংবার সংশোধিত হচ্ছিল। বিজ্ঞানী হাবল স্বয়ং এই ধ্রুবকের মান যা ধরেছিলেন, তাতে বিশ্বের বয়স দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২০০ কোটি বছর। হিসেবটা স্পষ্টত ছিল অবিশ্বাস্য। কেননা জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যা থেকে ইতিমধ্যে বোঝা যাচ্ছিল যে সৌরজগতের বয়সই অন্তত ৪০০ কোটি বছর হবে। ১৯৪৮ সাল নাগাদ ধ্রুবকের মান যা ধরা হল, তাতে জগতের বয়স দাঁড়াল ১০০০ কোটি বছর। বিংশ শতকের উপান্তে জগতের বয়স ভাবা হচ্ছে ১৩০০ থেকে ১৮০০ কোটি বছরের মধ্যে।

আমরা মোটামুটিভাবে বিশ্বের বয়স আপাতত ১৫০০ কোটি বছর ধরে নিতে পারি। তাহলে জগতের জন্ম ৪০০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে নয়। ১৫০০ কোটি বৎসর খৃষ্টপূর্বাব্দে। আগ্রহীজনেরা হিসেব করুন, বয়সটা ব্রহ্মার দিনরাতের মাপে কত দিনরাত হল?

...

বিশ্বের শুরুতে যে প্রসারণ-বেগ থাকতে পারে ভাবা হয়েছিল, আজ আর তা থাকতে পারে না। এই বেগ-হ্রাস পাওয়ার হারও বা কত হতে পারে, তা নিয়ে সঠিক ধারণা করা মুস্কিল। জগতের মোট বস্তুরাশির পরিমাণ ঠিক কত এবং তার ঘনত্বই বা কী হতে পারে, সেসব নিয়ে অনিশ্চয়তা অনেক। এই 'খু'দ্র পৃথিবীর কোন এক বিন্দু থেকে ঘরে বসে বিশাল জগতের মোট বস্তুর পরিমাণ হিসেব করা কিংবা ১৫০০ কোটি বছর আগেকার ঘটনায় ফিরে যাওয়া — সোজাসাপটা ব্যাপার নাকি?

বস্তুরাশির পরিমাণ তো দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে মেপে দেখা যাচ্ছে না। মাপা হচ্ছে পরো'খ'ভাবে। অথচ মোট বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে আছে জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোর।

শাশ্বত বিশ্বের তত্ত্ব কিন্তু এই সকল জটিল সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারছে। তারা প্রশ্ন তোলেন — আচ্ছা, আমরা তো সৃষ্টির সময়কালের বিশ্ব ব্যাখ্যা করছি, বর্তমান কালে বহুল পরিবর্তিত বিশ্বের পদার্থবিদ্যা দিয়ে। এটা কি ঠিক হল?

কথাটা ঠিকই। বিশ্বের জন্ম ও শৈশবকালে বস্তুজগতের নিয়মগুলি একই ছিল কিনা কে জানে! বিশ্ব যদি বদলে গিয়ে থাকে, তবে তো তার নিয়মগুলিও বদলে যেতে পারে। একই থাকবে কী করে? যদি জগৎ হয় শাশ্বত অপরিবর্তনীয়, শুধু তবেই পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী একই থাকতে পারে। শুধু দেশ-এর দিক থেকে বিশ্ব সমসত্ত্ব ও সমসারক নয়, দেশ-কাল উভয় দিকে থেকে একই ছিল, একই আছে এবং একই থাকবে।

তবে যে বিশ্বের প্রসারণ হচ্ছে? তা কী করে সম্ভব হচ্ছে?

আগেই তো বলা হল — তা সম্ভব হচ্ছে শূন্য থেকে বস্তু সৃষ্টি হওয়ার জন্য। প্রসারমান বিশ্বে তৈরি হয়ে চলেছে ফাঁকফোঁকর। সেই শূন্যতার গর্ভে জন্ম নিচ্ছে নতুনতর বস্তু।

বণ্ডি-গোল্ডের হিসেব মতো ৩ লাখ বছরে প্রতি ঘনমিটার জায়গায় ১টি করে হাইড্রোজেন কণার সৃষ্টি হচ্ছে। সৃজণের এই হার খুব নগণ্য ভাবার কারণ নেই। কারণ এই হারে বস্তু সৃষ্ট হতে থাকলে ৫/১০ কোটি ঘন আলোকবর্ষ আয়তনের বিশ্বে যে পরিমাণ বস্তু-সৃষ্টি সম্ভব, তা দিয়ে বেশ কয়েকটি তারামণ্ডল তৈরি করা যেতে পারে।

শূন্য থেকে বস্তুর সৃষ্টি? আরে ব্বাস! এ তো ঈশ্বরের প'ে'ই একমাত্র সম্ভব।

বিজ্ঞানী হয়েল অবশ্য শূন্য থেকে সৃষ্টির এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন — বিশ্বের শক্তির এক প্রচ্ছন্ন 'ে'ত্র আছে। একে ঋণাত্মক শক্তির উৎস বলা যায়। হয়েল এই উৎসের নাম দিলেন *সি-ফিল্ড*। এই প্রকার শক্তি - উৎস হতে শক্তি নিয়ে বস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে। তবে তো সি-ফিল্ডের মান আরো ঋণাত্মক হয়ে পড়ার কথা। না, তা হচ্ছে না কেননা বিশ্ব প্রসারিত হওয়ার জন্য ঋণাত্মক মান আর বাড়তে পারছে না। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রসারণের মধ্যে একপ্রকার সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী *জয়ন্তবিষ(নারলেকার* (জন্ম ১৯৩৮ সাল) স্যর হয়েলের সঙ্গে ১৯৭১ সালে যুগ্মভাবে মহাবিন্দুর আরেক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন। ১৯৯৩ সালে আবার স্যর হয়েল ও জিওফ্রে বারব্রিজের সঙ্গে মিলে *আংশিক শাশ্বত বিশ্বের তত্ত্ব* উপস্থিত করলেন। আগেই বলেছি, বিজ্ঞানী মহলে শাশ্বত বিশ্বের ধারণা এখনো তেমন আমল পায়নি।

বিশ্বসৃষ্টি মানে বস্তুসৃষ্টি। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা করা দুধাপে হতে পারে। এক, শুরু থেকেই বস্তুসৃষ্টির ব্যাখ্যা করা — শুরু কী করে হল তার ব্যাখ্যা করা, তারপর বর্তমানে পৌঁছনো। দুই, শুরু থেকে শুরু করে জগৎ কী করে বর্তমান জটিল বৈচিত্র্যে এসে পৌঁছল বিবর্তনের সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা, বর্তমান থেকে ধাপে ধাপে পিছিয়ে তারপর সৃষ্টিকালে পৌঁছনো। বিজ্ঞানীরা শুরু করছেন বিবর্তনের হদিশ পেতে পেতে। ঈশ্বরের জগতে ৯২ জাতের মৌলপদার্থ কী করে তৈরি হল তা জানার চেষ্টা করলেন প্রথমে।

১৯৩৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হান্স আলব্রেখট *বেথে না(ত্র-কেন্দ্রীন-সংযোজন প্রত্রি(য়া* (Stellar Nucleo-synthesis) বিষয়ে তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। দুটি বা তার বেশি জিনিস যুক্ত হয়ে কোন নতুন জিনিস তৈরি করাই সংযোজন ক্রিয়া। ন'খ'ত্রে হালকা পরমাণু-কেন্দ্রীন এই সংযোজন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে ভারী পরমাণু-কেন্দ্রীন গঠন এবং শক্তি উৎপাদন করে। তিনি দেখান যে কার্বন-১২ পরমাণু ন'খ'ত্রে কীভাবে ৪টি প্রোটন বা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে পারে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করে কিছুটা শক্তিও। এই পদ্ধতির নাম রাখা হয়েছে কার্বন-নাইট্রোজেন-অক্সিজেন চক্র বা *সি-এন-ও সাইক্ল* (CNO Cycle)।

আরো একটি পরমাণু সংযোজন পদ্ধতি আছে। একে প্রোটন-প্রোটন চক্র বা *পি-পি সাইক্ল* P-P Cycle বলে। এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন, ডয়েটেরিয়াম, হিলিয়াম-৩ এবং হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরি হতে পারে। দুটি পদ্ধতিতেই হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। এবং নতুন বস্তু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির উদ্ভব হয়।

আমাদের সূর্যে প্রোটন-প্রোটন পদ্ধতিতে শক্তি উৎপন্ন হয়ে চলেছে। ১৫০ কোটি কেলভিন তাপমাত্রায় এটাই কার্যকর সংযোজন প্রক্রিয়া। বড়ো ন'খ'ত্রের বেলায়, যেখানে ২০০ কোটি কেলভিন তাপমাত্রা উদ্ভূত হতে পারে, সেখানে সি-এন-ও চক্র কাজ করে।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং সূর্য যে ৫০০ কোটি বছর ধরে আলো এবং উত্তাপ বিকিরণ করে চলেছে, এর মধ্যে ব্রহ্মা বা সূর্য বা অ্যাপোলো বা আমন-রে এঁদের কোন ভূমিকা নেই। সত্যিই নেই। যা আছে, তা বস্তুগত খেলা।

বিশ্বসৃষ্টির সময়ে সেই আদিম ব্রহ্মাণ্ডে নিউট্রন ও বিকিরণের মিশ্রণ থেকে সরল পরমাণু হাইড্রোজেন-হিলিয়াম তৈরি হচ্ছিল, তখন সামান্য পরিমাণে বেরিলিয়াম-৭, লিথিয়াম-৭, বেরিলিয়াম-৮ এবং বোরোন-৮ মৌলের কেন্দ্রীন গঠিত হয়েছিল। বস্তু সৃষ্টির এই এক পর্যায়। আবার ন'খ'ত্রের অন্তঃস্থলে কার্বন-১২ পরমাণু দিয়ে কেন্দ্রীন-সংযোজন প্রক্রিয়া চলতে শুরু করলে, আমরা পেতে পারি আরো ভারী পরমাণু-কেন্দ্রীন যেমন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, ইত্যাদি। এটি হল বস্তুসৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়।

...

দেখা যাচ্ছে, বস্তুসৃষ্টির মধ্যে দুটো পর্যায় আছে। অন্তত এই পর্যন্ত যতটা জানা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, হাইড্রোজেন-হিলিয়াম থেকে বোরোন পর্যন্ত বস্তু সৃষ্টি হতে পারছে এবং তা হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির সময়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, কার্বন-১২ থেকে ভারী পরমাণু-কেন্দ্রীনগুলো নির্মিত হতে পারছে আর তা হচ্ছে ন'খ'ত্রে। মধ্যিখানে ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে, বোরোন থেকে কার্বন-১২ পর্যন্ত পরমাণু-গঠন প্রক্রিয়া। তারা কী করে নির্মিত হল?

বিজ্ঞানী হয়েল বললেন — কার্বন পরমাণু-কেন্দ্রীন গঠিত হতে পারে কেবলমাত্র ন'খ'ত্রে। খুব বেশি তাপমাত্রায় ও ঘনত্বে। ৩টি হিলিয়াম কেন্দ্রীন যুক্ত হয়ে ১টি কার্বন-১২ কেন্দ্রীন গঠিত হতে পারে।

ব্যাপারটা যে সত্যি সেটা পরী'খ'াগারে প্রমাণ করলেন উইলি ফাউলার এবং বারব্রিজ দম্পতি।

এভাবে আমরা বস্তুদেহ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারলাম। জানতে পারলাম সাধারণ মৌল বস্তুপিণ্ড নিয়ে যদি জগৎ শুর ু করে থাকে, তবে তারপরে জগতে বিবর্তনের ফলে অনান্য বস্তু আপনা থেকে গঠিত হতে পারে। হাইড্রোজেন কণা থেকে শুর ু করলে কিভাবে কার্বন কণা পর্যন্ত বস্তু নির্মিত হতে পারে।

বিবর্তন শুধু প্রাণীজগতে নয়, বস্তুজগতেও আছে।

মহাকাশে বস্তুপুঞ্জ নানাভাবে তারামণ্ডলে, নীহারিকায়, মেঘপুঞ্জে এবং ন‘খ’ত্রে বিরাজ করছে। আলো ছাড়াও বিকিরণ করছে আরো অনেক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরশ্মি। রেডিও তরঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা চর্মচ‘খে’ বিকীর্ণ আলোকতরঙ্গ গ্রহণ করে যা দেখার তা দেখি। দূর মহাকাশের আলোকতরঙ্গ খালি চোখে ধরা পড়ে না। তখন আমরা অপটিকাল টেলিস্কোপের সাহায্য নিয়ে দেখি। আলোকতরঙ্গ ছাড়াও বিকীর্ণ অন্যান্য তরঙ্গ ঠিকমতো ধরতে পারলে, তা দিয়েও বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

মহাকাশের বস্তু আলোক ছাড়া বিকিরণ করে রেডিও তরঙ্গ, গামা তরঙ্গ, অতিবেগুনী রশ্মি ও অবহেলিত রশ্মি। সেই সব তরঙ্গ থেকেও মহাকাশের অনেক বিচিত্র বস্তু দেখা সম্ভব। দেখুন দেখি, আমরা কত রকমভাবে দেখতে শিখেছি। আলো না হলেও অন্ধকারে দেখা যায়, এ এক আশ্চর্য ভাবনা। শুধু ভাবনা নয়, এই অভিজ্ঞতা অর্জনও করা যায়।

...

কেমব্রিজের বিজ্ঞানী *মার্টিন রাইল* (১৯১৮-১৯৮৪ খৃঃ) রেডিও অ্যাস্ট্রনমির জনক। তাঁর প্রচেষ্টায় রেডিও তরঙ্গ ধরার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে রেডিও টেলিস্কোপ।

দেখা গিয়েছে, -০.০০১ সেমি থেকে ১৫ মিটার দীর্ঘ রেডিও তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় না বা উপরের আয়ন-মণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় না মহাকাশে। ফলে দৃশ্য আলোর মতো ওরা নেমে আসতে পারে ধরার ধূলিতে। এই তরঙ্গ ধরার ব্যবস্থা হল রেডিও টেলিস্কোপ যন্ত্রে। উল্লেখ করা দরকার যে অনেক দূর থেকে আসা আলোর বেলায় যেমন লালচ্যুতি কিংবা ‘খীণ-হয়ে-যাওয়া দেখা যায়, রেডিও তরঙ্গের বেলায় তেমন হয় না। ফলে অনেক দূরের মহাকাশ পর্যবে‘খ’ণ করতে পারা যায়।

এভাবে দূর জগতের নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়ার উপায় আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। এমন কী, সুদূর অতীতের বিশ্ব সম্পর্কেও জানতে পারা সম্ভব হয়েছে। অতীত বিশ্বের খবর নিয়ে হয়তো রেডিও তরঙ্গ যাত্রা করেছিল উৎস থেকে কোটি কোটি বছর আগে। আজ তারা এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের রেডিও দূরবিনে। ফলে আমরা এখন যা দেখছি, আসলে তা অনেক কাল আগেকার কথা।

বিজ্ঞানী রাইল ল‘খ’্য করলেন যে দূর মহাকাশে দৃশ্য আলোর উৎস যে হারে ‘খীণ হচ্ছে, সে হারে রেডিও-উৎসগুলি ‘খীণ হচ্ছে না। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল যে আগেকার বি্বে বর্তমানের চেয়ে আরো বেশি সংখক রেডিও-উৎস ছিল। তাহলে তো শাশ্বত বিশ্বের ভাবনা টেকে না। দূরের বিশ্ব আর কাছের বিশ্বের মধ্যে রেডিও-উৎসের এই যে তারতম্য ধরা পড়েছে, তার কারণ হল বিশ্ব চিরসম নয়।

মহাকাশ পর্যবে‘খ’ণে তখন আরো এক রহস্যজনক বস্তুর খোঁজ মিলল। এদের

পরিচয় হল ন‘খ’ত্র-সদৃশ রেডিও-উৎস বা কোয়াসি-স্টেলার রেডিও বা কোয়াসার (Quaser)। দেখা যাচ্ছে, কোয়াসার থেকে আসা আলোর লালচ্যুতি খুব বেশি। অর্থাৎ ওগুলো ভীষণ বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে যে এমন কোয়াসার সন্ধান মিলছে, যেমন, ও-কিউ১৭২, যার গতিবেগ শতকরা ৯০ ভাগ আলোর বেগের সমান। আলোর দুরন্ত বেগের কাছাকাছি পৌঁছোনো কোন বস্তুর প‘খে’ প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার। তবু এমন গতিবেগ কী করে হল, এ এক রহস্য।

কোয়াসার রয়েছে মহাকাশের বিপুল দূরত্বে। তবু তাদের বিকিরণ খুব উজ্জ্বল। তারামণ্ডলের থেকেও অনেক বেশি। কোয়াসার বুঝি অতীত বিশ্বের সা‘খ’্য বহন করে বেড়ায়। বর্তমান বিশ্বের নয়। তা থেকে আরো বোঝা যায় যে বিশ্ব কোনকালে শাশ্বত ছিল না।

...

১৯৬৫ সালে দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী *আর্নো পেনজিয়াস* (জন্ম ১৯৩৩) এবং *রবার্ট উইলসন* (জন্ম ১৯৩৬) নিউজার্সির ক্রফোর্ডহিলে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির গবেষণাগারে অতি সুগ্রাহী ২০ ফুট ব্যাসের হর্ন অ্যান্টেনা নিয়ে কাজ করতে করতে বিস্ময়ের সঙ্গে ল‘খ’্য করেন যে আকাশের নানা দিক থেকে ৭.৩৫ সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্কেত ধরা পড়ছে। যে দিক থেকে দেখা যায় না কেন, একই ঘটনা ঘটছে। মহাকাশের সমস্ত দিক থেকে এই বিশেষ তরঙ্গটি এসে পৌঁছচ্ছে অ্যান্টেনায়। এ কার সঙ্কেত? কোন লোকের? এ কি পিতৃগণ-গন্ধর্ব-সাধ্যগণের না অন্য গ্রহের মানুষের? নাকি এ কোন দেহতার ভাষা?

বিজ্ঞানী দুজন যোগাযোগ করলেন, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের *রবার্ট বব ডিক* (১৯১৬-১৯৯৭ খৃঃ) এবং *জিন জেমস এডুইন পিবলস* (জন্ম ১৯৩৫ সাল), এঁদের সঙ্গে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সিদ্ধান্ত হল যে এটি মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বই অন্য কিছু নয়। বিশ্বের যখন সৃষ্টি হয়েছিল, এই তরঙ্গমালা তখনকার। এই তরঙ্গ সেই আদি সৃজন মুহূর্তের কিছু স্মৃচিচিহ(বহন করে চলেছে। সর্বব্যাপী এই রশ্মিটির তীব্রতার পরিমাপ সমমূল্যের তাপমাত্রায় দাঁড়ানোর কথা ৩ কেলভিনের মতো। অর্থাৎ -২৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সতেরো বছর আগে গ্যামো-আলফার এই বিকিরণেরই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সৃষ্টিলগ্নে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রচণ্ড। কালে কালে তা যখন কিছুটা নিচে নেমে আসে, তখন এক সময় রশ্মিকণা বস্তুকণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই আদিম অগ্ন্যুচ্ছ্বাসেরই অবশেষ রশ্মিকণা আজো ভেসে বেড়ানোর কথা এই মহাজগতে। পেনজিয়াস-উইলসন সৃষ্টির সেই ব্রহ্মমুহূর্তের সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু যেন শুনতে পেয়েছেন। এই অবশেষ রশ্মি সা‘খ’্য দিচ্ছে যে মহাবিস্ফোরণের ভাবনা যেভাবে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, তা ঠিকপথেই

চলেছে।

এরপর বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল নাকি বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার একটি সংখ্যায় মেনে নিয়েছিলেন যে শাশ্বত বিশ্বের ধারণা আর ঠিক নয়। তবুও বলতে হবে — শাশ্বত বিশ্বের ভাবনা আজো মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে। কিছু বিজ্ঞানীর মগজে কাজ করছে। কেননা এটাও সত্যি যে বিগব্যাং থিয়োরি এখনো অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করে উঠতে পারেনি। যত'খ'ণ তা না পারছে, তত'খ'ণ অন্য ভাবনা সম্পূর্ণ বর্জন করে চলাও তো বিজ্ঞানসম্মত নয়।

বিগব্যাং থিয়োরি অনুসারে বিশ্বতত্ত্বের যে চালু মডেলটি রয়েছে, আসুন তার সঙ্গে আর একটু পরিচিত হওয়া যাক। একে বলা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল। সত্যি কথা বলতে কি, সৃষ্টির ব্রহ্মমুহূর্তের তত্ত্বকথা এখনো তেমন জানা হয়নি। শুধু অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে সৃষ্টির সময়ে বিশ্ব অত্যন্ত উচ্চ তাপে এবং ঘনবদ্ধ অবস্থায় ছিল বস্তু ও বিকিরণের পিণ্ড হয়ে। তা এক মহাবিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। তারপর থেকেই জগতের প্রসারণ এবং বিবর্তন হয়ে চলেছে। নতুন বস্তুরাশির সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বহুকাল ধরে ভাঙাগড়ার সেই খেলা চলতে চলতে ন'খ'ত্র তারামণ্ডল সূর্য পৃথিবী নিয়ে গড়া বর্তমান বিশ্বে পৌঁছে যাওয়া হয়েছে।

এখন আমরা, অর্থাৎ নগণ্য সূর্যের নগণ্য গ্রহের মানুষেরা, বহু বহুকাল আগের সেই অতীতকে জানতে চেষ্টা করছি। সে অতীতে আমরা কেউ বেঁচে ছিলাম না, প্রাণ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, সূর্য ছিল না, সেই অতীত আমাদের ইতিহাস নয়, পুরাতত্ত্ব নয়, ভূতত্ত্ব নয়, আরো আরো অতীত — মহাকালের অপার বিস্ময়।

...

আমরা যা কিছু জানি, সবই সৃষ্টির ঘন্টা বাজার একটু পরে থেকে। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিফেন ওয়েনবার্গ সৃষ্টিকালের ছবিটা যেমন করে সাজিয়েছেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করব। গ্যামোর মডেল থেকে তা কিছুটা সংশোধিত।

১। সৃষ্টির ঠিক ০.০১ সেকেণ্ড পরের কথা।

তাপমাত্রা তখন ১০,০০০ কোটি কেলভিন। ১ লিটার বস্তুর ঘনত্ব ৩৮০ কোটি কিলোগ্রাম। জগতে মহানন্দে বিরাজ করছে বস্তুকণা আর বিকিরণের এক আশ্চর্য মিশ্র পদার্থ বা মহাজাগতিক স্যুপ। আদিতে বিকিরণই ছিল প্রধান। খুব ঘনবদ্ধ থাকার জন্য আর নিদারুণ তাপের জ্বালায় তখন বিকিরণ-কণা ও বস্তু-কণা ক্রমাগত দ্রুত সংঘর্ষে লিপ্ত। বিশ্ব দ্রুত প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রা সর্বত্র একই ছিল। ফোটন কণা, ইলেকট্রন-পজিট্রন এবং নিউট্রিনো-অ্যান্টিনিউট্রিনো — এই হল তখন জগতের আদি উপাদান। খুব সামান্য পরিমাণে ছিল প্রোটন-নিউট্রন। ১০০ কোটি ফোটন বা ইলেকট্রন বা নিউট্রিনো প্রতি ১টি করে প্রোটন এবং নিউট্রন কণা। ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে প্রোটন

পরিণত হচ্ছিল নিউট্রনে আর নিউট্রন প্রোটনে। উভয়ের অনুপাত ছিল সমান সমান।

২। ০.১ সেকেণ্ড পরে।

তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছিল ৩০০০ কোটি কেলভিন এবং ঘনত্ব লিটার প্রতি ৩ কোটি কিলোগ্রাম। বিশ্বের প্রসারণ-বেগ হ্রাস পেয়েছে খনিকটা। নিউট্রনগুলো একটু বেশি তাড়াতাড়ি প্রোটন হতে শুরু করেছে। ফলে প্রোটন-নিউট্রন অনুপাত বদলে তখন দাঁড়াল ৬২ ঃ ৩৮।

৩। ১.১ সেকেণ্ড পরে।

তাপমাত্রা কমে হল ১০০০ কোটি কেলভিন। এবং ঘনত্ব লিটার প্রতি ৩,৮০,০০০ কিলোগ্রাম। ভীষণ উত্তাপের জন্য পরমাণুর কেন্দ্রীন গঠিত হওয়া তখনো সম্ভব হচ্ছিল না। নিউট্রিনো কণা মুক্ত হল এবং ছিটকে বেরিয়ে যেতে লাগল। নিউট্রিনো আরো দ্রুতহারে প্রোটনে রূপান্তরিত হতে লাগল। প্রোটন-নিউট্রনের অনুপাত দাঁড়াল ৭৬ ঃ ২৪।

৪। ১৩.৮৩ সেকেণ্ড পরে।

বিশ্বের তাপমাত্রা হল ৩০০ কোটি কেলভিন। এই তাপমাত্রায় ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রন এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন থেকে ফোটন আর সৃষ্টি হতে পারছিল না। নতুন করে ইলেকট্রন-পজিট্রন তৈরিও হচ্ছিল না। বরংচ যে ইলেকট্রন-পজিট্রন তৈরি হয়েছিল, তারা নিজেদের নিজেরাই ধ্বংস করতে থাকল। বিশ্ব তখন পরমাণু গঠনের উপযুক্ত হল। ১টি প্রোটন এবং ১টি নিউট্রন যুক্ত হয়ে তৈরি করল ডয়টেরিয়াম-কেন্দ্রীন। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য তারা স্থায়ী হতে পারছিল না। প্রোটন-নিউট্রনের অনুপাত দাঁড়াল ৮৩ ঃ ১৭।

৫। ৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড পরে।

তাপমাত্রা পৌঁছল ১০০ কোটি কেলভিনে। প্রোটন-নিউট্রনের অনুপাত দাঁড়াল ৮৬ ঃ ১৪। তাপমাত্রা ক্রমশ কমে যাওয়ার ফলে পরমাণু-কেন্দ্রীন গঠনকর্ম আরো সহজ হল। তৈরি হতে থাকল প্রথমে তো ডয়টেরিয়াম, তারপর একে একে ট্রিটিয়াম, হিলিয়াম-৩ এবং হিলিয়াম-৪ কণা। যত নিউট্রন কণা উৎপন্ন হয়েছিল, সে সমস্ত হিলিয়াম কণার কেন্দ্রীনে যুক্ত হয়ে পড়ল। তরৈ ফলে পড়ে রইল শুধু প্রোটন কণা। তার পরিমাণ দাঁড়াল শতকরা ৭৪ ভাগ। আর উৎপন্ন হিলিয়ামের পরিমাণ দাঁড়াল শতকরা ২৬ ভাগ।

৬। ৩৪ মিনিট ৪০.০১ সেকেণ্ড পরে।

তাপমাত্রা তখন ৩০ কোটি কেলভিন এবং ঘনত্ব লিটার প্রতি ৯.৯ কিলোগ্রাম। ইলেকট্রন-পজিট্রন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র প্রতি ১০০ কোটিতে ১টি করে ইলেকট্রন বেশি থেকে গিয়েছে। সেই সময় ইলেকট্রন-পজিট্রন ধ্বংস হয়ে মহাবিশ্বের

তাপের যোগান দিয়েছিল।

এই হল বিশ্বসৃষ্টির আদি সময়কালের ঘটনাবলী। বস্তুর রূপান্তরের কিছু সম্ভাব্য চিত্র। অবস্থা যে এই রকম ছিল অনেকটা, তার কিছু সা'খ্যপ্রমাণ আছে। তাবে তাই শেষ কথা নয়।

মহাবিস্ফোরণের ১ ঘন্টা পরে জগতের তাপমাত্রা হল ১৭ কোটি কেলভিন। আর ৩ লাখ থেকে ৭ লাখ বছর পরে তা দাঁড়াল ৩০০০ থেকে ৪০০০ কেলভিন। ঐ তাপমাত্রায় প্রোটন-নিউট্রন দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীনের আকর্ষণ উপে'খ্য করে আর থাকা সম্ভব হল না ইলেকট্রন কণার প'খ'। তখন গঠিত হয়েছিল হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পরমাণু। ও সময়ের আরেকটি প্রধান ঘটনা হল বিকিরণ-কণা এবং বস্তু-কণা মধ্যে পাকাপাকি বিচ্ছেদ। এতকাল তড়িতায়িত কেন্দ্রীনগুলো ও ইলেকট্রন-পজিট্রন আলো শোষণ করে ও ছাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকে অস্বচ্ছ করে রেখেছিল। নিস্তড়িৎ পরমাণু গঠিত হলে, আলো মুক্তিলাভ করল। হঠাৎ জগতকে করে তুলল স্বচ্ছ।

সেদিন থেকে রশ্মিকণা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে লাগল। সেই রশ্মিকণার 'খীণ পদধ্বনিই শুনেছিলেন দুই বিজ্ঞানী পেলজিয়াস-উইলসন। মহাবিস্ফোরণের ১৭০০ কোটি কোটি সেকেণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ কোটি বছর পরে। ততদিনে জগতের তাপমাত্রা কমতে কমতে শীতলতম অবস্থায় পৌঁছেছে – মাত্র ৩ কেলভিনের মতো।

...

বিজ্ঞানী ওয়েনবার্গ বিশ্বসৃষ্টির ক্রমপর্যায় শুরু করেছেন মহাবিন্দুর ০.০১ সেকেণ্ড সময় পর থেকে। পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আমরা যে 'খু'দ্রতম সময়কাল নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারি, তা হল প্ল্যাংক সময় ($১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড)। যদি সৃষ্টি শূন্য সময়ে ঘটেছে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে শূন্য সময়কাল থেকে প্ল্যাংক সময় পর্যন্ত বিশ্বের হালহকিকত বোঝার কোন উপায় নেই। বলা বাহুল্য সৃষ্টির আগে কিছু থাকতে পারে না। ফলে আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানগম্যিটাও শুরু হতে পারে, প্ল্যাংক সময় থেকে।

জগতের শুরু কিছু বল, বস্তু ও বিকিরণ দিয়ে। আমরা একলকার বিশ্বে চারটি মৌলিক বল দেখতে পাই – মহাকর্ষ বল, তীব্র হল, মৃদু বল এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় বল। অনুমান হয়, সৃষ্টিকালে এই চারটি বল এক ও অভিন্ন কোন প্রকারের বল হয়ে বিরাজ করছিল। আমরা আরো জেনেছি যে প্রোটন-নিউট্রন কণাও জগতে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান নয়। তারা তৈরি হয়েছে কোয়ার্ক কণা দিয়ে। জগতের শুরু তবে এই কোয়ার্ক-অ্যান্টিকোয়ার্ক এবং লেপ্টন-অ্যান্টিলেপ্টন কণা দিয়ে। আমাদের বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডার এই পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা সব অসীম ঘনত্বে বিরাজমান ছিল। মহাবিস্ফোরণের পর ওই একীভূত চারটে মৌলিক বল ভেঙে গিয়ে একে একে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

আবদুল সালাম (১৯২৬-১৯৯৭ খৃঃ) এবং *স্টিফেন ওয়েবার্গ* (জন্ম ১৯৩৩ সাল)-

এর তত্ত্ব অনুসারে ১০ কোটি কোটি কেলভিন ($১০^{১৫}$ কে) তাপমাত্রায় তড়িৎ-চুম্বকীয় বল এবং মৃদু বল একীভূত হয়ে তড়িৎ-কমজোর বল (Electro-weak Force, ইলেকট্রো-উইক ফোর্স) হয়েছিল। তাপমাত্রা যখন গ্রান্ড ইউনিফায়েড থিয়োরি মতে ১০ লাখ কোটি কোটি কোটি কেলভিন ($১০^{২৭}$ কে) হয়েছিল, তখন তড়িৎ-কমজোর বল এবং দৃঢ় বল একীভূত ছিল। মহামিলন বল (Grand Unified Force, গ্রান্ড ইউনিফায়েড ফোর্স) নামে। তারও আগে প্ল্যাংক সময়কালে মহাকর্ষও ওই গ্রান্ড ইউনিফায়েড ফোর্সের সঙ্গে একাকার হয়েছিল। সৃষ্টির সেই আদিম কালে জগতে ছিল একটিই বল – মহাজাগতিক বল (Cosmic Force, কসমিক ফোর্স)। ১০ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি কেলভিন ($১০^{৩২}$ কে) তাপমাত্রায়।

সেই মহাবিস্ফোরণের প্রথম সেকেণ্ডের অতি 'খু'দ্র ভগ্নাংশ সময়ে ব্রহ্মাণ্ড ছিল কোয়ার্ক-গ্লুয়নের প্লাজমা স্যুপ – দেশকালের কোন এক সীমায়। এই প্লাজমায় আরো ছিল লেপ্টন কণা এবং ফোটন। লেপ্টন বলতে ইলেকট্রন, মিউয়ন, নিউট্রিনো এবং এদের বিপরীত কণাসকল। পরে বিশ্বের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকলে গ্লুয়নের দশলাখ ভাগের এক অংশ কাল পরে কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন তৈরি করে নিউট্রন এবং প্রোটন কণা। এই হল গ্যামোর বিশ্বের অগ্রবর্তী সময়কালের বৃত্তান্ত।

তারও আগে প্ল্যাংক সময়কালে বস্তুর অবস্থা ঠিক কী যে ছিল তা এখনো বলা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। অনুমান করা হচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ড তখন ছিল দশ মাত্রায় এবং বস্তু ছিল সুতোর মতো একমাত্রিক – স্ট্রিং (string)। কোয়ার্ক লেপ্টনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দেশকালের মধ্যেও পার্থক্য ছিল অস্পষ্ট।

ভাবা হচ্ছে, মহামিলনের যুগের পরে বিশ্বের এক প্রচণ্ড সম্প্রসারণ ঘটে। তাকে স্ফীতি (inflation) বলে। সেই সময় বিন্দুপ্রায় বিশ্বজগৎ অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। স্ফীতির সময় প্রচুর শক্তির উৎপত্তি হয় এবং প্রায়-শূন্য দেশকালের গর্ভে তা সঞ্চিত হয়। স্ফীতির শেষে সেই শক্তি পদার্থ ও বিকিরণ হয়ে নির্গত হয়।

...

এভাবে জগতের সৃষ্টি হল। মৌল বস্তুর সৃষ্টি হল। সৃষ্টি এটাই হল প্রথম এবং প্রধানতম ধাপ। সৃষ্টির ব্রহ্মামুহূর্ত বা জিরো আওয়ারে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে আপাতত আর কোন তথ্য নেই। আছে ০.০১ সেকেণ্ড সময় পর থেকে। মাত্র ০.০১ সেকেণ্ড সময় পর থেকে। সাম্প্রতিক ভাবনায় অবশ্য সৃষ্টিমুহূর্তের আরো কাছের ঘটনায় পৌঁছনোর চেষ্টা আছে। জগৎ সৃষ্টির পরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার খতিয়ান এখন কিছুটা জানা। এভাবে বিশ্বসৃষ্টির গভীরে ঝুঁকে দেখা একমাত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের প'খ'ই সম্ভব। অন্য কোন শাস্ত্রে নয়।

বিশ্বের প্রসারণ আজো হয়ে চলেছে। তাপমাত্রা আজো হ্রাস পেয়ে চলেছে। বস্তুর

ঘনত্ব কমছে। সৃষ্টির আদিম ক্রোধানল শান্ত হয়ে গিয়েছে কবে! আশ্চর্যের কথা হল তারপরও সবকিছু হিম হয়ে যায়নি। প্রসারিত বিশ্বে বস্তুর মধ্যে দেখা দিল নানা বৈচিত্র্য। একদিকে শীতলতা জাঁকিয়ে বসেছে। অন্যদিকে আবার অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠেছে এখানে ওখানে। একদিকে মহাশূন্যতার দিকে যাত্রা। অন্যদিকে বস্তুর ঘনবদ্ধ হওয়া। এ সবের ফলে জগতে সৃষ্টি হল তারামণ্ডল। তার মধ্যে তারাজগতের বস্তুরাশি জ্বলে উঠল ন'খ'ত্রে। গড়ে উঠল গ্রহ-উপগ্রহ। জগতের আরো কত রহস্য।

...

১৯৫১ সালে ক্যাথলিক চার্চ উপরোক্ত(বিগব্যাং মডেলকে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছিল। ত্রিশ বছর পরে জেসুইট পাদ্রীরা ভাটিকানে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকে। মহামান্য পোপ সেখানে উপদেশ দেন – বিগব্যাং-এর পরের ঘটনাবলী নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টির মুহূর্ত নিয়ে অনুসন্ধান চালানো ঠিক হবে না।

বিগব্যাং থিয়োরি বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কী না তা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। বিগব্যাং থিয়োরি মেনে নেওয়াটাই কোন এক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প'খে' বিরল পদ'খে'প। একদিন অন্ধ আবেগের বশে হাইপাসিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল, ব্রুনোকে দগ্ধ করা হয়েছিল আর গ্যালিলিওকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কৃত বাস্তবতা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প'খে' মেনে নেওয়া মোটেই সহজ কথা নয়।

একমাত্র ক্যাথলিক চার্চ এমন সাহসী পদ'খে'প নিতে পারল।

৪.৫। তারামণ্ডল-ন'খ'ত্র সৃষ্টি

বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর সৃষ্টি হল। অবশ্য মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুসারে। সেই বস্তুরাশি থেকে জন্মেছিল অগণিত তারামণ্ডল আর তারামণ্ডলের মধ্যেকার কোটি কোটি ন'খ'ত্র। তা না হয় হল। এতে সমস্যাটা কোথায়? এমনিতে কোন সমস্যা নেই. কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে তবু সমস্যা।

সৃষ্টির পর বিশ্বজগৎ প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং শীতল হচ্ছে। ঘন বস্তু হালকা হয়ে চলেছে। তাহলে আবার এখানে ওখানে ন(ত্র-তারামণ্ডলে বস্তুরাশির জমাট বাঁধা সম্ভব হল কী করে? বিস্ফোরণের দমকে সে যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি করে ছড়িয়ে থাকার কথা। মহাকর্ষের প্রভাব কাটিয়ে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল যখন, তাদের তো এক একটা জড়ো হয়ে জমাট বাঁধার কথা নয়। অথচ তারামণ্ডলের জন্ম হতে হলে এরকম উলটো পথে হাঁটতে হবে।

তবে কি শুরুতে বিশ্বর সর্বত্র বস্তুরাশির অস্তিত্ব একরকম ছিল না? অসাম্য ছিল তার ঘনত্বে? তা প্রমাণ হবে কী করে?

ভেবেচিন্তে বিজ্ঞানীরা দেখলেন – আদি বিশ্বে অসাম্য যদি থেকে থাকে, তবে আমরা সেই যে আদি বিশ্বের মহাজাগতিক বিকিরণের খোঁজ পেয়েছি, তার মধ্যেও অসাম্য থাকবে। যদি তা হয়, তবে তো তার হদিশ পেয়ে যাব মহাজাগতিক বিকিরণের তারতম্যের মধ্যে।

এই ভাবনা নিয়ে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ১৯৮৯ সালে মহাকাশে পাঠালো কোবে-উপগ্রহ (Cosmic Background Explorer Satellite)। মহাজাগতিক বিকিরণ সর্বত্র সমান, নাকি তার মধ্যে বিভিন্নতা আছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর করা তাদের উদ্দেশ্য।

পরী'খ'াশেষে ১৯৯২ সালে নাসার কোবে-টিমের তরফ থেকে জর্জ স্মুট ঘোষণা করলেন – মহাজাগতিক বিকিরণের তরঙ্গমালার মধ্যে বিরাজ করছে অসাম্য। রয়েছে কোথাও উষ(অঞ্চল বা হট স্পট কোথাও শীতল অঞ্চল বা কোল্ড স্পট।

বিজ্ঞানীরা এই বিভিন্নতার নাম রেখেছেন 'রিপলস'। যেন মহাজগতের প্রশান্ত সরোবরে খুব ছোট ছোট ঢেউ লেগেছে। আমরা বলতে পারি ঊর্মিমালা। খুবই নগণ্য সে বি'খে'ভ। তবু আছে এবং তা সা'খ্য দিচ্ছে মহাবিশে(র বস্তুরাশির খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় যার অনিবার্য পরিণতি হল তারামণ্ডল গঠন।

মহাজাগতিক বিকিরণের এই সা'খ্য আরো নিখুঁত করার ল(্যে বিগব্যাং বিজ্ঞানীরা অদূর ভবিষ্যতে আরো উপগ্রহ পাঠাবেন। কোবরাস বা সামবা উপগ্রহ।

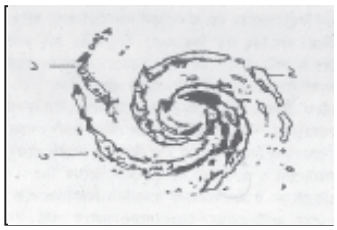

চিত্র-২০। দুগ্ধসরণী তারামণ্ডল।
১- ওরিয়ন বাহুতে সূর্যের অবস্থান(
২- স্যাগিটারিয়াস বাহু(
৩-পার্সিয়ুস বাহু।

তারাজগৎ গঠন হল বিশ্বসৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপ।

মহাবিশ্বের বয়স ধরা হচ্ছে মোটামুটিভাবে ১৫০০ কোটি বছর। এখানে রয়েছে ১০০-৩০০ কোটি তারামণ্ডল এবং প্রত্যেক তারামণ্ডলে গড়ে ১০,০০০ কোটি ন'খ'ত্র। তারামণ্ডলগুলো অনন্ত শূন্যতার পারাবার পার হয়ে যেন এক একজন বিরাজ করছে দূরে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। তারামণ্ডলের মধ্যে আবার কোটি কোটি ন'খ'ত্র আছে। তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে পরস্পর পরস্পরের থেকে। মাঝে তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান – যার নাম আন্তর্ন'খ'ত্র দূরত্ব (Intersteller Space)। এই যে মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের গ্যাস দিয়ে, তাতে মোট কতটা বস্তু থাকতে পারে? হিসেব করা হয়েছে, ৩০ লাখ কোটি কোটি সূর্যের সমান বস্তুদেহ দিয়ে এই জগতের গঠন।

প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ কোন-না-কোনভাবে বস্তুর ঘনত্বের অসাম্যের জন্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। খণ্ডগুলো থেকে তারামণ্ডল হল। কীভাবে তা খণ্ডিত হল, তা স্পষ্ট হয়নি এখনো। সম্ভাব্য নানা মডেল নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। এমন হতে পারে যে বস্তুরাশি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলে এক একটি খণ্ড এক একটি তারামণ্ডল হল। আর কয়েকটি তারামণ্ডল পরস্পরকে আকর্ষণ করে তারামণ্ডলের ক্লাস্টার গড়ে তুলল।

আবার এমনও হতে পারে যে এক একটি খণ্ড এক একটি ক্লাস্টার হল আর সেই ক্লাস্টার ভেঙে গিয়ে এক একটি তারামণ্ডল গঠন করল। তারামণ্ডল থেকে পরে ক্লাস্টার, না, ক্লাস্টার থেকে পরে তারামণ্ডল হল, তা এ'খু'নি বলা যাচ্ছে না।

নানা রকমের তারামণ্ডল দেখা গিয়েছে। প্রধানত তাদের দুটো রকম আছে – কুণ্ডলিত (Spiral Galaxy) এবং ডিম্বাকৃতি (Elliptical Galaxy) তারামণ্ডল।

কুণ্ডলিত হলে তার মধ্যে থাকবে একটা স্ফীতি (Bulge)। পাশ থেকে দেখলে দুপাশে ছড়ানো থাকবে দুটো ডিস্কের মতো ডানা। উপর থেকে দেখলে ওই ডানায় বেশ কয়েকটি লেজ থাকবে। এ ছাড়া মধ্যের স্ফীতি সাধারণ (Common) তারাকুণ্ডলে গোলাকার কিন্তু আরেক ধরনের কুণ্ডলে (Barred) লম্বাটে ধরনের। কুণ্ডলীর দৃঢ়তা

অনুসারে নানা রকমের কুণ্ডলিত তারামণ্ডল হয়। বিজ্ঞানী হাবল তার শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

ডিম্বাকৃতি তারামণ্ডলে ঘূর্ণন কম। মহাকর্ষজনিত আকর্ষণও কম। যে সব তারামণ্ডলের ঘূর্ণনবেগ শুরু থেকে অল্প ছিল, বোধ হয় তারা ডিম্বাকৃতি তারামণ্ডল গঠন করেছে। এই প্রকার মণ্ডলে ন'খ'ত্র সৃষ্টি হয় খুব কম। বেশির ভাগই প্রাচীন বয়সের ভারে ন্যুব্জ ন'খ'ত্র। 'এম-৮৭' একটি ডিম্বাকৃতি তারামণ্ডল।

আর যে নানা রকমের তারামণ্ডল আছে, তাদের নিয়মিত কোন আকার নেই।। এদের অনিয়মিত তারামণ্ডল (Irregular Galaxy) বলা হয়। যেমন বৃহৎ ম্যাগেল্লান মেঘ (Large Magellan Cloud)।

কখনো এক তারামণ্ডলের সঙ্গে অন্য তারামণ্ডলের সংঘর্ষ হয়। যেমন এন-জি-সি-১৬২৯ এর সঙ্গে এন-জি-সি-১৬৩০ তারামণ্ডলের সংঘর্ষ হয়েছে। কখনো এক তারামণ্ডলের লেজের সঙ্গে অন্য তারামণ্ডলের লেজ জড়িয়ে যায়। আমরা সেরকমই অন্তত দেখতে পাই। ভার্গো ক্লাস্টারের এন-জি-সি-৫৪২৬ এর সঙ্গে এন-জি-সি-৫৪২৭ তারামণ্ডলের লেজ জড়ানো অবস্থায়। এমন কত বিচিত্র রহস্য নিয়ে এই মহাকাশ। আমরা তার কিছু কিছু খবর পাচ্ছি।

মহাকাশে এভাবে এখন আমরা অজস্র তারামণ্ডল দেখতে পাচ্ছি। তাদের নানাবিধ গঠন দেখছি। নানা প্রকার বিকিরণ দেখছি। আগে এত সব দেখা সম্ভব ছিল না।

আমরা মানুষেরা যে তারামণ্ডলে রয়েছি তার নাম দিয়েছি *দুগ্ধসরণী তারামণ্ডল* (Milkyway Galaxy)। এটি একটি কুণ্ডলিত তারামণ্ডল। পাশ থেকে দেখলে অনেকটা মোটা চাপাটির মতো মনে হবে। কেবল তার ঠিক মাঝখানটা গোটার মতো ফুলে ঢাউস হয়ে ওঠা। উপর-নিচ থেকে দেখলে মনে হবে ঘনীভূত কেন্দ্রীয় স্ফীতি থেকে গোটা চারেক লেজ যেন চরকির মতো পাক খেয়ে রয়েছে। আর সমস্তটা ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু গোলাকার ন'খ'ত্রপুঞ্জ বা জ্যোতিশ্চত্র((Globular Cluster)। লেজসহ তারামণ্ডলের ব্যাস ১ লাখ আলোকবর্ষ আর ডিস্কের গভীরতা ১০০০-২০০০ আলোকবর্ষ। মাঝের ফুলে ওঠা কেন্দ্রীয় স্ফীতির ব্যাস ২০,০০০ আলোকবর্ষ এবং গভীরতা ৩০০০ আলোকবর্ষ। বিশাল তারামণ্ডলে রয়েছে বেশ কয়েক হাজার কোটি ন'খ'ত্র। সামগ্রিক ভর ১০,০০০ সূর্যের থেকেও বেশি।

মহাকাশে দুগ্ধসরণী সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নয়। রয়েছে ২৬টি তারামণ্ডল নিয়ে গড়া এক স্থানীয় জোট (Local Galaxy Cluster)-এ। যেমন, ১,৬০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে 'বৃহৎ ম্যাগেল্লান মেঘ' (LMC)। ২,০০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে 'খুদে ম্যাগেল্লান মেঘ' (SMC)। অ্যানড্রোমিডা (M31) তারাজগৎ রয়েছে ২০,০০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। হাইড্রা ক্লাস্টার (Hydra, M81) ৭০ লাখ, ভার্গো ক্লাস্টার (Virgo) ৫ কোটি,

তখন ন'খ'ত্রও পরিবর্তিত না হয়ে তো পারে না। প্রশ্ন হল, ন'খ'ত্র কেমন করে পরিবর্তিত হয়? কেমন করে তার রূপ বদলায়? মুনিঋষিদের শাস্ত্রে কি এ বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে?

প্রাক-ন'খ'ত্র পর্ব থেকে জ্বলে উঠে ন'খ'ত্র মুখ্যপর্বে চলে যায়। তাদের তখন বলে প্রধান পর্বের ন'খ'ত্র (Main Sequence Star)। হাইড্রোজেনের জ্বলন মুখ্যপর্বের মুখ্য কাজ। পর্বের সুস্থিতি নির্ভর করে অভিকেন্দ্রমুখী চাপ এবং কেন্দ্রজাত তাপশক্তির বহির্মুখী চাপের ভারসাম্যের উপর। অভিকেন্দ্রীক চাপে বস্তুকণা উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে উঠবে। আর তপ্ত বস্তুকণার জন্য এক বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি করবে। এক সময় উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হবে এবং ন'খ'ত্র জ্বলতে থাকবে। মোটামুটিভাবে সুস্থিত হয়ে।

জ্বলতে জ্বলতে এক সময় জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে। যাবেই। কেননা অনন্ত পরিমাণ জ্বালানী নেই তার গর্ভে। তখন কী হবে? তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন জ্বলতে জ্বলতে যে হিলিয়ামে পরিণত হবে তা কেন্দ্রীভূত থাকবে কেন্দ্রে আর হাইড্রোজেন-জ্বলন ক্রমশ কেন্দ্রের বাইরে স্তরে সরে যেতে থাকবে। সেই জ্বালানীও শেষ হয়ে এলে জ্বলন্ত ন'খ'ত্র ক্রমে নিষ্প্রভ ন'খ'ত্রে (Degenerate Star) পরিণত হবে। তখন ন'খ'ত্রের বস্তুরাশি এতই ঘন হবে যে পরমাণু থেকে ইনেকট্রন বিযুক্ত হয়ে যাবে। ন'খ'ত্র পরিণত হবে আয়নিত কেন্দ্রক এবং ইলেকট্রনের মিশ্রণে।

ভারতীয় বিজ্ঞানী *সুব্রহ্মানিয়াম চন্দ্রশেখর* (১৯১০-১৯৯৫ খঃ) ১৯৩১ সাল নাগাদ হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে ন'খ'ত্রের আয়তন যদি সূর্যের আয়তনের শতকরা ৪০ ভাগের কম হয়, তবে ন'খ'ত্র একরকমভাবে বিবর্তিত হবে। বেশি হলে অন্যরকমে।

সাধারণভাবে হাইড্রোজেন জ্বালানী শেষ হয়ে এলে শক্তি উৎপাদনের হার কমে যায়। কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষশক্তি তখন প্রবল হয়ে ওঠে। ন'খ'ত্র সঙ্কুচিত হয়। সেই চাপে তাপমাত্রা বাড়ে। বাইরের স্তরের হাইড্রোজেন আবার জ্বলতে শুরু করে। তখন তারকাটি ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে এবং একটি স্ফীত লাল দানবে (Red Giant) পরিণত হয়।

একদিকে তারকার স্ফীতি, অন্যদিকে কেন্দ্রে প্রবল সঙ্কোচনে ১০ কোটি ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ উদ্ভূত হয়। কেন্দ্রের হিলিয়াম তখন জ্বালানী হয়ে জ্বলে ওঠে। হিলিয়াম জুড়ে জুড়ে পরিণত হয় কার্বন পরমাণু। তখন বারবার তারকাটির বাইরের স্তর ভিতরের দিকে ধসে পড়তে থাকে। এভাবে ভারসাম্য বারবার বিপর্যস্ত হয়।

অবশেষে হিলিয়াম জ্বালানীও শেষ হয়ে আসে। তারকা ক্রমশ সঙ্কুচিত এবং উত্তপ্ত হতে থাকে। ন'খ'ত্র ঘিরে নিভে-যাওয়া তাপ-পারমাণবিক চুল্লির শেষ উচ্ছ্বাসে বহিরঙ্গ থেকে কিছু বস্তুসামগ্রী দূরে নি'খি'প্ত হয়। উদ্‌গীর্ণ গ্যাস থেকে ন'খ'ত্রের চারদিকে এক গ্রহ-নীহারিকার বলয় (Ring of Planetary Nebula) রচিত হয়। ভিতরে পড়ে থাকে ধসে-পড়া কেন্দ্রটি যা তখন অত্যন্ত জমাট বেঁধে এক শ্বেত বামনে (White

আর হারকিউলিস ক্লাস্টার (Herculis) ২৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। অনেকগুলি ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত দেখা যাচ্ছে সুপার-ক্লাস্টার। আমরা ভার্গো সুপার-ক্লাস্টারে আছি।

সাম্প্রতিক সন্ধানে আরো নতুন তথ্য উঠে এসেছে।

মহাবিশ্বে আরো অনেক তারামণ্ডল, তাদের ক্লাস্টার, তাদের সুপার-ক্লাস্টার আছে। বিশ্বের এত সব আয়োজনে আমরা 'খু'দ্র মানুষেরা কোথায়? আমাদের মহান সূর্যদেবতা কোথায়? আমাদের জগৎ-স্রষ্টা কোথায়? বিশ্ব যখন জন্ম নিল, তখন সূর্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, পৃথিবী ছিল না।

তারামণ্ডল সৃষ্টি সমগ্র সৃজনের দ্বিতীয় ধাপ ধরা গেলে ন'খ'ত্র সৃষ্টিকে সৃজনের তৃতীয় ধাপ ধরা হবে।

আমাদের সূর্য ঐ দুগ্ধসরণী তারামণ্ডলের মধ্যে বিরাজমান মাঝারি মাপের এক ন'খ'ত্র। মাঝারি মাপের? হ্যাঁ, তাই। রয়েছে তারামণ্ডলের কেন্দ্র থেকে ৪০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। কুণ্ডলিত লেজের একধারে। সে তারামণ্ডলের কেন্দ্র প্রদ'খি'ণ করছে ২৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বেগে। একবার প্রদ'খি'ণ করতে সময় লাগছে প্রায় ২৪ কোটি বছর। সূর্যের বয়স যদি ধরা হয় ৫০০ কোটি বছর, তবে এযাবৎ সূর্য ২০ বার এই প্রদ'খি'ণ সেরে ফেলেছি। মহাবিশ্বের মাপকাঠিতে, এমন কী তারামণ্ডলের মাপকাঠিতেও, সূর্যের মতো ন'খ'ত্রের স্থান অতি নগণ্য। তবু এই সাধারণ ন'খ'ত্র সূর্যদেব অনন্য হয়ে উঠেছে।

যেমন মহাবিশ্বে তারামণ্ডল গঠিত হয়েছে বস্তু-ঘনত্বে অসাম্যের জন্য, তেমনি তারামণ্ডলে ন'খ'ত্রের জন্মও সেই অসাম্যের ফলে। বস্তুরাশি মহাকর্ষের টানে এবং ঘূর্ণনের ফলে পুঞ্জীভূত হতে থাকে তারামণ্ডলে। কিন্তু অসম ঘনত্বের জন্য মহাকর্ষের টানাপোড়েনে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সেই খণ্ড মেঘপুঞ্জ ত্র(মে জমাট বাঁধতে চেষ্টা করে। বস্তুপিণ্ড যতই কাছে আসতে থাকে, ততই মহাকর্ষের টান বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে তার উত্তাপ। এভাবে তৈরি হয় ন'খ'ত্রের বীজ। আমরা একে প্রাক-ন'খ'ত্র (Proto-star) পর্ব বলতে পারি। অনেকটা জমাট বাঁধা হলে এবং উত্তপ্ত হয়ে পড়লে সেই প্রাক-ন'খ'ত্রের বস্তুকণা ভেঙে ন'খ'ত্রটি জ্বলে ওঠে। আসলে তাপ-পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়াটি চালু হয়ে যায়। হাইড্রোজেন জ্বালানী পুড়ে হিলিয়াম পরমাণু হয়। মুক্ত করে অমিত তেজরাশি। বিশ্বে প্রথমদিকে যে ন'খ'ত্র তৈরি হয়েছিল তাতে কার্বন পরমাণু ছিল না। ফলে তখন তাপ-পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পি-পি চক্র অনুসারে।

তাহলে কি ন'খ'ত্র অনন্ত নয়? আমাদের সূর্য কি শাশ্বত নয়? এরা কি চিরকাল একই রকমে জ্বলবে না আর আলো-উত্তাপ বিকিরণ করে যাবে না? না, যাবে না।

কেননা ন'খ'ত্র শাশ্বত নয়। এদেরও পরিবর্তন আছে। বিশ্বই যখন পরিবর্তনশীল,

Dwarf) পরিণত হয়।

তারার ভর যদি হয় সূর্য তবে মৃত শ্বেত-বামনের আয়তন হবে পৃথিবী। সেখানে ১ সিসি (ঘন সেন্টিমিটার) বস্তুর ওজন হবে ২০০ কিলোগ্রাম। পৃথিবীতে ১ সিসি জলের ওজন মাত্র ১ গ্রাম। শ্বেত-বামনে জ্বালানী নেই আর। শুধু সঙ্কোচনের জন্য উত্তাপ আছে এবং তা ক্রমশ শীতল হতে থাকছে।

সমস্ত তাপ নির্গত হল ন'খ'ত্রের অন্তিম অবশেষ পরিণত হবে এক দীপ্তিহীন কৃষ(পিণ্ড (Black Dwarf)। আমাদের সূর্যের পরিণতি নাকি এমনটাই হবে। হবে নাকি?

তবে তা হবে অন্তত আরো ৫০০ কোটি বছর পরে। পৃথিবীর মানুষের এজন্যে উতলা হওয়ার দরকার নেই। আগে তো দশ হাজার বছর বাঁচা যাক।

ন'খ'(ত্রের ভর যদি বেশি হয়, তখন ঘটনাক্রম অন্যরকম হবে। কম ভরের রোগাপাতলা ন'খ'ত্রেরা দীর্ঘজীবী হয় কিন্তু বিপুল ভরের মোটাসোটা ন'খ'ত্রেরা হয় 'খীণজীবী। এরকম হয় কেন? কারন বিশাল ভরের বপুর জন্য সেসব ন'খ'ত্রের কেন্দ্রের উত্তাপ বেশি হয়। তাতে হাইড্রোজেন পরমাণু আরো দ্রুত হারে জ্বলতে থাকে। জ্বলতে জ্বলতে ধাপে ধাপে লোহা-কোবাল্ট ইত্যাদি ভারী পরমাণুতে পরিণত হতে থাকে। অবশেষে বহির্মুখী তাপ এবং অভিকর্ষের অন্তর্মুখী চাপে তারাটি একসময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। আমরা এই বিস্ফোরণকে বলছি দ্বিতীয় শ্রেণির সুপারনোভা বিস্ফোরণ (Type-II Supernova)। আকস্মিক এই বিস্ফোরণে ইউরেনিয়াম-২৩৮ পর্যন্ত ভারী পরমাণু গঠিত হয়। তারকার কেন্দ্রটি অত্যন্ত ভারী পিণ্ডে পরিণত হয়। কতটা ভারী? ১ সিসি বস্তুর ওজন দাঁড়াবে তখন ২ লাখ টন। ওই পিণ্ডের প্রচণ্ড চাপে প্রোটন আর ইলেকট্রন কণা যুক্ত হয়ে নিউট্রন কণায় পরিণত হতে থাকবে।

তখন আমরা এজাতীয় ন'খ'ত্রের অন্তিম দশা পেয়ে যাব আদ্যন্ত নিউট্রন কণা দিয়ে তৈরি বস্তুপিণ্ডে যার নাম নিউট্রন তারা (Neutron Star)।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপে'খ'কতাবাদ তত্ত্ব অনুসারে কোন বস্তুপিণ্ডের অভিকর্ষ যদি প্রবল হয়, তবে তা সঙ্কুচিত হতে হতে বিন্দুর মতো অবস্থায় উপনীত হতে পারে। সেসময় তার ঘনত্ব হবে অসীম, কিন্তু আয়তন হবে শূন্য। নিউট্রন তারার প্রবল ঘনত্ব থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হচ্ছে যে নিউট্রন তারাও বুঝি কালে কালে ওই রকম দশায় উপনীত হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা তেমন অপার্থিব অবস্থার নাম দিলেন কৃষ(গহ্বর (Black Hole)।

কৃষ(গহ্বর এমন এক বস্তুপিণ্ড যার মধ্য থেকে সীমাহীন মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে কোনকিছুই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনা। সবই কৃষ(গহ্বরের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তার আওতায় সত বস্তুই এসে পড়ুক না কেন, সবই সে আত্মসাৎ করে নেবে। এভাবে কৃষ(গহ্বর চারপাশের বস্তুরাশি ভ'খ'ণ করে নিশ্চয়ই স্ফীত হতে থাকবে। তারপর কী হবে? স্ফীত

হতে হতে একসময় কি মহাবিস্ফোরণে বিদীর্ণ হবে? জানা নেই।

সং'খ'পে এরকমটাই হল ন'খ'ত্রের বিবর্তনের ধাপ। প্রোটো-স্টার থেকে ন'খ'ত্রের মূল পর্ব, তারপর লালদানব-শ্বেতবামন কিংবা সুপারনোভা-নিউট্রন তারা হয়ে কৃষ(গহ্বর। ন'খ'ত্রের শুরুর ধরণ বুঝে তার শেষ পরিণতি নির্ধারিত হবে। বস্তুরাশি একবার ন'খ'ত্রে পুঞ্জীভূত হবে আবার তার কিয়দংশ অন্তত ছড়িয়ে পড়বে মহাজগতে। এক ন'খ'ত্রের লয় হবে এবং তার ভস্ম থেকে অন্য ন'খ'ত্রের জন্ম হবে। বিজ্ঞানীরা এই যে ন'খ'ত্রের বিবর্তনের পরিচয় পেয়েছেন, তা আংশিক। সৃষ্টির সব রহস্য জানা হয়নি। একটু একটু করে জানা হচ্ছে।

...

আরেকবার চলুন যাই বিশ্বতত্ত্বে। বিশ্ব সৃষ্টির পর উৎপন্ন হাইড্রোজেন-হিলিয়াম গ্যাস খণ্ডিত হয়ে তারামণ্ডল গঠন করেছিল। তার মধ্যে জন্ম হল আদি ন'খ'ত্র বা প্রথম প্রজন্মের ন'খ'ত্র (Primordial Star) যারা পি-পি চক্র অনুসারে তাপ-পারমাণবিক বিক্রি(য়ায় সচল ছিল। আদি ন'খ'ত্র থেকে জন্মাল বিবর্তনের ধাপে ধাপে জন্মাল অন্যান্য পরমাণু। কার্বন থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। উৎপন্ন মৌলভাণ্ডার ছড়িয়ে পড়েছে মহাকাশে তারামণ্ডলে। সমৃদ্ধ বস্তুপুঞ্জ থেকে আবার ঘনীভূত বস্তুরাশি জন্ম দিল দ্বিতীয় প্রজন্মের ন'খ'ত্র (Next Generation Star)। বিশ্বের বয়সকালে দ্বিতীয় প্রজন্ম শুধু নয়, তৃতীয় প্রজন্মের ন'খ'ত্রের থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

সূর্যের জীবনকাল ১০০০ কোটি বৎসর ধরা হলে বিশ্বের ১৫০০ কোটি বছর বয়সে দুটি প্রজন্মের অস্তিত্ব তো অনুমান করা যাচ্ছেই। ভারী ন'খ'ত্রের ে'খ'ত্রে তৃতীয় প্রজন্মের ন'খ'ত্রও হতে পারে। আমাদের সূর্য তাই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্মের ন'খ'ত্র।

বিশ্বসৃষ্টির পরে আগে তারামণ্ডল তারপর ন'খ'ত্র, নাকি আগে ন'খ'ত্র তারপর তারামণ্ডল – এ নিয়ে অন্য মতামতও আছে।

দূর ন'খ'ত্রের কথা থাক। আমরা সূর্য-পৃথিবীর কথা আরেকটু বিস্তারে শুনি।

সূর্যের ব্যাস ১৩ কোটি কিলোমিটার, ভর ২০ লাখ কোটি কোটি কোটি টন। ভিতরের কোরের তাপমাত্রা ১.৫ কোটি কেলভিন আর বাইরের ক্রোমোস্ফিয়ারের ৫,০০০ কেলভিন। ৯টি গ্রহ আছে – বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির পরে ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। শেষ তিন গ্রহের ভারতীয় নাম নেই। দশম গ্রহ আছে কিনা সুনিশ্চিত নয়। গ্রহকুল বিস্তৃত ৫৯০ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অবধি।

প্রথম চার গ্রহ অন্তর্দেশের গ্রহ যারা পাথুরে বস্তু দ্বারা গঠিত। ঘনত্ব ৩ গ্রাম প্রতি সিসি থেকে বেশি। আকারে ছোট। অল্পসংখক উপগ্রহ। বলয় নেই। ঠিক পরের চারটি গ্রহ বহির্দেশের গ্রহ যার ঘনত্ব ২ গ্রাম সিসি থেকে কম। আকারে বেশ বড়। সকলের বলয় আছে এবং অনেক উপগ্রহ। নবম গ্রহ হিসেবে প্লুটোকে মর্যাদা দেওয়া বরঞ্চ বেশ

মুস্কিলের।

সমস্ত গ্রহাদি মিলে মোট আয়তন থেকে সূর্যের আয়তন ৭৪৫ গুণ বেশি। কিন্তু সূর্যের ভর সূর্য-গ্রহকুলের মোট ভরের শতকরা ৯৯.৯ ভাগ। আয়তনের তুলনায় সূর্যের ভর মহাকায় বললেও কম বলা হচ্ছে। অন্যদিকে আবার গ্রহগুলি কৌনিক ভরবেগ দখল করে আছে মোট ভরবেগের শতকার ৯৯ ভাগ। সূর্যের ঘূর্ণন গ্রহের তুলনায় অত্যন্ত কম।

উত্তর মেরু থেকে দেখলে, শুক্র বাদে অন্য গ্রহদের ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরতে দেখা যায়। ইউরেনাস-প্লুটো এক অর্থে শুক্রের পথে পথিক। অধিকাংশ গ্রহের অ'খ্খ'রেখা বরাবর ঘূর্ণন একই দিকে। বুধ এবং প্লুটো সবথেকে বেশি কাত হয়ে আছে। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ওখানে গ্রহ নেই, আছে গ্রহ-না-হতে-পারা গ্রহাণুপুঞ্জ।

গ্রহ জগতের বাইরে বিরাজ ধূমকেতুর রাজ্য — উর্ত মেঘ। সূর্যের সঙ্গে তখনো তাদের নাড়ির টান আছে। মাঝে মাঝে সেই টানে ছুটে আসে ধূমকেতুরা। কখনো এসে আছড়ে পড়ে গ্রহের কোলে। কখনো বা তার খণ্ড ছিটকে পড়ে। পৃথিবীতে 'খু'দ্রাকার খণ্ড ছুটে আসে উল্কা হয়ে।

তারামণ্ডলে ন'খ'ত্র সৃষ্টির যে চিত্র আমরা দেখতে পেলাম, অমনিভাবেই সূর্যও নির্মিত হয়েছিল একদা। গ্রহসকল তৈরি হল কী করে? তা নিয়ে বহুকাল ধরে নানা মতবাদ প্রচলিত ছিল এবং আছে।

১৭৬৬ সালে ফরাসী প্রকৃতিবিদ *জর্জ লুইস দ্য বুফোঁ* (১৭০৭-১৭৮৮ খৃঃ) বলেছিলেন — সূর্যের সঙ্গে আরেক ধূমকেতুর মতো স্বর্গরাজ্যের বস্তুর সংঘর্ষে সৌরজগতের গ্রহের সৃষ্টি।

জার্মান দার্শনিক *ইমানুয়েল কান্ট* (১৭২৪-১৮০৪ খৃঃ) ধারণা করেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই প্রথমে সূক্ষ্ম ধূলিকণার মতো পদার্থ থেকে তৈরি। ১৭৯৬ সালে আরেক ফরাসী বিজ্ঞানী *পিয়েরে সাইমন দ্য ল্যাপলেস* (১৭৪৯- ১৮২৭ খৃঃ) কান্টের ধারণার উপর নির্ভর করে বললেন — অতীতে ঘুরন্ত সূর্যের চারপাশে উত্তপ্ত পাতলা গ্যাসের পরিমণ্ডল ছিল, যার নাম নীহারিকা বা নেবুলা। সৌরজগত জন্মেছে ওই মেঘ-গ্যাসের পুঞ্জ থেকে মহাকর্ষের টানে জমাট বেঁধে। জমাট বাঁধতে বাঁধতে ঘূর্ণন শুরু এবং ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা করে বস্তুপিণ্ড বর্জন। ঐ বর্জিত বস্তুপিণ্ড থেকে হল গ্রহ। এভাবে কয়েক দফায় বস্তু-বর্জন করা হয়েছিল। একই প্রক্রি য়ায় গ্রহসমূহ সঙ্কুচিত হতে গিয়ে কিছু বস্তু বর্জন করতে করতে গড়ে ফেলল উপগ্রহ।

১৯০৫ সালে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী *টমাস ক্র ওদার চেম্বারলিন* (১৮৪৩-১৯২৮ খৃঃ)

এবং *ফরেস্ট রে মউলটন* (১৮৭২-১৯৫২ খৃঃ) বললেন — কোন কালে সূর্যের সঙ্গে আরেক ন'খ'ত্রের সংঘর্ষের উপক্র ম হয়েছিল। তার ফলে ন'খ'ত্র থেকে উপজাত কিছুটা দেহাংশ চ্যুত হয়ে দূরে নি'খি'প্ত হয়। পরে ঐ গ্যাসীয় বস্তুসকল গ্রহাণু তৈরি করে। গ্রহাণুসকল আবার সংযুক্ত হয়ে গ্রহে পরিণত হয়।

তেরো বছর পরে বৃটিশ বিজ্ঞানী *জেমস জিনস* (১৮৭৭-১৯৪৬ খৃঃ) এবং *হ্যারল্ড জেফ্রি* (১৮৯১-১৯৮৯ খৃঃ) চেম্বারলিন-মউলটন তত্ত্ব সংশোধন করে বললেন — সূর্যের দেহ থেকে খানিকটা অংশ উৎখি'প্ত হয়েছিল এবং পটলের মতো চেহারা নিয়ে সূর্য প্রদখি'ণ করছিল। পরে ঐ পটলাকৃতি বস্তুটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং নানা গ্রহের সৃষ্টি করে।

১৯৪২ সালে *অ্যালফেন* প্রস্তাব করেন তড়িৎ-চুম্বকীয় মতবাদের। দু বছর পরে জার্মান বিজ্ঞানী *কার্ল ফ্রেডারিখ ওয়াইজস্যাকার* প্রস্তাব করেন ধূলিমেঘের নীহারিকা তত্ত্ব। মহাবিশ্বের ধূলিমেঘের রাজ্যে লেগেছিল অনেক ঘূর্ণি বা আবর্ত। এক একটা ঘূর্ণি থেকে হল এক একটি তারামণ্ডল। ওই প্রাথমিক বিশাল ঘূর্ণির মধ্যে তৈরি হয়েছিল আরো ছোট ছোট ঘূর্ণি। তা থেকে জন্মাল ন'খ'ত্র। তো এরকম এক মাধ্যমিক ঘূর্ণি থেকে সূর্য হল। মাধ্যমিক ঘূর্ণির উপান্তে জন্মাল তৃতীয় স্তরের ঘূর্ণি যা থেকে জন্মায় গ্রহাণুর দল। গ্রহাণু সংযুক্ত হয়ে গ্রহ হল।

সম্ভবত এক বছর আগে *অটো স্মিট* প্রকাশ করেছিলেন ভ্রূণ-উল্কাপিণ্ড মতবাদ।

ধূমকেতুর দেহ থেকে খসে-পড়া কঠিন পদার্থ পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ড হয়ে নেমে আসে। আন্তর্ন'খ'ত্র জগতে দেখা যায় যে গ্যাস ও ধূলির মেঘ তা হাইড্রোজেন-হিলিয়াম দিয়ে তৈরি। আরো থাকে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলকণা, নানা ধাতব অক্সাইড, সিলিকেট বালিকণা ইত্যাদি। আদিম সূর্য এমন কোন মেঘপুঞ্জকে আত্মস্থ করেছিল। ঐ সূক্ষ্ম বস্তুপিণ্ড কালে কালে সঙ্কুচিত হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে চাকতির আকার নেয়। সূর্যের নির'খীয় তল বরাবর তারা ঘন হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমে দানা বেঁধে গ্রহাণুতে পরিণত হয়। গ্রহাণু থেকে জন্ম নেয় গ্রহ-উপগ্রহ।

সৌরজগতের উদ্ভব হয়েছে ৫০০ কোটি থেকে ৪৭০ কোটি বছর আগে। আন্তর্ন'খ'ত্র মহাকাশের আণবিক গ্যাস ও মেঘ দুগ্ধসরণী-তারামণ্ডলের কুণ্ডলিত লেজের একপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ওই মেঘরাশির ঘনত্বের অনিয়ন্ত্রিত ওঠাপড়ার জন্য অথবা কোন সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধাক্কায় শুরু হয় তার কেন্দ্রীয় সঙ্কোচন।

বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বাষ্পীভবন-ঘনীভবন এবং গলন কয়েক পর্যায়ে চলতে থাকে। তার ফলে বস্তুকণা দানার মতো হয়। সৌরজগতের এই মেঘরাশিটি আমাদের তারামণ্ডল

কেন্দ্র করে ঘুরছিল। মেঘের নিকট-প্রান্তে এবং দূর-প্রান্তে ঘূর্ণনের বেগের তারতম্য হওয়ার জন্য সৌরমেঘও নিজের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যত সে ঘনীভূত হচ্ছিল, ততই তার ঘূর্ণন-বেগ বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রমে তা লেন্সের মতো চাকতির আকার নেয়। ঘনীভূত হতে হতে শতকরা ৩০ ভাগ আয়তনের সূর্য হয়ে উঠলে ভিতরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যায়। জন্ম হয় জবাকুসুমসঙ্কাশং সূর্যের। বাকি অংশ তখনও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

এরপর অটো স্মিট যেমন ভ্রূণ-উল্কাপিণ্ড থেকে গ্রহাণু এবং তারপর গ্রহ-উপগ্রহ হওয়ার কথা বলেছেন, তেমনি ঘটেছে।

...

সমগ্র জগৎ সৃষ্টির তৃতীয় ধাপে জন্ম নিল এভাবে ন'খ'ত্র-কেন্দ্রীক গ্রহজগৎ। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের ন'খ'ত্রের জন্মকাহিনী। সর্বত্র গ্রহ-গ্রহাণু তৈরি হয়েছিল হয়তো এমন নয়। কোথাও হয়েছে, কোথাও হয়তো হয়নি।

পৃথিবীর মতো অন্য ন'খ'ত্রের চারদিকে আবর্তিত গ্রহের খোঁজ চলছে এবং পাওয়াও যাচ্ছে।

পৃথিবীর জন্ম কোন বিশেষ ঘটনার ফলাফলও নয়। গোটা সৌরজগতের সৃষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর জন্মরহস্য।

মহাকাশে মহাবিশ্বে এত সব সৃষ্টির জন্য দেখা মেলে না কোন স্রষ্টার। না সৌরজগতে না তারামণ্ডলে কিংবা সুপার-ক্লাস্টারে। অথচ সৃষ্টি হয়েছে। আছে চোখের সামনে। তবে কি সৃষ্টি স্বয়ম্ভু? স্রষ্টাকে মেনে নিলেও তার সৃজন কেমন করে হল, সে প্রশ্নটা থেকে যায়। তখন স্রষ্টাকে স্বয়ম্ভু না বলে উপায় থাকে না।

আর সৃষ্টিকেই সয়ম্ভু বললে?

সৃষ্টিকে স্বয়ম্ভু বললে আর তো কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই।

৪.৬। প্রাণের সৃষ্টি

পৃথিবী এক আশ্চর্য গ্রহ কারণ তার মধ্যে পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে এবং তা হল প্রাণের সৃজন। প্রাণের সম্ভাবনাময় গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর সৃষ্টি তাই সমগ্র সৃজনের চতুর্থ ধাপ।

সূর্যের এই তৃতীয় জাতকের ব্যাস ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। ওজন মাত্র ৬ কোটি টন। পরমপিতা সূর্য রয়েছেন মাত্র ১৪,৯৬,০০,০০০ কিলোমিটার দূরে।

হ্যাঁ এই নিরাপদ দূরত্বটা খুব কাজে লেগেছে। পরমপিতার ত্রে(াধাগ্নি থেকে দূরে আবার এতটা দূরে নয় যে তার উষ(তার আমেজ বা স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকা হবে। অন্য সব গ্রহ থেকে পৃথিবীর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি – প্রতি সিসি ৫.৫২ গ্রাম।

পৃথিবীর বয়স সূর্যের থেকে কিছুটা কম। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন বয়স ৪৬০ কোটি বছর। অনুমান মানে পুরোপুরি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া নয়। বয়স নির্ণয়ের কিছু উপায় আছে। যেমন, পুরোনো শিলা থেকে কিংবা খনিজদ্রব্য (মিনারেল) থেকে।

প্রাচীনতম যে মিনারেল পাওয়া গিয়েছে, তার নাম জার্কন। বয়স মাপা হয়েছে ৪৩০ কোটি বছর। কানাডার লেক স্লাভ এলাকা থেকে য়ে প্রাতীনতম শিলাপাথর পাওয়া গিয়েছে তার বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৩৯৬ কোটি বছর।

শুরুতে পৃথিবীরে প্রাণ ছিল না। যা ছিল সবই জড় পদার্থ।

কয়েকটি বিশেষ অবস্থার জন্য পৃথিবীর বুকে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল জড় থেকে জীবে উত্তরণ। ঐ কারণগুলির মধ্যে কিছু হল মহাকাশে গ্রহের অবস্থানঘটিত। যেমন, মাঝারি মাপের এই গ্রহের ভরের বিশেষত্ব আছে। মাপটা মাঝারি হওয়ার কারণে এখানে পারমাণবিক বিত্রি(য়া শুরু হতে পারেনি যা হয়েছে বৃহস্পতি-শনি গ্রহে। ফলে পৃথিবী খুব উত্তপ্ত হতেও পারেনি। আবার ভর খুব কম না হওয়ায় তাপমাত্রাও খুব কম হতে পারেনি। বেশি উত্তাপ বা বেশি শীতলতা কোনটাই প্রাণ-সৃষ্টির অনুকূল নয়। কম ভরের গ্রহ হলে আবার বায়ুমণ্ডল ধরে রাখাও সম্ভব হত না। বায়ুমণ্ডল ব্যতিরেকে প্রাণের গঠন-বিকাশ এমনধারা হতে পারত না।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এমন যে তা খুব বেশি নয়, আবার খুব কমও নয়। কীভাবে? খুব কাছে থাকলে সূর্যের তাপ অনেক বেশি করে এসে পড়ত আর খুব দূরে থাকলে কম তাপ। দরকার মাঝামাঝি অবস্থা।

সূর্যের চারদিকে প্রদর্(ণ পথও মোটামুটি বৃত্তাকারের ধারেকাছে বলে বছর জুড়ে

শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্যও খুব বেশি হতে পারেনি।

প্রাণীদেহ গঠনে যে সকল উপাদান প্রধান জরুরী ছিল, যেমন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস এবং সালফার, এই ৬টি মৌল এবং সেই সঙ্গে আরো ১৫টি মৌল, পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং আছে। তার ফলেই এখানে জীবদেহ গঠিত হতে পেরেছে।

হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল নামক যে আশ্চর্য যৌগটি তরল অবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রাণীদেহের মুখ্য উপদান জল – মানুষের দেহে যার পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। জলের বিশিষ্ট কিছু ধর্ম আছে যা প্রাণ-সৃজনে এবং লালন-পালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলের মতো প্রয়োজনীয় আরেক উপদান বায়ু। পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা বায়ুমণ্ডল একদিকে উপাদানের যোগান দিচ্ছে, অন্যদিকে মহাকাশ থেকে আসা (তিকর রশ্মি প্রতিহত করে পৃথিবীর প্রাণসমূহ র(া করছে, উল্কাপিণ্ডের আঘাত আটকাচ্ছে, তাপের বিন্যাসে সত্রি(য় ভূমিকা নিচ্ছে।

অতীত পৃথিবীর সময়কাল চিহ্নি(ত করার জন্য আমরা পার্থিব বয়সটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এর নাম রাখা হয়েছে *ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী* (Geological Time Table)। প্রথমে জন্মকাল (৪৬০ কোটি বছর পূর্বে) থেকে বর্তমান অবধি সমগ্র কালকে বিভক্ত(করা হল তিনটি মহাযুগে। তারপর মহাযুগ কয়েক যুগে এবং যুগ কয়েক পর্বে। এর সঙ্গে পুরাণাশ্রিত সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগের কোন সম্পর্ক নেই। ঋষিদের যুগ নির্ণয়ে মাপকাঠি ছিল বুঝি মানুষের সুনীতি-দুর্নীতি বোধ এবং কোন জাতিবর্ণের রমরমা চলমান তার ভাবনা।

ভূতাত্ত্বিক সময়-সারণী (মহাযুগ অনুসারে)

১.	অ্যাজোইক	ঃ ৪৬০ কোটি বছর থেকে ৩৯৬ কোটি বছর।
২.	ত্রি(পটোজোয়িক	ঃ ৩৯৬ কোটি বছর থেকে ৫৭ কোটি বছর।
৩.	ফ্যানেরোজোয়িক	ঃ ৫৭ কোটি বছর থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

অ্যাজোয়িক মহাযুগ (Azoic Eon) ঃ

'অ্যাজোয়িক' মানে অজৈব। পৃথিবী সৃষ্টির পর দীর্ঘকাল প্রাণের স্পন্দন ছিল না এই মহাযুগে যদিও জৈব সৃজনত্রি(য়া ছিল অব্যাহত। ৬৪ কোটি বৎসর ব্যাপ্ত এই সময় পৃথিবী শীতল হয়েছে। ভূত্বক গঠিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে মহাদেশের ভিত হিসেবে শিল্ড (Shield), মহাসাগরের গহ্বর, অন্তর থেকে উগলে উঠেছে ঘন ঘন ধূমায়িত ত্রে(াধ, সাগর-মহাসাগর ভরে উঠছে জলে, বায়ুমণ্ডল তৈরি হচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে, শীতল

হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক অস্থিরতা দামাল হচ্ছে। জৈব-অজৈব রসায়নের পরী(া-নিরী(া চলছে প্রকৃতির রসায়নাগারে। জড় থেকে অন্যবিধ জড় পদার্থ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই চলেছে জৈব রসায়নের হাত ধরে প্রাণ সৃষ্টির প্রত্রি(য়া। আজও সেই সব প্রাকৃতিক ওলট-পালটের অনেক কিছুই চলমান, তবে অন্যভাবে অন্যগতিতে।

ত্রি(পটোজোয়িক মহাযুগ (Cryptozoic Eon) ঃ

জড় থেকে জীব সৃষ্টির দিকে পা ফেলা শুরু হল এই মহাযুগে। অপ্রাণ থেকে প্রাণ। সমগ্র মহাযুগ ৩৯৬ কোটি থেকে ৫৭ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৩৯ কোটি বৎসরে ব্যাপ্ত। যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য না মেলায় মহাযুগটিকে এখনো আরো খাটো সময়সীমায় বাঁধা যায়নি। প্রাকৃতিক প্রত্রি(য়ার সঙ্গে এ মহাযুগে যুক্ত(হয়েছে আদিম জৈব গঠন প্রত্রি(য়া।

তার মধ্যে ৩৯৬ কোটি থেকে ২৫০ কোটি বছর পূর্বেকার এই কালসীমাকে আরো বিভক্ত(করে নাম দেওয়া হল *আর্কিয়ান* (Archaean Era) যুগ। আদিম জীবনের কাল। ১৪৬ কোটি বৎসর ব্যাপী যুগে তখন প্রাণের আবির্ভাব হয়ে গিয়েছে জীবাণু রূপে। প্রমাণ হিসেবে বেশ কিছু মাইত্রে(াফসিলের খোঁজ মিলেছে। ২৫০ কোটি থেকে ৫৭ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত মহাযুগের অংশকে বলা হল *প্রোটেরোজোয়িক* (Proterozoic Era) যুগ। এর ব্যাপ্তিও ১৯৩ কোটি বৎসর। এসময় নির্মিত হয়েছে প্রোটোজোয়া এবং ওই রকম আদিম সরল প্রাণের জীবন। সা(্য হিসেবে এ যুগের শেষ ১০০ কোটি বছরের নানা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে।

ফ্যানেরোজোয়িক মহাযুগ (Phanerozoic Eon) ঃ

মাত্র ৫৭ কোটি বৎসর স্থায়ী এই মহাযুগ বিবিধ প্রাণের উচ্ছ্বাসে আকুল। তথ্যপ্রমাণ সা(্য এযুগেই যতটুকু লভ্য হয়েছে। তাই সমগ্র মহাযুগকে তিনটি যুগে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগকে আবার নানা পর্বে।

১. প্যালিওজোয়িক যুগ (Paleozoic Era) ঃ

প্রাচীনতম প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এই যুগে। ৫৭ কোটি থেকে ২৪.৫ কোটি বৎসর পূর্বে। নানা ঘটনার সা(্য অনুসারে ৩৩.৫ কোটি বৎসরের সমগ্র যুগটিকে আরো ৬টি পর্ব (Period)-এ, বিভক্ত(করা হয়েছে – ক্যামব্রিয়ান (Cambrian), অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician), সিলুরিয়ান (Silurian), ডেভোনিয়ান (Devonian), কার্বনিফেরাস (Carboniferous) এবং পার্মিয়ান (Permian)।

২. মেসোজোয়িক যুগ (Mesozoic Era) ঃ

মধ্যবর্তী স্তরের জীবনকালের আবির্ভাব ১৭.৮৬ কোটি বৎসরের এই যুগে। ৩টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে – ট্রায়াসিক (Triassic), জুরাসিক (Jurassic) এবং ত্রি(টেসিয়াস

(Cretaceous)।

৩. কেনোজোয়িক যুগ (Cenozoic Era) ঃ

সাম্প্রতিক জীবনের যুগ। তাও ৬ কোটি ৬৩ ল(বছর আগে থেকে বর্তমান অবধি। যুগটিকে ২টি পর্বে ভাগ করা হয় – টারশিয়ারি (Tertiary) এবং কোয়াটারনারি (Quaternary)। যুগটিকে তিন পর্বেও ভাগ করা হয় – প্যালিওজিন (Paleogene), নিওজিন (Neogene) এবং কোয়াটারনারি। কখনো কোয়াটারনারি পর্বকে একটি যুগ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৬ কোটি ৪৮ ল(বৎসরের টারশিয়ারি পর্ব ৫টি উপপর্বে (Epoch) বিভক্ত(– প্যালিওসিন (Paleocene), ইয়োসিন (Eocene), অলিগোসিন (Oligocene), এবং প্লায়োসিন (Pliocene)। অন্যভাবে প্যালিওজিন তিনটি এবং নিওজিন দুটি উপপর্বে বিভক্ত(।

১৬ ল(বৎসরের কোয়াটারনারি পর্ব ২টি উপপর্ব – প্লাইস্টোসিন (Pleistocene) এবং হোলোসিন (Holocene)।

আমরা জানলাম – প্রাণের আবির্ভাব ত্রি(পটোজোয়িক মহাযুগে। তা নাহয় হল। কিন্তু প্রাণ সৃষ্টি হল কীভাবে? প্রাণ কি অপ্রাণ থেকে জাত? জড় থেকে জীব? নাকি প্রাণের স্রষ্টা হলেন সেই অজ্ঞাত ঈ(র?

বি(জগতে প্রাণের আবির্ভাব সৃষ্টির পঞ্চম ধাপ।

বাইবেলে সৃষ্টি প্রত্রি(য়ায় যেভাবে বলা হয়েছে, আজ আর তা সচেতন মানুষ আ(রিক অর্থে গ্রহণ করেন না। একমাত্র ধর্মান্ধ শি(াবির্জত মানুষ ব্যতিরেকে। গ্যালিলিওর বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বসে বিংশ শতকের শেষে ভাটিকান থেকে মহামান্য পোপ তা ব্যক্ত(করছেন। এদেশে বেদে-উপনিষদে-পুরাণে-মহাকাব্যে সৃষ্টির তেমন সুস্পষ্ট প্রস্তাব নেই। ব্যাখ্যা হয়েছে ভাবময়তা দিয়ে মহৎ তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে। তার সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিলিয়ে দেখার উপায় নেই। আমরা বরং বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাটা কী শুনি।

কয়েকটি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানগম্যি দরকার। প্রাণ কী? প্রাণীকোষের রহস্য কী? প্রাণ কি অনৈসর্গিক কিছু যা জীবের জড়দেহে প্রবেশ করলে জীবদেহ প্রাণবন্ত হয়? প্রাণ কি ঐশী শক্তি(র অংশ?

সহজতম ভাষায় প্রাণের প্রধান ল(ণ দুটি – বিপাক ত্রি(য়া (Metabolism) এবং বংশবৃদ্ধি (Reproduction)। এ দুটি বর্তমান থাকলে জীবদেহে প্রাণ আছে বলা যাবে। নয়তো নয়।

জীবকোষ (Life Cell) প্রাণের প্রাথমিক পর্যায়। (দ্রতম প্রকাশ। সকল জীবদেহ

গঠিত জীবকোষ দ্বারা। উদ্ভিদ গঠিত উদ্ভিদকোষ দ্বারা এবং প্রাণী গঠিত প্রাণীকোষ দ্বারা। উভয়েই মূলত জীবকোষ। একটি মাত্র জীবকোষ দ্বারা জীবদেহ গঠিত হতে পারে – তখন জীব হয় এককোষী (Unicellular)। ইস্ট, অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী প্রাণী। অনেক জীবকোষ দ্বারা জীবদেহ গঠিত হতে পারে, তখন জীব হয় বহুকোষী (Multicellular)। চারপাশের গাছপালা, চলমান প্রাণীজগৎ এবং মানুষ এরা সকলেই বহুকোষী।

কোষের নানা বৈচিত্র্য আছে। আমরা একটি সাধারণ আদর্শ কোষের বৃত্তান্ত শুনব। সেখানে প্রাণের প্রকাশ কীভাবে তা দেখব। প্রাণের প্রধান দুটি ল(ণ, বিপাক ত্রি(য়া ও বংশবৃদ্ধি, তা কেমন করে সম্পন্ন হয়, তা সামান্য জানব। তবে অতি সং(েপে।

জীবকোষের গঠনে বাইরের দিকে থাকে কোষপর্দা আর তার ভিতরে থাকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। কোষপর্দা জীবকোষকে একক হিসেবে মর্যাদা দেয় এবং তাকে র(া করে। প্রোটোপ্লাজমের দুটি অংশ – সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) এবং নিউক্লিয়াস (Nucleus)।

সাইটোপ্লাজমে থাকে মাইটোকনড্রিয়া, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, রাইবোজোম, গলগি বডি, লাইসোজোম, সেন্ট্রোজোম, প্লাসটিড ইত্যাদি নানা রকমের কোষাণু বা অর্গানেল। আরো আছে কিছু সাইটোপ্লাজমিক ইনক্লুসন্স এবং ম্যাট্রিকস।

নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পর্দা বা আবরণ আছে। তার ভিতরের অংশকে একত্রে বলে নিউক্লিওপ্লাজম। ওতে ভাসে ত্রে(োমাটিনের সূক্ষ্ম জালিকা। কোষ যখন বংশবৃদ্ধি করতে উদ্যত হয়, তখন ত্রে(োমাটিন নির্দিষ্ট সংখ্যক ত্রে(োমোসোমে পৃথক হয়। ত্রে(োমোসোমে নিহিত কোষের সমস্ত কাজকর্মের ব্লুপ্রিন্ট। থাকে বংশগতির ধারক জিন। ত্রে(োমোজোম গঠিত 'ডি-এন-এ' নামক অণু দিয়ে - পুরো কথাটা হল 'ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড' (Deoxyribonucleic acid)। 'ডি-এন-এ'র মতো আরেক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড আছে – আর-এন-এ বা রাউবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (Rybonucleic acid)। সহজ করে বলতে গেলে আর-এন-এ কোষের মধ্যে প্রোটিন তৈরি করে আর তা করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ আসে ডি-এন-এ থেকে। কোষে এছাড়া থাকে নিউক্লিওলাস।

অন্যভাবে জীবকোষ গঠনে দরকার কিছু জৈব অণু – প্রোটন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এবং কিছু অজৈব অণু।

প্রোটিন (Protein) বেশ জটিল ও বড় ধরনের অণু। জীবদেহের অন্যতম প্রধান উপাদান। চামড়া থেকে চুল, হাড়, মাংসপেশি, এনজাইম হরমোন সবই প্রোটিন। গঠনের মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড যা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। অ্যামিনো এবং কার্বক্সিল গ্রুপ থাকা আবশ্যিক। জৈব প্রকৃতিতে ২০ প্রকার

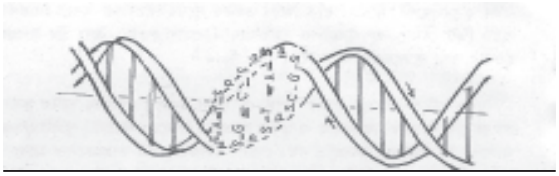

চিত্র-২১। ডি-এন-এ অণুর গঠন - দুপাশে দুটি নিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল যুক্ত আছে ধাপে ধাপে। P = ফসফোরিক অ্যাসিড, S= সুগার, A, T, G, C = নাইট্রোজেন যৌগ।

অ্যামিনো অ্যাসিড হতে পারে। যেমন, অ্যালানাইন, প্রোলাইন, গ্লাইসিল, হিস্টিডাইন ইত্যাদি। নানা জাতের অ্যামিনো আসিড পরপর জুড়ে জুড়ে প্রোটিন অণু হয়।

কতগুলো অ্যামিনো আসিড জুড়ে প্রোটিন হয়? কিংবা কতগুলো পরমাণু জুড়ে?

১টি ইনসুলিন প্রোটিন তৈরি হয় ৭৭৭টি পরমাণু দিয়ে। মাংসপেশীর প্রোটিন মায়োগ্লোবিন তৈরি হয় প্রায় ২৫০০ পরমাণু দিয়ে। রক্তের মধ্যে থাকে যে হেমোগ্লোবিন অণু তা মায়োগ্লোবিন থেকে চার গুণ বড়।

জৈব অণু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) আসলে কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। সাধারণত এর অণুতে যতগুলো কার্বন পরমাণু থাকে, সমপরিমাণ অক্সিজেন কিন্তু দ্বিগুণ হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। তৈরি করে মোনোস্যাকারাইড, ডাই-স্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে শর্করাখাদ্য উৎপাদন করে, তার নাম গ্লুকোজ। ফুলের মধুতে পাওয়া যায় আরেক শর্করা ফ্রাকটোজ। দুটোই সরল মোনোস্যাকারাইড। ল্যাকটোজ একটি ডাই-স্যাকারাইড। স্টার্চ, চিটিন, সেলুলোজ ইত্যাদি পলিস্যাকারাইড। কার্বোহাইড্রেডেরে কাজ জীবরে শক্তি সঞ্চয় করে রাখা যাতে প্রয়োজনমতো যোগান দেওয়া যায়।

আরেক রকমের যৌগ জীবজগতের কাজে আসে, তা হল চর্বি জাতীয় বস্তু বা লিপিড (Lipid)। এই অণুও শক্তি সংরণ করে। কোষের পর্দা গঠন করে। অ্যালকোহল, বিশেষ করে গ্লাইসেরল, এবং ফ্যাটি অ্যাসিড মিলে লিপিড গঠন করে। চর্বি, মোম, ট্রাই-গ্লিসারাইড এগুলি সরল লিপিড। ফসপোলিপিড, গ্লাইসিলিপিড ইত্যাদিরা জটিল লিপিড অণু।

জীবজগতের নির্দিষ্ট ধর্ম গুণাবলী বজায় রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) অণুর জন্য। চার রকমের নাইট্রোজেন বেস আছে এতে – অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ডিঅকসিরিবোস। এদের সঙ্গে ফসফেট যৌগ

মিলে গঠন করে দুটি নিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল। দু রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে – ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) এবং রাউবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)। বিজ্ঞানী *জেমস ওয়াটসন* (জন্ম ১৯২৮) এবং *ফ্রান্সিস ক্রিক* (জন্ম ১৯১৬) ১৯৫৩ সালে আবিষ্কার করেন ডি-এন-এ অণুর গঠন বৈচিত্র্য। এই অণু বংশগতির ধারক ও বাহক। গড়ন প্যাঁচানো মই-এর মতো। দুদিকে থাকে দুটি নিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খল যারা যুক্ত হয় মই-এর ধাপে ধাপে। ধাপগুলো গঠিত হচ্ছে উপরোক্ত চার রকমের নাইট্রোজেন বেস দ্বারা। তারপর মইখানা যেন তালেগোল পাকিয়ে যায়। এই আবিষ্কার করেই ওয়াটসন-ক্রিকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

পৃথিবীর প্রাণসম্পদ, জীব ও জীবাণু ও প্রায়-জীবাণু, এখন দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে – প্রথমটি প্রায়-কোষ-প্রধান বা সাবসেলুলার (sub-cellular) এবং দ্বিতীয়টি কোষ-প্রধান বা সেলুলার (Cellular)।

প্রথম ভাগে পড়ে ভাইরাস (Virus)।

দ্বিতীয় ভাগটিকে আবার দুটি উপ-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – প্রোক্যারিওট (Prokaryote) এবং ইউক্যারিওট (Eukaryote)।

প্রোক্যারিওট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জীবদলের নাম মনেরা (Monero) যার মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae)। ইউক্যারিওট উপভাগে আছে ৪টি জীব সাম্রাজ্য – প্রোটিস্টা (Protists), ছত্রাক ( ), উদ্ভিদ ( ) এবং প্রাণী ( )। এই সকল ভাগাভাগি নিয়ে মতভেদ আছে। আমাদের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। একটা বিভাগ নিয়ে এগোতে হবে এই যা।

ইউক্যারিওট দলের জীবদেহ যথার্থ জীবকোষ দিয়ে গড়া। যথার্থ কোষ বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই সব কোষ যাদের নিউক্লিয়াস একটি পর্দা দিয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করা আছে। অনেকটা হলঘরের মধ্যে অফিসারদের চেম্বারের মতো। ঠিক এ জিনিসটাই নেই প্রোক্যারিওটদের বেলায়। এদের নিউক্লিয়াসের পর্দা নেই বলে তারা কোষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

প্রায়-কোষ জীবাণু ভাইরাসের গঠন আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাধারণ কোষে যে সকল কোষাণু থাকে, সেখানে তা নেই। মূলত এগুলো 'ডি-এন-এ' বা 'আর-এন-এ' অণু দিয়ে তৈরি। একটি প্রোটিন আবরণীর মধ্যে গুপ্ত থাকে। পুরোপুরি কোষ না-হওয়া এই ভাইরাস জীবাণুদের সঠিকভাবে জীব বলা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। পছন্দসই অন্য জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ করে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে পারে। বংশবৃদ্ধি করতে পারা জীবনের লণ। কিন্তু ভাইরাস যখন জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ করেনি, তখন তারা মৃতপ্রায় এবং জড়বৎ। মৃতই বলা উচিত ছিল তবু মৃতপ্রায় বলছি। কারণ মৃত বললে তবে আবার জীবকোষে ঢুকে প্রাণবন্ত হয় কী করে? আবার সম্পূর্ণ জড়ও বলা

চলে না। অথচ জড়ের মতো বিপাকীয় ত্রি(য়া এবং বংশবৃদ্ধি ব্যতীত বিদ্যমান।

প্রাণ-অপ্রাণের সীমান্তে থাকা ভাইরাস ঠিক জড় না জীব তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা মুস্কিল।

'প্রায়ন' (Prion) আরেক প্রকার জৈব-অজৈব অণুর সীমান্তে পড়ে-থাকা ভাইরাস। এখানে আবার থাকে শুধু প্রোটিন অণু। বংশগতির উপকরণ হিসেবে তার মধ্যে 'ডি-এন-এ' বা 'আর-এন-এ' নেই। অথচ জীবকোষে ঢুকে পড়ে প্রায়ন বংশবিস্তার করতে পারে। সেটাই বিস্ময়কর।

'ডি-এন-এ' থেকে 'আর-এন-এ' এবং তা থেকে প্রোটিন তৈরি হয়। কখনো 'আর-এন-এ' থেকে 'ডি-এন-এ' হয় দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রোটিন থেকে 'ডি-এন-এ' বা 'আর-এন-এ' তৈরি হতে দেখা যায়নি। এ রহস্য একদিন নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করতে স(ম হবে।

পৃথিবী গ্রহ হিসেবে গঠিত হওয়ার সময় প্রাণ ছিল না, জীব ছিল না। তবে যৌগ বস্তু গঠনের উপাদান ছিল। যৌগ অণু গঠনের কাজটা শুরু হয়েছিল মহাকাশে – নীহারিকা বা মহাকাশের আন্তর্ন(ত্র মেঘপুঞ্জে। আগি-ন(ত্র থেকে কার্বন ও অন্যান্য পরমাণু সৃষ্টির পরে যখন উৎপন্ন বস্তু মহাকাশে বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা অন্য কোনভাবে উচ্চ তাপমাত্রা তেকে কম তাপমাত্রায় পৌঁছেছিল, তখন পরমাণু যুক্ত(হয়ে অণু গঠিত হওয়া সম্ভব হল। পৃথিবীর গঠন শুরু হয়েছে যে সব বস্তু দিয়ে তাতে কিছু জৈব এবং অজৈব অণু ছিল। ধূমকেতু-উল্কাপিণ্ড নিয়ে গবেষণা করে এমনটাই জানা গিয়েছে। গ্রহাণুতে রাযায়নিক বিত্রি(য়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আরো াধিক সুযোগ আছে গ্রহে।

পৃথিবীর আদিপর্বে বায়ুমণ্ডলের গঠন বর্তমানকালের মতো ছিল না। খুব সম্ভবত তা ছিল মিথেন-অ্যামোনিয়া-হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্পকণার মিশ্রণ। অবশ্য ঠিক এই সকল উপদানই ছিল কিনা তা নিয়ে এখনো মদভেদ আছে। একটা অভিমত হচ্ছে – তখন মূল উপাদান ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প এবং অল্প হাইড্রোজেন। তবে সেদিনের বায়ুমণ্ডলে ওজোন-স্তর ছিল না নিশ্চিত। না থাকার জন্য সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে নেমে আসতে পারত অক্লেশে যা রাসায়নিক বিত্রি(য়ায় শক্তি(র যোগান দিতে অন্যতম। বজ্র-বিদ্যুৎ বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেও শক্তি(র চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল।

নানা রাসায়নিক ত্রি(য়া-বিত্রি(য়ায় গঠিত হয়েছিল মোনোমার যৌগ – শর্করা,অ্যামিনো অ্যাসিড, নাইট্রোজেন যৌগ, অ্যালকোহল ইত্যাদি। মোনোমার থেকে স্বাভাবিক ছিল পলিমান শ্রেণির যৌগ গঠন। আমরা তখন পাই প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, লিপিড ইত্যাদি। পেলাম এ-টি-পি (Adenosine Triphosphate) জাতীয় শক্তি(-সংর(ণের

উপযোগী অণু।

১৯৫৩ সালে মার্কিন ছাত্র *স্ট্যানলি লয়েড মিলার* (১৯৩০-২০০৭ খৃঃ)) এবং তাঁর শি(ক *হেরল্ড ক্লেটন উরে* (১৮৯৩-১৯৮১ খৃঃ) একটি বিখ্যাত পরী(া চালিয়েছি লেন। আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদান ফ্লাস্কে পুড়ে নিয়ে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করলেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা। ফল হল অভিনব। দেখা গেল ফ্লাস্কে উৎপন্ন হয়েছে কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড। এবং অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু।

এতদ্বারা প্রমাণিত হল যে অজৈব উপাদান থেকে আদিম পৃথিবীতে জৈব যৌগ গঠন এক সম্ভাব্য বিত্রি(য়া।

কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যদি মিথেন-অ্যামোনিয়ার এমন মিশ্রণ থেকেও থাকে, তাহলে এর মিথেন এবং অ্যামোনিয়া আলোক-বিয়োজনে মুক্ত(হয়ে হাইড্রোজেন সৃষ্টি করে ফেলেছিল। তখন কিন্তু উরি-মিলারের পরী(া আর সফল হবে না। তাহলে?

অনেকে ভাবছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সৃষ্টিতে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বায়ুমণ্ডলের উপাদান হয়ে উঠেছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প এবং হাইড্রোজেন। তখন উরি-মিলারের পদ্ধতিতে গ্লাইসিন ছাড়া অন্য অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় না।

বিজ্ঞানীদের কর্মযজ্ঞ কোথাও থেমে নেই। *ফিলিপ অ্যাবেলসন* (১৯১৩-২০০৪ খৃঃ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গ্যাসের ভিন্ন মিশ্রণ থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করছে। গ্রথ এবং ওয়েসেনহফ ১৯৫৯ সালে অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পেয়েছিলেন।

ওদিকে *জুয়ান ওরো* (১৯২৩-২০০৪ খৃঃ) ১৯৬১ সালে মিলারের পরী(া নতুনভাবে করে দেখেছি লেন। বিত্রি(য়ায় প্রথমেই যে হাইড্রোজেন সায়ানাইড উৎপন্ন হয়েছিল, তা আদি মিশ্রণে আবার মেশালেন। তার ফ লে লাভ করলেন অ্যামিনো অ্যাসিড – পেপটাইড। এমনকি, নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান পিউরিন পর্যন্ত তৈরি হল। এভাবে ফর্মালডিহাইড থেকে রিবোস-ডিওকসিরিবোস পর্যন্ত তৈরি করতে স(ম হয়েছিলেন।

১৯৬৩ সালের পর *সিরিল পোন্নমপেরুমা* (১৯২৩-১৯৯৪ খৃঃ), রুথ ম্যারিনার এবং *কার্ল সাগান* (১৯৩৪-১৯৯৬ খৃঃ) এঁরা সকলে অ্যাডেনোসাইন, অ্যাডেনোসাইন ট্রাইফসফেট ইত্যাদি যৌগ গঠনে সমর্থ হন। ১৯৬৫ সালে গঠন করা সম্ভব হয় দুটি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে একটি ডাই-নিউক্লিয়োটাইড।

১৯৬৬ সালে কানাডার হডসন এবং বেকার আবার মিলারের পরী(াজাত বস্তু থেকে ত্র(মে ক্লোরোফিলের একটি উপাদান গঠন করতে পারেন।

এ সমস্ত পরী(া থেকে কী প্রমাণ হয়?

প্রমাণ হয় যে অজৈব উপাদান থেকে নানা জৈব উপাদানগুলির উৎপন্ন হওয়া খুবই সম্ভবপর ঘটনা। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় নানা রাসায়নিক বস্তুর মিশ্রণ হচ্ছিল নানা শক্তি(র প্রয়োগে। তার ফলে প্রোটিন থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান, এমনকি ক্লোরোফিলের উপাদান, গঠিত হওয়া আর অসম্ভব মনে হয় না।

১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রাভিযান থেকে পাওয়া চাঁদের পাথর এবং মেকসিকোর অ্যালেন্দে আর অস্ট্রেলিয়ার মার্চিসন থেকে পাওয়া উল্কাপিণ্ড পরী(া করে বেশ কয়েকটি কার্বন-প্রধান কনড্রাইট পাথরে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছে। সিংহলী বিজ্ঞানী পোন্নমপেরুমা অস্ট্রেলিয়ার মার্চিসন থেকে পাওয়া উল্কাপিণ্ড পরী(া করে দেখেছেন।

এসব নানা পরী(া থেকে মনে হয় জৈব বস্তুর রাসায়নিক পদ্ধতিতে জটিল জৈব অণুতে রূপান্তিরিত হওয়া বেশ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। কোন অপ্রাকৃত ব্যাপার নয়। জৈব অণু গঠন কেবল পৃথিবীতে নয়, মহাকাশের অন্য গ্রহ-উপগ্রহ-গ্রহাণুতেও সম্ভাবনাময়।

অবশ্য জৈব উপাদান গঠন এক জিনিস আর কয়েক ধরনের জৈব এবং অজৈব যৌগ যুক্ত(হয়ে একটি কোষ গঠন কার আরেক ব্যাপার। রুশ বিজ্ঞানী *আলেকজান্দার ওপারিন* (১৮৯৪-১৯৮০ খৃঃ) জীবন সৃষ্টি নিয়ে ১৯২৪ সালে গবেষণা করে একটি বই লিখেছিলেন। *জন ব্যার্ডন হ্যালডেন* (১৮৯২-১৯৬৪ খৃঃ) একই বক্ত(ব্য তুলে ধরেছিলেন তাঁর কাজে। ১৯২৯ সালে। তাঁদের তত্ত্ব এখন *ওপারিন-হ্যালডেন তত্ত্ব* নামে সুপরিচিত। ১৯৫৭-৬০ সালে নতুন করে এই তত্ত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা হয়।

তাঁরা বলেছিলেন – আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে চলছিল নানা রসায়নের গঠন এবং ভাঙন এবং পুনর্গঠন। ওই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল কিছু জৈব যৌগ। সেসব সঞ্চিত হচ্ছিল সমুদ্রের জলে। জমতে জমতে ত্র(মে সমুদ্রজল হয়ে উঠল উষ(ডায়লিউট স্যুপের মতো। ঐ তরলে ভাসমান জৈব অণু জটিল কোলোয়েড দ্রব্যের বিন্দুর রূপ নিল। ওপারিন তার নাম দিয়েছেন *কোয়াসারভেট* (Coecervet)। নানা রকম কোয়াসারভেট হওয়া সম্ভব ছিল। যেটা মূল্যবান কথা তা হল, কোয়াসারভেট বিন্দুগুলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে পারছিল। তার মানে বিপাক ত্রি(য়ার কাজটা করতে স(ম হয়েছিল বলা যায়। কোয়াসারভেট কালে কালে গড়ে তুলেছিল পরিপাকে স(ম প্রোটিন অণু।

পরে *জেমস ডেসমণ্ড বার্নাল* (১৯০১-১৯৭১ খৃঃ) উপরোক্ত(তত্ত্বের সংশোধন করে বললেন – সমুদ্রে নয়, যৌগগুলি কাছাকাছি এসে বিত্রি(য়ার অনেক বেশি সুযোগ পায়, যদি মিশ্রণটি হয় কোন অগভীর হ্রদে বা লেগুনে।

১৯৫৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী *সিডনি ওয়াল্টার ফকস* (১৯১২-১৯৯৮খৃঃ) যে তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, তার নাম *প্রোটেনয়েড* তত্ত্ব (Proteinoid Theory)। তিনিও পরী(া করে দেখেন যে নিছক কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড মিশ্রণ আদিম পৃথিবীর উষ(তায় উত্তপ্ত করে তারপর ঠাণ্ডা করলে তার মধ্যে পাওয়া যায় প্রোটিনের মতো দ্রাকৃতি গোলাকার বেশ কিছু অণু। এদেরই নাম রাখা হয়েছে প্রোটেনয়েড। এই প্রোটেনয়েড পরে কোষ নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে।

আরেকটি কোষ-গঠনের প্রস্তাব এসেছিল ডেভিড ডিমার এবং জুয়ান ওরো-র কাছ থেকে। নাম দেওয়া হয়েছে *লাইপোসোম* তত্ত্ব (Liposome Theory)। জলের মধ্যে ফসপোলিপিড গোল্লা পাকিয়ে যায়। এরা দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দ্বি-স্তর এক রকমের বস্তুপিণ্ড গঠন করতে পারে। দেখা যায় যে এই ধরনের বস্তুপিণ্ড অন্য রাসায়নিক দ্রব্য আত্মস্থ করতে স(ম। তাহলে তো প্রোটিনও আত্মস্থ করতে পারে। এবং তারপর কোষ গঠনের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানী *গ্রাহাম কেয়ার্নস-স্মিথ* (জন্ম ১৯৩১ সাল) বলেছিলেন যে কাদার কেলাসের সাহায্যে অনুলিপি গঠন করা যেতে পারে। আর অনুলিপি যদি গড়া যায়, তাহলে তো জিন নির্মাণের গোনার কাজটাই সারা হয়ে গেল। খুব সম্ভবত কাদার কেলাস কোষের মধ্যে জিন উদ্ভাবনে সাহায্য করেছিল।

জীব সৃষ্টি হয়েছিল জলে। জল নাহলে রসায়ন হয় নাকি! ১৯৭৯ সালে *উয়েস* কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন – আদিম উষ(পৃথিবীর বুকে জল ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। পৃথিবী ছিল তখন শুকনো। সুতরাং প্রাণের উদ্ভব জলে না হয়ে বাতাসে হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে *ওয়াক্টার্সহউসার* বলেন – প্রথম জীবন্ত প্রাণের ধরন ছিল উদ্ভিদের মতো স্বভোজী (Autotropic), প্রাণীকুলের মতো বহুভোজী (Heteortropic) নয়।

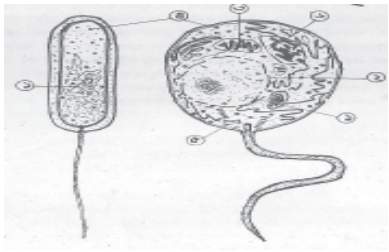

চিত্র-২২। দুরকমের ব্যাকটেরিয়া।
১- ডিএনএ,
২- নিউক্লিয়াস,
৩- মাইটোকন্ড্রিয়া,
৪- রাইবোসোম,
৫- সেনট্রিল,
৬- প্লাসটিড।

এভাবে অজৈব বস্তু থেকে জৈব রাসায়নিক বস্তু এবং তা থেকে জৈব অণু ও কোষ গঠনের প্রাথমিক উপাদান তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কোষ গঠনের আগে প্রোটিন বা ডি-এন-এ বা এ-টি-পি অণু তৈরি হয়েছিল কীভাবে তার সঠিক ধাপগুলি এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হয়নি।

বিজ্ঞানীরা ভাবছেন – কোন ধরনের জৈব বস্তুর আগে জন্মানো সম্ভব? ডি-এন-এ? নাকি আর-এন-এ? অথবা প্রোটিন? একটা জিনিস ত্র(মশ তারা উপলব্ধি করতে পারছেন যে আর-এন-এ অণু নিজেই নিজের অনুলিপি গঠন করতে পারে। ডি-এন-এ তার অনুলিপি গঠন করতে অনেক বেশি স(ম হলেও তা প্রোটিন-উৎসেচক ব্যতীত কাজ করতে পারে না। সুতরাং আর-এন-এ অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল। জীবকোষের কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছে ডি-এন-এ, কিন্তু কাজটা করছে প্রোটিন। তাহলে কে আগে উৎপন্ন হয়েছিল? প্রোটিন তার অনুলিপি তৈরি করতে পারে না। ১৯৭৩ সালে *লেসসি ওর্গেল* (১৯২৭-২০০৭ খৃঃ) তা পরী(া করে দেখেছেন।

১৯৮১ সালে তাই নোবেলজয়ী জার্মান বিজ্ঞানী *ম্যানফ্রেড এইজেন* ( ) বলেন যে আদিতে ছিল স্বপ্রজননের (মতা সম্পন্ন আর-এন-এ অণু। পরে এসেছে প্রোটিন উৎসেচক। এদের মিলিত ত্রি(য়ায় গঠিত হয়েছে জেনেটিক কোড। আর-এন-এ অণুর উৎসেচক গুণাবলীও আছে। কয়েক ধরনের প্রোটিনের উপস্থিতিতে আর-এন-এ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে।

নিজেই নিজেকে সৃষ্টি? স্বসৃজন?

জগতে প্রথমে এসেছে আর-এন-এ। তারপর ডি-এন-এ। বিজ্ঞানী *টমাস রবার্ট চেক* (জন্ম ১৯৪৭ সাল) পরী(া করে দেখান যে তুলনামূলক আর-এন-এ অণু অনেক বেশি সত্রি(য়। *সিডনি আল্টম্যান* (জন্ম ১৯৩৯ সাল) পরী(া থেকে তারই সমর্থন পেয়েছেন। সব দেখেশুনে *ফ্রিম্যান জন ডাইসন* (জন্ম ১৯২৩ সাল) বলেছিলেন – প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে দু'বার এবং তারা যুক্ত(হয়ে জীবকোষ বানিয়েছিল।

পূর্ণ জীবকোষে এবং অসম্পূর্ণ জীবকোষে কোন ধরনের জৈব-রাসায়নিক উপাদান প্রধান ছিল তা নিচে দেখানো হল। জীবনের উদ্ভব ঠিক এরকমভাবে পরপর হয়েছিল কিনা তা এজ্ঞুনি সুনিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। তবে নানা প্রাণের বা প্রাণের কাছাকাছি অপ্রাণের মধ্যে জটিলতার বিকাশ কেমন ধাপে ধাপে হতে পারে তার একটা ছবি অন্তত পাওয়া যায়।

প্রায়ন ((Prion) - প্রোটিন

ভিরিয়ড (Viriod) - আর-এন-এ

আর-এন-এ ভাইরাস (RNA-virus) - আর-এন-এ এবং প্রোটিন ক্যাপসিড

ডি-এন-এ ভাইরাস (DNA-virus) - ডি-এন-এ এবং প্রোটিন ক্যাপসিড

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) - নিউক্লিওটাইড এবং পরিপাক ব্যবস্থাসহ প্রোক্যারিওট কোষ, ডি-এন-এ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড, লিপিড, রাইবোসোম ইত্যাদি।

সায়ানোব্যারটেরিয়া (Cyanobacteria) - প্রোক্যারিওট কোষ যাতে আছে ক্লোরোফিল, বিটা ক্যারোটিন এবং ফাইকোবিলেন।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) - ইউক্যারিওট কোষ।

অ্যালগি / শৈবাল (Algae) - ইউক্যারিওট কোষ এবং ক্লোরোফিল ও কোষপ্রাচীর।

প্রথম যে কোষ গঠিত হয়েছিল, তা ছিল অসম্পূর্ণ এককোষী প্রোক্যারিওট শ্রেণিভুক্ত(ব্যাকটেরিয়া। কোষের মধ্যেকার সংগঠন ছিল এলোমেলো। কোন রকমে গড়ে ওঠা। পরবর্তী স্তরের কোষ হতে পেরেছিল সুসংগঠিত ইউক্যারিওট কোষ। এককোষী জীব তো একা একা থাকেনি। থেকেছে যৌথভাবে একদল কলোনিতে। ভাবা হয়েছে, যৌথভাবে জীবনযাপনের সুবিধাটুকু লাভ করার ফলে তারপর বহুকোষী জীবের আবির্ভাব হয়েছিল।

কোষের রাইবোসোমে আর-এন-এ আছে। এই আর-এন-এ নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স থেকে কোষের বিবর্তনের একটি চিত্র ফুটে ওঠেয় প্রোক্যারিওট কোষ দুরকমের – আর্কব্যাকটেরিয়া (Arcaebacteria) এবং ইউব্যারটেরিয়া (Eubacteria)। ইউব্যাকটেরিয়া এবং ইউক্যারিওট কোষ কাছাকাছি সময়ের। আর্কব্যাকটেরিয়া তার আগেকার। এই দলভুক্ত(উদাহরণ – সালফো-ব্যাকটেরিয়া, হেলো-ব্যাকটেরিয়া মিথানো-ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি।

মার্কিন বিজ্ঞানী *লিন মাগুলিস* (জন্ম ১৯৩৮ সাল) ইউক্যারিওট কোষের আবির্ভাব নিয়ে এক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন – *সিমবায়োটিক* তত্ত্ব (Symbiotic Theory)। এক জীবদেহ প্রায়ই অন্য আরেক জীব আশ্রয় করে এবং তারা পরস্পর সহযোগিতা করেই বেঁচে থাকে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকারই নাম সিমবায়োসিস। মনুষ্যসমাজে এই প্রকার সহযোগিতা বেঁচে থাকার জন্য এক আবশ্যিক শর্ত। এ এক প্রকার সহযোগিতা। জীবের বেলায় আরো অন্যরকম সহযোগিতা কাজে লাগে। যেমন, গরু ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে(কারণ তার পেটের ভিতরে থাকা ব্যাকটেরিয়া ওই ঘাসপাতা হজম করতে গরুকে সহযোগিতা করে(বিনিময়ে ঐ ব্যাকটেরিয়া গরুর পেটে খাদ্য-বাসস্থান লাভ করে।

তত্ত্বটা এই – আদি জীবসৃষ্টির পরে প্রোক্যারিওট কোষ অন্য প্রোক্যারিওট কোষকে

খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও তা হজম করতে পারেনি। ফল হল, তারা খাদক কোষের মধ্যে রয়ে গেল এবং কালে কালে কোষের এক অঙ্গ, কোষাণু বা অর্গানেল, হয়ে উঠল। ইউক্যারিওট কোষের আর্কেইজোয়া দলে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং আরো অনেক কোষাণু নেই। কিন্তু মেটাক্যারিওট দলে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে। প্রোক্যারিওট কোষ অযৌন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বংশবৃদ্ধি এবং বংশর(া করে। অনেক ইউক্যারিওট কোষও অযৌন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে থাকে। ঘটনাগুলি প্রোক্যারিওট-ইউক্যারিওট দলবিভাজনের অন্তবর্তীকালীন অবস্থা সূচনা করে। বোধ হয়, যৌন বিভাজন পদ্ধতিও এই সিমবায়োসিসের ফলাফল।

এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীব উদ্ভূত হল কীভাবে?

এমন হতে পারে যে অনেকগুলি এককোষী জীব পাশাপাশি থাকতে থাকতে ত্র(মে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। পৃথকভাবে বেঁচে থাকার (মতা হারিয়ে বসল। অথবা এমনও হতে পারে যে এককোষী জীবের একটি নিউক্লিয়াস হয়তো অনেক নিউক্লিয়াসওয়ালা এককোষী জীবে পরিণত হল। পরে অন্যান্য নিউক্লিয়াসের জন্য আবরণ তৈরি হল। এককোষী তখন বহুকোষী জীব হয়ে উঠল। একবার প্রাণ সৃষ্টি হয়ে গেলে সরল থেকে জটিল প্রাণের জন্ম হওয়া আর অসম্ভব রইল না।

প্রাণ একটি ধর্ম বা গুণ। জৈববস্তুর নিজস্ব গুণ। গুণধর্ম বস্তুকেন্দ্রিক। তার দ্রষ্টা মানুষ। বস্তু থেকে জাত বা প্রতিফলিত তরঙ্গ ইন্দ্রিয়ে ত্রি(য়া করে সেই ধর্মগুণ উৎপন্ন করে। তা কোন অপ্রাকৃত ব্যাপার নয়। নেই তার কোন ঐশী শক্তি(। জৈববস্তু আভ্যন্তরীন বিশেষ সংগঠন এবং বাইরের উপযোগী পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই ধর্মটি আহরণ করে। বিশেষ সংগঠন ভেঙে গেলে প্রাণের প্রাণত্ব লোপ পায়। তখন সে শুধু মৃতদেহ বা জড়বস্তু। ঘড়িটা সময় দেবে যখন তার যন্ত্রাংশ ঠিকঠিক মাপে গড়া এবং সংযুক্ত(। কোথাও সামান্য বেঠিক হলে ঘড়িটা আর চলবে না। ঘড়ি তার ধর্ম হারাবে। জলকণায় কম্পন হতে পারে, ঝড় নয়। পুকুরেও নয়। ঝড় উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের ধর্ম।

জৈব বস্তুসমূহ খুবই জটিল — একটি অতি সরল প্রাণকোষের বেলাতেও। জৈব-অজৈব প্রাণহীন বস্তু পর্যায়ত্র(মে জটিল হয়ে প্রাণময় কোষে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে সুদূর অতীতে তা ঠিক কী কী পর্যায় পার হয়ে তারপর কোষ হয়ে উঠেছিল, তার ধাপগুলো আজ শুধু পরী(াগারে এবং তত্ত্ব দিয়েই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কেননা তখন মানুষ ছিল না। কোন ঋষি ছিল না। ছিল না কোন ইতিহাসকার।

এ যাবৎ যতদূর বৈজ্ঞানিক ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রাণ নিজেই নিজের স্রষ্টা। অজৈব বস্তুই জৈব বস্তু গঠন করেছে। জৈব বস্তু গড়েছে প্রাণধর্মসম্পন্ন জীব। নানা পরী(ায় তা একটু একটু করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এ কাজ সম্পূর্ণ হলে একদিন পরী(াগারে হয়তো প্রাণকোষ নির্মিত হবে।

৪.৭। মানুষের আবির্ভাব

সৃষ্টির শেষ পর্যায় হল মানুষসৃষ্টি।

মানুষ স্বয়ম্ভু নয় কেননা সে নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করে। ধরা যাক আমরা মানুষ থেকে মানুষ জন্ম নেওয়ার আদি ঘটনায় যেতে চাই। পিতামাতা থেকে পিতামহ-পিতামহী এবং মাতামহ-মাতামহী হয়ে প্রপিতামহ-প্রমাতামহ ইত্যাদি একের পর এক প্রজন্ম পার হয়ে যেতে যেতে কি আদি একজোড়া মানব-মানবী আদম-ঈভের কাছে পৌঁছে যাব না? যাওয়া তো উচিৎ ছিল কিন্তু তা হবে না। কেন? কারণ সৃষ্টির অঙ্কটা যতটা সহজে হিসেব করা হয়েছে স্রষ্টা-আদম-ঈভ এবং তার বংশপরম্পরা এইভাবে, বাস্তবে তেমন নয়। বাস্তব ঘটনা কী? কী তার রহস্য? মানুষ কোথা থেকে এল?

এর আগে আমরা জগৎ সৃষ্টির কথা জেনেছি, তারামণ্ডল-ন(ত্রমালার সৃষ্টির কথা জেনেছি, সূর্য-পৃথিবী-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির কথা জেনেছি, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির কথাও জেনেছি।

আদিতে প্রাণের অণু থেকে অসম্পূর্ণ এককোষী জীব প্রোক্যারিওট ব্যাকটেরিয়া জন্মেছিল। নানা প্রকারের। তারা যে পৃথিবীতে ছিল ৩০০ কোটি বছর আগে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে পুরনো পাথরের গায়ে। তারও কত আগে জন্মেছিল তা বলা যাচ্ছে না। পৃথিবীর জন্ম ৪৬০ কোটি বছর আগে। অনুমান হয় প্রথম ১০০-১৫০ কোটি বছর ধরে চলেছিল জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন।

এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে আজ থেকে ২০০ কোটি বছর আগে রিত্ত(ধরায় বিরাজ করত শুধু ব্যাকটেরিয়া এবং নীল-সবুজ শ্যাওলা বা সায়নোব্যাকটেরিয়া। মানুষ নয়, দেবতা নয়, শুধু ব্যাকটেরিয়া!

তারপর এককোষী সম্পূর্ণ জীব ইউক্যারিওট জন্মেছে। বোধ হয় ১৬০ কোটি বছর আগে। নানা রকমের ইউক্যারিওট উদ্ভূত হয়েছিল। তা থেকে জন্মেছে বহুকোষী জীব, হয়েছে স্বভোজী উদ্ভিদ এবং পরভোজী প্রাণীকুল। এই সময় দেখা দেয় এককোষী প্রোটোজায়া এবং বহুকোষী অমে(দণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী। বহুকোষীদের আবির্ভাবকাল এই জগতে মাত্র ১০০ কোটি বছর আগে। ব্যাকটেরিয়া থেকে জন্মেছিল নীল-সবুজ শ্যাওলা আর কীট বা ওয়ার্ম। স্বভোজী নীল-সবুজ শ্যাওলা থেকে উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাব হয় এবং কীট থেকে প্রাণীজগতের। প্রাণের

উদ্ভবের এই সব ইতিহাস আরেকটু বিশদভাবে জানা হলে, 'হাঁস আগে না ডিম আগে' এ জাতীয় প্র্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার ভূমিকাও হয়ে যায় অপ্রাসঙ্গিক। প্রাণজগতের এই সব বিবর্তনের কথা বেশ জানা গিয়েছে হাজারো রকমের মৃত জীবের পাথর হয়ে যাওয়া জীবাশ্ম ঘেঁটে ঘেঁটে। আর জীবিত বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে।

বিবর্তনের ভাবনা আগেও ছিল কিন্তু তা সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান *চার্লস ডারউইন* (১৮০৯-১৮৮২ খৃঃ) অভিব্যক্তি(বাদ তত্ত্বে ( )। তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিস' নামে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে।

জীব পরিবর্তিত হয়ে চলে এক ধরণের জীব থেকে অন্য ধরণের জীবে। জগতের এই পরিবর্তন এক অনিবার্য ঘটনা। আর তা হবেও অঢেল বৈচিত্র্যময় রূপে। পরিবর্তন শুধু জীবজগতে নয়, জড়জগতেও। সাধারণভাবে সকল জৈব প্রজাতির এই বেঁচে থাকা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এই সঙ্গতি রাখার আরেক নাম জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence)। কারা সফলভাবে বাঁচবে তা একান্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন ঐশীশক্তি(দ্বারা নয়। একে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বলা হয়েছে। যেসকল প্রজাতির জীবের মধ্যে হয়েছে সুবিধেজনক কিছু পরিবর্তন যা বর্তমান জৈব-অজৈব পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী, তারাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয় এবং সফলভাবে জন্ম দেয় উত্তরসূরীদের। তারাই প্রজাতি হিসেবে স্থায়ী হয়। অন্যরা অবলুপ্ত হয়ে যায়। একে বলা যায় যোগ্যতমের জয়। এই সামগ্রিক প্রক্রি(য়ার নাম অভিব্যক্তি(বাদ।

কীট থেকে জন্মেছিল জলজ প্রাণীসম্পদ। প্রথমে মে(দশুহীন, খোলসে আবৃত নরমদেহী প্রাণী। তারপর মে(দভী প্রাণী – সেও প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে জন্মেছিল – কঠিন বর্মে আবৃত হয়ে চোয়াল-ছাড়া মাছ। কিছুদিন পরে, মানে কয়েক কোটি বছর পরে, জন্মাল চোয়াল-যুক্ত(মাছ। জলজ এই প্রাণসম্পদ থেকে জন্মেছিল উভচর জীব এবং পাখী। উভচর থেকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী (Reptiles), আরো পরে স্তন্যপায়ী জীব (Mammal)। পৃথিবীতে উভচর (Amphibian) প্রাণীরা এসেছিল ৩৭ কোটি বছর আগে, সরীসৃপ বা রেপটাইল ৩২ কোটি বছর আগে আর স্তন্যপায়ী ম্যামাল শ্রেণি এসেছিল ২০ কোটি বছর আগে। স্তন্যপায়ীদের অনেক বর্গ (Order) জন্মেছিল। এদের মধ্যে একটি বর্গ ছিল প্রাইমেট (Primate)। তারা ৭ কোটি বছর আগেকার পার্থিব প্রাণীসম্পদ।

বানর মানুষের পূর্বপু(ষ 'অরিজিন'-এ এমন কথা বলা হয়নি। কেবলমাত্র বলা হয়েছে – বিবর্তনের ধারণা থেকে মানুষের উদ্ভব ও তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে আবির্ভাবের রীতিপদ্ধতি

সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষকেও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একই তালিকাভুক্ত(করতে হবে। ১৮৭১ সালে 'ডিসেন্ট অব ম্যান' প্রকাশিত হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় – মানুষ পূর্বে উদ্ভূত নিম্নশ্রেণীর কোন প্রজাতির বিবর্তিত উন্নততর রূপ। *টমাস হেনরি হাক্সলি* (১৮২৫-১৮৯৫ খৃঃ) ১৮৬৩ সালে 'ম্যানস প্লে-স ইন নেচার'-এ গরিলা-শিমপাঞ্জির সঙ্গে মানুষের গঠন তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বনমানুষ (Ape) ও মানুষ একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। মানুষের বিবর্তনের প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ছিল এপ ও মানুষের মধ্যবর্তী কোন অজ্ঞাত অবলুপ্ত প্রাণী যা হবে মিসিং লিঙ্ক। সেই থেকে মিসিং লিঙ্ক খোঁজা শু(হয়েছিল। আর খুঁজতে খুঁজতে আমরা দেড়শ বছরের মধ্যে অনেকগুলো মিসিং লিঙ্ক খুঁজে পেলাম। মানুষের বিবর্তনের ছবিটা আজ মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

মানুষ জন্মাল পৃথিবীতেও। কিন্তু তা হল পরম কোন শুভদিনে শুভ(ণে নয়। জন্ম হল একটু একটু করে – মানুষ হওয়া হয়েছে ধীরে। মানুষের সঙ্গে এমনিতে বনমানুষের বেশ মিল। ভাবা হয়েছিল বনমানুষ ও মানুষের আদি কোন সাধারণ পূর্বপু(ষ থেকে মানুষ জন্মেছিল। প্রাইমেট থেকে মানুষ সৃষ্টি হতে তিনটি পর্ব গিয়েছে বলা যায় –

১. প্রাইমেট বর্গ (Primate order) থেকে হোমোনিড (Hominid) হয়ে ওঠা,

২. অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus) থেকে হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis) পর্যায়ে উত্তরণ, এবং

৩. হোমো হ্যাবিলিস থেকে আধুনিক মানুষ (Homo sapiens sapiens) হওয়া।

স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাইমেট বর্গ বলতে বোঝায় টারসিয়ার লিমার থেকে বানর-গরিলা-মানুষ পর্যন্ত। প্রাইমেট বিশিষ্ট হয়েছে বিকশিত মস্তিষ্কের জন্য, হাতপায়ের দ(ব্যবহারের জন্য, উন্নত দৃষ্টিশক্তি(র জন্য, দীর্ঘসময় মাতৃগর্ভে থেকে জন্ম হওয়ার জন্য, দীর্ঘ শৈশবকাল ও শি(াকালের জন্য। এরা নানা পরিবেশের মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে দ(। আর এদের রয়েছে উন্নত ও জটিল সমাজ জীবন। ইয়োসিন পর্বে (৫ কোটি ৭৮ ল(বছর থেকে ৩ কোটি ৬৬ ল(বছর আগে) এদের প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে এশিয়া এবং আফ্রিকা ছাড়াও আমেরিকায়। ৪ কোটি বছর আগেকার প্যারাপিথেকাস (Parapithecus) অন্যতম আদি প্রাইমেট। এর জীবাশ্ম পাওয়া যায় মিশরের ফায়ুম এলাকায়।

প্রাইমেটের ১৮২টি প্রজাতি আছে দুটো দলে – প্রসমিই (Prosmii) এবং অ্যানথ্রোপয়েড (Anthropoidea)। অ্যানথ্রোপয়েড দলে রাখা হয়েছে বানর (Monkey) ও বনমানুষ বা হোমিনয়েডিয়া (Hominoidea)-দের। দু রকমের বানর

আছে – ক্যাটারিনি (Catarrhini) ও প্লাটিরিনি (Platirrhini)। প্লাটিরিনি দলে নতুন যুগের বানর। পুরোনো যুগের ক্যাটিরিনি দলে পড়ছে হোমিনয়ডিয়া (Hominoidea) এবং পুরোনো যুগের বানরকুল। হোমিনয়ডিয়া প্রাণীকুলে পড়ছে বনমানুষ এবং মানুষ। উদ্ভব প্রায় ৩ কোটি বছর আগে। হোমিনয়ডিয়া প্রাণীকুলে আছে তিন রকমের প্রাণী – হাইলোবাইট (Hylobatidae), পঙ্গিড (Pongidae) এবং হোমিনিডেই (Hominidae) প্রাণীরা। এই শ্রেণিবিভাগ সর্বসম্মত নয়।

হাইলোবাইট দলে পড়ে গিবন। আমরা যাকে উল্লুক বলি। গালমন্দ দিয়ে যাদের বলি তারা নয়। যথার্থ উল্লুক যারা তারাই এই দলে।

পঙ্গিড দলে রয়েছে ওরাংওটাং, গরিলা এবং শিম্পাঞ্জী। এরাই মানুষের সবথেকে কাছের প্রজাতি। পৃথিবী থেকে পঙ্গিড প্রাণীরা এখনো অবলুপ্ত হয়ে যায়নি তবে তাদের সংখ্যা কমে আসছে। এদের আমরা বনমানুষ (এপ) বলেছি।

হোমিনিডেই দলে রয়েছে হোমো গণের প্রাণীরা। আমরা মানুষেরা জীববিদ্যার ভাষায় 'হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস'। 'হোমো' আমাদের 'গণ' (genus) আর 'স্যাপিয়েনস' আমাদের 'প্রজাতি' (specei) পরিচয়। এই হোমো গণের সঙ্গে রাখা হয়েছে মানুষের মত দেখতে আরো কিছু প্রাণী যারা আজ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন অস্ট্রালোপিথেকাস। গ্রীক 'পিথেকাস' শব্দটির মানে 'বনমানুষ'।

আমরা সকল জীবসমুদায় নানা দলে-উপদলে ভাগ করেছি আমাদের জানার সুবিধার জন্য। শ্রেণিবিভাগ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদও কম নেই। আমরা একটা বিভাগ নিয়ে কথা বলছি মানে সেটাই শেষ কথা নয়। এমনিতেই ভাগাভাগিটা মাঝেমাঝে ঠিকঠাক করে নিতে হয় নতুন প্রাণীকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বা নতুন তথ্য অনুসারে বিবর্তনের ধারা নতুন করে সাজানো দরকার হলে।

দুটি আদি বনমানুষ গোষ্ঠীর কথা আমরা জানি – ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus) এবং রামপিথেকাস (Rampithecus)। মিওসিন যুগে এরা পৃথিবীতে এসেছিল।

ড্রায়োপিথেকাস গোষ্ঠীতে পড়ে ড্রায়োপিথেকাস, প্রোকনসাল, পি-য়োপিথেকাস ইত্যাদি প্রজাতি। এরা ২৫০ ল(থেকে ৯০ ল(বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল। দাঁতের এবং দৈহিক গঠন বনমানুষদের খুব কাছাকাছি বলে এদের বনমানুষদের পূর্বপু(ষ ভাবলেই ঠিক হয়।

রামপিথেকাস গোষ্ঠীতে পড়ে রামপিথেকাস, শিবপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস ইত্যাদি গণ। ১৪০ ল(থেকে ৯০ ল(বছর আগে পর্যন্ত এদের জীবা(ম পাওয়া যায়। ভারত পাকিস্তানের শিবালিক অঞ্চলেও বেশ কিছু ফসিলের খোঁজ মিলেছে। এই গোষ্ঠীটি বনমানুষদলের থেকে মানুষের বেশি কাছের। এদের হোমো এবং

অস্ট্রালোপিথেকাস গণের আদি ভাবা হয়।

সত্যি কথা বলতে কি বংশলতিকায় ড্রায়োপিথেকাস এবং রামপিথেকাসের সঠিক অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। ৮০ ল(থেকে ৪০ ল(বছর আগের জীবা(ম আমাদের হাতে বিশেষ নেই। ফলে কোন প্রাণী থেকে কোন প্রাণী জন্মেছে এই অন্তর্বর্তীকালে – বিবর্তনের সেই পর্যায় নির্ণয়ে কিছু সমস্যা থেকে গিয়েছে।

৬০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়া বি(বিদ্যালয়ের অ্যানথ্রপলজিস্ট **ভিনসেন্ট সারিখ**, বায়োকেমিস্ট **অ্যালান উইলসন** এবং **মরিস গুডম্যান** জৈবরাসায়নিক পরী(া করে দেখান যে কয়েক ধরণের প্রোটিনের ে(ত্রে মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খল একই গঠনের। ত্রে(মোসোমের মধ্যে পার্থক্যও অতি সামান্য। পরে (১৯৭৫-৭৭) প্রোটিন অ্যালবুমিন পরিবর্তনের হার থেকে হিসেব করেছেন যে প্রায় ৩ কোটি বছর আগে ওলিগোসিন পর্বে ক্যাটারাইন বানর এবং বনমানুষের ধারা পৃথক হয়ে যায়। মিওসিন পর্বের শেষে ১ কোটি বছর আগে গিবনের ধারা এবং ৮০ ল(বছর আগে ওরাংএর ধারা পৃথক হয়েছিল। হোমো, শিম্পাঞ্জী এবং গরিলা গণের ধারা আলাদা হয়ে যায় সম্ভবত ৫০ ল(বছর আগে।

হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস-এর কাছাকাছি অর্থাৎ পুরোপুরি মানুষ নয় বা মানুষ হয়ে ওঠার সময়কার অনেক জীবা(ম এখন পাওয়া গিয়েছে। আমরা এই হোমো গণের প্রাণীদের দুটি গণে পৃথক করেছি – অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus) এবং হোমো (Homo)।

অস্ট্রালোপিথেকাস গণে এখন তিনটি প্রজাতি নির্ণীত হয়েছে – অ্যাফারেনসিস (afarensis), আফ্রিকানাস (africanus) এবং রোবাস্টাস (robostus) বা বয়সেই (Boesei)। অবশ্য যদি বয়সেইকে আলাদা না ধরা হয়।

'হোমো' গণের প্রজাতি ঠিক করা হয়েছে এই রকম – হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis), হোমো ইরেকটাস (Homo erectus), এবং হোমো স্যাপিয়েনস (Homo sapiens)। অনেকে হোমো স্যাপিয়েনস প্রজাতির মধ্যে তিনটি উপপ্রজাতির কথা বলেন – নিয়ানডার্থালস (neanderthals), আর্কেইক (archeic) এবং স্যাপিয়েনস (sapiens) নামে। সব উপদলগুলি প্রজাতি হিসেবে ধরে নিলে মোট ৫টি প্রজাতির খোঁজ পাই। মানুষ না-হওয়া এই প্রজাতিদের খবর কি করে পাওয়া গেল? খবর পাওয়া গেল প্রধানত প্রজাতির সদস্যের জীবা(ম থেকে, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, খাদ্যাবশেষ; ইত্যাদি থেকে।

হোমো গণের নিয়ানডার্থাল জীবা(ম পাওয়া গিয়েছে সবথেকে আগে। বরংচ সবশেষে খোঁজ পাওয়া যায় অস্ট্রালোপিথেকাসদের। ১৯৭৮ সালে ডোনাল্ড কার্ল জোহানসন (জন্ম ১৯৪৩) এবং **টিম হোয়াইট** প্রথম নামকরণ করেন এই গণের

এক প্রজাতির। অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেনসিস (Austalopithecus afarensis) । ফসিল পাওয়া গিয়েছে ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে হাদার নদী উপত্যকায় ১৯৭৩ সালে। ৩০ ল(বছর আগেকার কোন হোমিনিডের চার টুকরো পায়ের হাড়। নিশ্চিতরূপেওই প্রাণীটি দুপেয়ে ছিল। ভাবা হয়েছিল ওরা মাংসাশী, পশু শিকারে অস্ত্রের ব্যবহারে স(ম। বোধ হয় সামাজিক সহযোগিতা এবং ভাব বিনিময় করতেও পারত।

পরের বছরে একটি মেয়ের প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে আফারের হাদারে। 'এ-এল-২৮৮' সাইটে। নাম রাখা হয়েছে তার 'লুসি'। সে পৃথিবীতে এসেছিল ৩৭ ল(বছর আগে। ছোট্ট মেয়েটি ছিল ১১০ সেমি লম্বা, ওজনে ৩০ কেজির মতো। সবচেয়ে সুগঠিত হলেও সবচেয়ে ছোট এবং পুরোনো। আবিষ্কার করেছেন ডোনাল্ড জোহানসন ও তাঁর ছাত্র টম গ্রে। ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ মরিস তাইয়েব (জন্ম ১৯৩৫) এবং জোহানসন আরো অনেক জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৭৫ সালে হাদারে 'এ-এল-৩৩৩' সাইটে ১৩ জনের এক পরিবারগোষ্ঠীর ফসিল পাওয়া গিয়েছে। এরা চেহারায় ছোটখাট। মস্তিষ্কের মাপ ৪০০ ঘনসেমি থেকে বেশি নয়।

এদিকে ১৯৭৪ সালে ওলডুভাইর কাছে লিটোলিতে মেরি লিকি (১৯১৩-১৯৯৬) এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ফিলিপ লিকি (জন্ম ১৯৪৯) ৩৫ ল(বছরের আগেকার হোমিনিডের দাঁত আর চোয়াল খুঁজে পান। আফার এবং লিটোলির জীবাশ্ম তুলনা করে তাঁরা এদের অ্যাফারেনসিস প্রজাতিভুক্ত(বলে মত প্রকাশ করেন।

অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (Austalopithecus africanus) প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন অস্ট্রেলিয়ান রেমন্ড ডার্ট (১৮৯৩-১৯৮৮ খৃঃ)। ১৯২৪ সালে পাওয়া গিয়েছিল দ(ণ আফ্রিকার কালাহারি ম(ভূমির দ(ণপূর্ব প্রান্তে তাউং রেলস্টেশনের কাছে চুনাপাথরের গুহায়। তাউং-শিশু (Taung child) নামে পরিচিত এক শিশুর জীবাশ্ম। তা পরী(া করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই আফ্রিকানাস এপও নয় মানুষও নয় — দুয়ের মাঝামাঝি নতুন এক প্রজাতি — পৃথিবী বিখ্যাত মিসিং লিঙ্ক। ডার্টের এই দাবী সকলে নস্যাৎ করলেও স্বাগত জানিয়েছিলেন ডেভিড ব্রুম (১৮৬৬-১৯৫১ খৃঃ)। ১৯৩৬ সালে তিনি স্টার্কফনটেন গুহা থেকে একটি খুলি (৪৮৫ সিসি) এবং দুবছর পরে তিন কিলোমিটার দূরে ত্র(মডাই চুনাপাথরখনি থেকে প্রায় অর্ধেক খুলি খুঁজে পান। তাঁর আবিষ্কৃত ত্র(মডাই ম্যান (Cromdii Man) আজ অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস নামে পরিচিত। ব্রুম ১৯৪৭ সালে ম্যাকাপান্সগাট এলাকায় এই প্রজাতির অন্যান্য কিছু ফসিল পেয়েছিলেন। ইথিয়োপিয়ার ওমো এলাকায় শুঙ্গুরা এবং উসনো স্তরে

এদের জীবাশ্মে মিলেছে। ৩০ ল(থেকে ২০ ল(বছর আগে এরা এই পৃথিবীতে ছিল। অ্যাফারেনসিসের থেকে আফ্রিকানাস প্রজাতির প্রাণীদের দেহ ছিল সামান্য বড়ো। মস্তিষ্কের মাপেও সামান্য বেশি — গড়ে ৪৪০ ঘনসেমি ।

অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস এবং বয়সেই — এই উভয় প্রজাতিকে একত্রে রোবাস্ট অস্ট্রালোপিথেকাস (Robust austalopithecus) বলা হয়। দেহের আকারে এরা আরেকটু বড়ো, চোয়াল এবং দাঁত বড়ো, মস্তিষ্কের মাপ ৪৫০ ঘনসেমির চেয়ে বেশী। বয়সেই দলটি আবার সবথেকে বড়ো, ঠিক রোবাস্ট বলতে যেমন বোঝায়। জীবাশ্মে পাওয়া গিয়েছে দ(ণ আফ্রিকার সোয়ার্টত্র(ানস, ত্র(মডাই এবং স্টার্কফনটিনে, পূর্ব আফ্রিকার ওলডুভাই গিরিবর্ত্মে, ইথিয়োপিয়ার ওমো অঞ্চলে। এদের অস্তিত্বকাল ২০ ল(থেকে ১০ ল(বছর আগে। ১৯৫৫ সালে করোঙ্গোতে *লুইস লিকি* (১৯০৩-১৯৭২ খৃঃ) দুটি দাঁত এবং দু বছর পরে জিঞ্জ অঞ্চলে মেরি লিকি সম্পূর্ণ একটি খুলি আবিষ্কার করেন। বড় বড় দাঁতের প্রাণীটি বাদাম ভাঙার উপযুক্ত(ছিল বলে একে নাটত্র(াকার ম্যান (Nutcracker Man) বলা হল। ১৭.৫ ল(বছর প্রাচীন। এখন তারা বয়সেই-দলভুক্ত(।

মেরি লিকি-র চেষ্টায় আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল ওলডুভাই এলাকায়। প্রচুর পরিমাণে। 'ডি-কে' নামে পরিচিত একটি জায়গা থেকে। ওই জায়গাটিকে নাকি বলা চলে প্রাচীনতম হোমিনিডদের বাসস্থান। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই সকল অস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে ওলডুভাই-নুড়ি অস্ত্র। ওল্ডোয়ান শিল্প বা নুড়ি পাথরের শিল্প পুরাতন প্রস্তর যুগের নিদর্শন। এই নুড়ি শিল্প প্রায় ২০ ল(বছর আগেকার। হয়তো তা আরো অনেক প্রাচীন সময় থেকে চলে আসছে। শিল্প আয়ত্ত করা তো মানুষ হয়ে ওঠার ল(ণ। অথচ ২০ ল(বছর আগে যে মানুষের খোঁজ পাচ্ছি তারা যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠেনি তখনো। মানুষ যথাযথ মানুষ না হওয়ার আগেই নুড়িশিল্প তৈরী করতে শিখেছে, অস্ত্রধর হয়ে উঠেছে — এ ভারী আশ্চর্যের।

হোমো গণের আদিমতম প্রজাতি হোমো হ্যাবিলিস। প্রজাতির নামকরণ করেন লুইস লিকি ১৯৫৯ সালে। তখনো তাদের কোন জীবাশ্মে আবিষ্কৃত হয় নি, আবিষ্কার করা হয়েছে ওল্ডুভাই নুড়ি অস্ত্র (Olduvai pebble)। তা থেকেই তাদের নামকরণ করা হয়। অবশেষে হোমো হ্যাবিলিস জীবাশ্মে আবিষ্কার করেন *জোনাথান লিকি* (জন্ম ১৯৪০) ১৯৬০-৬১ সালে। জীবাশ্মে বলতে দাঁত, কাঁধের হাড় আর খুলির টুকরো। তা থেকে লুইস লিকি, জন নেপিয়ার এবং ফিলিপ টোবিয়াস একে হোমো গণের সভ্য বলে মনে করেন। দেহের আকারে এবং মস্তিষ্কের মাপে এরা অস্ট্রালোপিথেকাস গোষ্ঠীর তুলনায় বড়ো কিন্তু অন্যান্য হোমো গোষ্ঠীর তুলনায়

ছোট।

কেনিয়ার তুরকানা হ্রদের কাছে কুবিফোরায় রিচার্ড লিকি (জন্ম ১৯৪৪) খুঁজে পেয়েছিলেন এর জীবা(ম। বর্তমানে তা 'ইআর-১৪৭০' নামে সুপরিচিত। মস্তিষ্কের মাপ দাঁড়িয়েছিল ৭৭০-৭৭৫ ঘনসেমি।

নৃবিজ্ঞানী *আর্থার কীথ* (১৮৬৬-১৯৫৫ খৃঃ)-এর পরিভাষায় মস্তিষ্কের আয়তন ৭৫০ ঘনসেমি থেকে বেশি না হলে হোমো দলের অন্তর্ভুক্ত(হয় না। রিচার্ডের মতে এই ফসিলের বয়স ২৯ ল(বছর। হ্যাবিলিস প্রজাতির ফসিল পাওয়া গিয়েছে তানজানিয়ার ওলডুভাই, কুবিফোরা এবং ইথিয়োপিয়ার ওমো অঞ্চলে। যতদূর বোঝা গিয়েছে এই প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছিল ৩০ ল(বছর আগে আর ১০ ল(বছর আগে তারা লুপ্ত হয়ে যায়।

হোমো গণের পরের প্রজাতি হোমো ইরেকটাস। এই দলে পড়ে ডাচ বিজ্ঞানী *ডাঃ ইউজিন দুবোয়া*-র (১৮৫৮-১৯৪০ খৃঃ) জাভা মানুষ (Pithecanthropus)। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩র মধ্যে জাভার কেদুং ব্রুবাস, ত্রিনিল থেকে চোয়ালের হাড়, দাঁত, খুলি এবং পায়ের হাড় খুঁজে পান। এরা খাড়া হয়ে চলতে স(ম ছিল। মস্তিষ্কের মাপ ৮৮৫ সিসি। ডাঃ দুবোয়ার ধারণা হয়েছিল যে তিনি হেকেল-বর্ণিত এপ আর মানুষের মধ্যবর্তী ধাপ মিসিং লিঙ্ক আবিষ্কার করেছেন। পরে ফসিল মেলে সোলো সাঙ্গিরান থেকেও।

চিনে একই রকমের ফসিল আবিষ্কৃত হয়। ১৯২১ সালে পিকিং থেকে অল্প দূরে চৌকৌতিয়েন গ্রামের এক পরিত্যক্ত(চুনাপাথরের খনি থেকে **অটো জাদানস্কি** দুটি দাঁত পান। পরে আরো দাঁত, চোয়ালের হাড় এবং তারপর প্রায় সম্পূর্ণ মাথার খুলি পাওয়া যায়। *ডেভিডসন ব্ল্যাক* (১৮৮৪-১৯৩৪ খৃঃ), **বার্গির বোহলিন**, ডব্লু সি পেই (১৯০৪-১৯৮২) আরো ফসিল উদ্ধার করেন। ১৯২৯ সালে ঘোষণা করা হয় পিকিং মানুষের (Sinanthropus) কথা। দুর্ভাগ্যক্র(মে দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের সময়ে চিন থেকে জীবা(মগুলি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার পথে সেসব লুপ্ত হয়ে যায়। শুধু ফ্রানজ ওয়াইডেনরিখ (১৮৭৩-১৯৪৮) যে সকল প্লাস্টার কাস্ট এবং ছবি তুলেছিলেন তা র(ে হয়। যুদ্ধের পরে পিকিং ম্যানের আরো জীবা(ম আবিষ্কৃত হয়েছে চৌকৌতিয়েন, লানতিয়েন, কিয়ানজি তেঙসি থেকে ।

হোমো ইরেকটাস প্রজাতির আদিমতম জীবা(ম পাওয়া গিয়েছে পূর্ব আফ্রিকার ওলডুভাই, কুবিফোরা, ওমো আর উত্তর আফ্রিকার সালে ও তার্নিফিনে এলাকায়। সম্ভবত আফ্রিকার এই সকল অঞ্চলে প্রাচীন মানবদলটির উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে ২০ ল(বছর আগে। তারপর কোন অজানা কারণে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল

ইউরোপ-এশিয়ায়। ৫ ল(বছর আগে অবলুপ্ত হয়ে যায়। এরা অনেকটা মানুষের মতোই হয়েছিল যদিও আকারে একটু ছোট। মস্তিষ্কের মাপ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮০০-১১০০ ঘনসেমি। ফসিল পাওয়া গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে – ইন্দোনেশিয়া চিন ছাড়া ইউরোপের হাইডেলবার্গ, ত্রি(স আরটারন, তোরা আমতা, ভারটেজোলোস, তোরালবা/আমব্রোনা(মধ্য প্রাচ্যের লাতামনে, পেত্রালোনা এলাকায়।

এরপর আবির্ভাব হয় যথার্থ মানুষ ও তার পূর্বপু(ষদের। প্রায় ১ ল(বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল হোমো গণের এই স্যাপিয়েন্স প্রজাতি। এদের মধ্যেও তিনটি উপপ্রজাতির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এদের চিহ্নি(ত করা হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্স নিয়ানডার্থালিস, আর্কেইক হোমো স্যাপিয়েন্স এবং হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স নামে। মানুষের পূর্বপু(ষ খুঁজতে বসে মানুষ প্রথমে নিয়ানডার্থাল জীবা(ম আবিষ্কার করেছিল। ১৮২০ সালে জার্মানীতে এবং ১৮৫২ সালে ফ্রান্সে যে জীবা(ম পাওয়া গিয়েছিল তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে কাজে আসেনি। ১৮৪৮ সালে জিব্রালতারে একটি মেয়ের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। পরে তা নিয়ানডার্থাল খুলি বলে

চিত্র-২৩। লেটোলিতে প্রাপ্ত হোমিনিডদের পায়ের ছাপ। দুপায়ে চলার আদি স্বা(র।

সনাক্ত(হয়েছে।

প্রথম নিয়াডার্থাল আবিষ্কার হয় জার্মানীর ডুসেল নদীর নিয়ানদার উপত্যকা থেকে। ১৮৫৬ সালে। তা থেকে নামকরণ হয়। প্রথম পরী(া করেন বনের অধ্যাপক স্কাফহাউসেন। জীবা(ম মেলে বেলজিয়ামের লানলেত গুহা এবং নামুরে, ফ্রান্সের লা-চ্যাপেল-অ-সেন্তসে, লা-ফেরাসি এবং লা-কুইনা থেকে। ফ্রান্সের *মার্সেলিন বুল* (১৮৬১-১৯৪২ খৃঃ) এবং *গ্রাফটন এলিয়ট স্মিথ* (১৮৭১-১৯৩৭ খৃঃ) এদের এপম্যান বলে রায় দিয়েছিলেন। নিয়ানডার্থালদের নাকি অবিকল মানুষদের মত দেখতে হয়েছিল। মাথার খুলির মাপ নিয়ে দেখা গেল তা অবি(াস্য রকমের বড়ো — ১৫৪০ ঘনসেমি আয়তনের। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কের সমান আয়তনের প্রায়। দেহাকৃতি দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। এরা নিঃসন্দেহে মানুষের মতো দু পায়ে খাঁড়া হয়ে হাঁটতে পারত। তবে পুরো মানুষের মত হাঁটা হত না। মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে চলাফেরা করতে হত। ১৯৫৫-৫৭ সালে আরামবুর্গ, স্ট্রাউস এবং কেভ এদের মানুষের মতো বলে মন্তব্য করেন।

নিয়ানডার্থালরা পৃথিবীতে এসেছিল ১,৩০,০০০ বছর আগে। মাত্র ৩৫,০০০ বছর আগে তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এরা ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে। নিয়ানডার্থালদের জীবা(ম পাওয়া গিয়েছিল বেলজিয়ামের গ্রট-দ্য-স্পাই, যুগোস্লাভিয়ার ত্র(াপিনা রকশেলটার, ফ্রান্সের পূর্বে উল্লিখিত জায়গা ছাড়াও লা মুস্তেরিয়ায়, আর স্পেন, ইটালি, উত্তর আফ্রিকার জেবেল ইরহুদ (মরক্কো) আর হাওয়া ফতিয়াতে (লিবিয়া), মধ্য প্রচ্যের শানিদার (ইরাক) ও আমুদে (ইস্রাইল)। মুস্তেরিয়া এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল নিয়ানডার্থালদের বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। ১৮৬০ সালে।

আর্কেইক হোমো স্যাপিয়েনস প্রজাতির জীবা(ম পাওয়া গিয়েছে ইউরোপের সোয়ানকম্ব্, স্টাইনহাইমে এবং আফ্রিকার ওমো, হাদার, ওলডুভাই, ব্রোকেনহিল এলাকায়। পাওয়া গিয়েছে জাভা ও চিনে। ৩০,০০০ বছর আগে এই উপপ্রজাতির মানুষেরা অবলুপ্ত হয়ে যায়।

১৯৭৭-৭৮ সালে মেরি লিকি, ফিলিপ লিকি এবং **অ্যানড্রু হিল** আফ্রিকার লেটোলিতে আবিষ্কার করেন কয়েক ল(বছর আগেকার মানুষের পায়ের ছাপ। কি আশ্চর্যজনক সেই চরণরেখা যা ল(বছরের প্রকৃতির উথালপাথাল সহ্য করেও মুছে যায় নি। আগ্নেয়গিরি থেকে ওঠা ছাই এসে পড়েছিল সদ্যচলা দুটি মানুষী চরণচিহ্নে(। প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে এরপরে নামল বৃষ্টি। ছাই জমে উঠল সিমেন্টের মত কঠিন হয়ে। যেন আমাদের কাছে সে খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই আয়োজন হয়েছিল। ছাই পরী(া করে বয়স মাপা হয়েছে ৩৬-৩৭ ল(বছর।

পায়ের ছাপ থেকে মনে হয় একজন পূর্ণবয়স্ক না-মানুষের পাশে পাশে এক নবীন কিশোরের পথচলা। তারা ধরিত্রীর কাঁপুনির ভয়ে পালিয়ে আশ্বর(া করছিল নাকি না-মানুষটি তার সন্ততিকে জগতে জীবনধারণের কৌশল শেখাচ্ছিল কে জানে। যেটা জ(রী কথা তা হল — মানুষ তবে দাঁড়াতে শিখল কবে? মানুষ না হয়েই? নাকি আরো অনেক আগে?

আমাদের যথার্থ পূর্বপু(ষ হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস-দের দেখা মেলে ফ্রান্সের ত্রে(াম্যাগনন, ফঁতেশভ্যাঁ, সঁস্যা, দ(িণ ইতালির গ্রিমালডি অঞ্চলে।

১৮৬৮ সালে দ(িণ ফ্রান্সের ত্রে(াম্যাগনন গ্রামের কাছে **লুই লার্তে** (১৮৪০-১৮৯৯) ৫টি মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। এদের মধ্যে একজন বৃদ্ধের কঙ্কাল ছিল প্রায় অবিকৃত অবস্থায়। এছাড়া একজন অথবা দুজন পু(ষ ছিল, একজন নারী এবং দুই কি তিন সপ্তাহের মানবশিশু। দীর্ঘকায়, বলশালী, পাতলা টিকলো নাক — সব মিলিয়ে আধুনিক মানুষ। পরে অবশ্য আরো কঙ্কাল পাওয়া যায়। মধ্য ও দ(িণ ইউরোপে এই সকল মানুষেরা ৩০,০০০ বছর আগে বসবাস করত। এদের নাম রাখা হয়েছে ত্রে(াম্যাগনন (Cromagnon Man) মানুষ। এরা আমাদের যথার্থ পূর্বপু(ষ — হোমো স্যাপিয়েনস স্যাপিয়েনস প্রজাতির অংশ।

ত্রে(াম্যাগনন মানুষের উচ্চতা হবে গড়পড়তা ১৭৭-১৯৩ সেমি। মস্তিষ্কের মাপ ১৫৯০-১৭৫০ ঘনসেমি। ফিলিপ লিবারম্যান এবং এডমণ্ড ত্রে(লিন এদের কণ্ঠ, নাসিকার ফ্যারিনকস এবং জিহ্বা পরী(া করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এরা বেশ ভালোমতোই কথা বলতে স(ম ছিল। ত্রে(াম্যাগনন মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও শিল্পকীর্তি আমাদের বেশি আকৃষ্ট করে। এদের যন্ত্র-কৃষ্টি অরিগন্যাসিয়ান ( ) স্টাইলের। ১৮৬০ সাল নাগাদ ফ্রান্সের অরিনাঁর কাছে এক গুহায় এদুয়ার্দ লার্তে (১৮০১-১৮৭১) মানুষের নানা ব্যবহৃত জিনিস খুঁজে পান। যেমন পাথরের অস্ত্র, হাড়-বলগা হরিণের শিং-হাতির দাঁতের জিনিস, হাড়ের ও ঝিনুকের গহনা ইত্যাদি। এ সব দ্রব্যের ব্যবহারকারীদের তখন রেইনডিয়ার ম্যান (Reindeer Man) নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে স্পেনের আলতামিরা গুহায় খুঁজে পাওয়া যায় ১৮টি বাইসনের আঁকা অপূর্ব ছবি। স্পেনের ডন মার্সেলিনো দ্য সাউতোলো (১৮৩১-১৮৮৮) চমৎকৃত হয়েছিলেন তাঁর বারো বছরের কন্যা মারিয়ার আবিষ্কার দেখে। এরকম অনেক গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে — ফ্রান্সে দর্দোঁর কাছে লা-মুথ গ্রামের এক গুহায়, লাস্ক গুহায়, সলুত্রে গুহায়।

তো এই ভাবে আমাদের পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাইমেট থেকে হোমিনিড হয়েছিল। তারপর অস্ট্রালোপিথেকাস-হোমো গণ হয়ে মানুষ হল। সঠিক

পর্যায়ত্র(ম নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। হোমিনিড থেকে মানুষের আবির্ভাবের (ে ত্রে অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেনসিস থেকেই হয়তো মানুষের ধারা পৃথক হয়ে হোমো গণের উদয় হয়েছে। অন্য ধারায় আফ্রিকানাস রোবাস্টাস ইত্যাদিরা এসেছিল। হোমো গণের বেলায় হ্যাবিলিস-ইরেকটাস হয়ে তারপর যে স্যাপিয়েনসদের উদ্ভব হয়েছিল তা নিয়ে মতবিরোধ কম। সব মিলিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল পূর্বতন নিম্নতর জীব থেকে এ কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

মাইটোকনড্রিয়া জীবকোষের শক্তি(সরবরাহ কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস। এর ৩৭টি জিনের ধারা অবিকৃত রয়ে গিয়েছে সমস্ত জীবে। প্রাণীদের মাইটোকনড্রিয়া আসে মায়ের সূত্রে। ১৯৮৫ সাল থেকে জীবকোষের শক্তি(কেন্দ্র মাইটোকনড্রিয়ার জিন বৈচিত্র্য বি(ে-ষণ করে অনেক নতুন তথ্য জানা হয়েছে। বিশেষ করে প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার সুবিধা হয়েছে।

দেখা গিয়েছে যে আদিম আফ্রিকায় মানুষের বসবাস ছিল দীর্ঘতম কাল জুড়ে। আধুনিক মানুষের আবির্ভাব কাল সম্ভবত ১,৪০,০০০ থেকে ২,৯০,০০০ বছর আগে এবং আফ্রিকায়। ৯০,০০০ থেকে ১,৮০,০০০ বছর আগে তারা আফ্রিকা ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছিল। ইউরোপে পৌঁছেছে ৫৫,০০০-২৮,০০০ বছর আগে, এশিয়ায় ৫৩,০০০ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৩৩,০০০ বছর আগে। এটা এক ধরনের হিসেব মতো। আরো নানাধরণের হিসেবনিকেশ আছে। এসব নিয়ে গবেষণা করেছেন **মার্ক স্টোনকিং**, **মাইকেল হামার**, **ডগলাস ওয়ালেস** প্রমুখ কয়েকজন। সময়ের হেরফের কিছু হলেও মানুষের আবির্ভাব যে আফ্রিকায় এবং তা ১,৩০,০০০-২,৯০,০০০ বছরের মধ্যে কোন এক সময়ে, তা নিয়ে বেশি দুর্ভাবনা নেই।

মানুষসৃষ্টির জন্য একজোড়া মানব-মানবী আদম-ঈভের খোঁজ করা বৃথা। পরম শুভদিনে পরম শুভলগ্নে কোন মানব-মানবীর সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের কেউ সৃষ্টি করে নি। তার বদলে আমরা খুঁজে পাই মানুষ ও বনমানুষদের পূর্বপু(ষদের। সেখান থেকে একটু একটু করে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেছে মানুষের পূর্বসূরিরা। একদল মানুষেরা। চারপেয়ে জীব থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখা, হাঁটতে শেখা, অস্ত্র বানাতে শেখা, কথা বলা ও ভাষা তৈরী করা। পাথর খুদে খুদে তারা অস্ত্র বানিয়েছে, যন্ত্র বানানো শিখেছে। বানাতে বানাতে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ হয়েছে। ত্র(মশ মানুষ হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে ওঠা। কই কোন ঐশীশক্তি(তাদের একদিনে হাঁটতে শেখাল না। ভাষা যোগাল না।

বিবর্তন এক আশ্চর্য প্রত্রি(য়া। এক প্রজাতির একদল প্রাণীর মধ্যেও থাকে না কোন নিখুঁত মিল। পার্থক্য থাকবে, বৈচিত্র্য থাকবে। এদের মধ্যে জীবনধারণের উপকরণ

নিয়ে টানাপোড়েন থাকবে। জীবনসংগ্রাম চলবে। এদিকে স্থির থাকবে না কোন একটি পরিবেশ। তারও বদল হবে। আর এই পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে যারা তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তারা বাঁচে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। তাল মিলিয়ে চলতে গেলে জীবদেহের মধ্যে কোন কোন পরিবর্তন উপযোগী হয়। জীবকোষের জিনসজ্জা আপন কি নিয়মে বেমক্কা বদলে যায় তার সব হদিশ মেলে নি। বদল যে হয়, সেকথাটা বোঝা যাচ্ছে। আর এই বদলাতে বদলাতে একদিন পৃথিবীতে এসে গিয়েছিল বুদ্ধিমান মানুষের দল।

মানুষ আবির্ভূত হল কালের এক পর্যায়ে না-মানুষ প্রাণীদের বিবর্তন থেকে। প্রাণ গড়ে উঠেছিল তার আগে জৈব-রাসায়নিক প্রত্রি(য়ায় – পৃথিবীতে জড় বস্তু থেকে। গ্রহান্তরে জৈবরসায়ন ছিল – কোষাণু-কোষ তথা প্রাণ ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। গ্রহ জন্মাল, গ্রহরাশি জন্মাল, সূর্য জন্মাল আগের ন(ত্রের পুড়ে যাওয়া ছাই আর বি(েজগতের প্রথম মৌলিক জড় উপাদান থেকে। আরো আগে জন্ম হয়েছিল নীহারিকার, তারামণ্ডলের। কবেকার ন(ত্রমালার। আমরা সে সব আজ একটু একটু জানি বই কি! কতদিন আগে তারা একে একে জন্মেছিল তাও একটু আধটু জানি। যা একেবারেই জানি না তা হল শু(টা কেমন করে শু(হয়েছিল।

আমরা (দ্র মনুষ্য। এই মহাবি(ে আছে বলেই ঈ(ের আছেন, এমন ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকি। হিসেব মেলাতে বসে এ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না।

৫। উপসংহার

ভূমিকায় ঈশ্বরকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন ছিল – ঈশ্বর সত্যিই আছেন কি না।

তিনি কি এক ও অদ্বিতীয় রূপে আছেন নাকি দেশকালভেদে বহু হয়ে আছেন?

তিনি কি কোন এক ধর্মের ঈশ্বর হয়ে আছেন?

কি তাঁর স্বরূপ?

তাঁর সঙ্গে কি অনেক দেবদেবী আছেন?

আত্মা আছে? পরলোক আছে?

স্বর্গ-নরক আছে? কোথায় সেই পরলোক-স্বর্গ-নরক ?

সভ্যতার ঊষালগ্নে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ দেবতা হয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রার্থিত ফললাভের আশায় মানুষ অনেক নিয়ন্তা শক্তির কল্পনা করেছে এবং তাঁদের অর্চনা করেছে। সেই দেবতারা আজ আর নেই। সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা অঙ্কুরিত হলেও তা খুবই প্রাথমিক স্তরের ছিল।

দ্বিতীয় পর্বে আমরা প্রতিষ্ঠিত ধর্মভাবনায় এসে আরো দেবতা পেয়েছি। কোথাও নতুন দেবতা এসেছেন, কোথাও প্রাচীন দেবতার পুন(খান হয়েছে। কোথাও একজন, কোথাও একাধিক দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সর্বশক্তি মান কোন এক ঈশ্বরের খোঁজ করা হয়েছে। কখনো প্রথম থেকেই একজন পরমেশ্বরের আরাধনা করা হয়েছে। সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে বেদ-উপনিষদ-পুরাণে এবং বাইবেলে-কোরাণে। ধর্মভাবনার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়েছে দার্শনিক চিন্তাধারা। বিশ্বাসের সঙ্গে মিলেছে যুক্তি-তর্ক।

বিজ্ঞানচর্চা গতিময় হলে বস্তু এবং সৃষ্টিকে গভীরভাবে জানা সম্ভব হল। জানার চেষ্টা অবিরাম চলছে আজো। বিজ্ঞানে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। সৃষ্টি আছে। একদিন এই বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বিগব্যাং ধরণের কোন মহাবিস্ফোরণে অথবা অন্য কোনভাবে। একবার কোন প্রকারে বিশ্বজগৎ যদি সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে তবে তারপর জগতের বিবর্তিত হয়ে চলা প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্ভব। সেখানে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। বস্তুময় বিশ্ব থেকে তারামণ্ডল-ন'খ'ত্র-গ্রহ-উপগ্রহ হওয়া, অজৈব থেকে জৈব বস্তু এবং কালে কালে জীবাণু-উদ্ভিদ-প্রাণীকুল জন্মলাভ করা এ সব বস্তুগত নিয়মে হয়েছে আর তা ক্রমশ প্রমাণিত হয়ে চলেছে। শুধু প্রথমে বিশ্বের সৃষ্টি কি করে হল তা যতটা জানা সম্ভব হয়েছে তা অতি সামান্য।

অনেকে বলেন – ঈশ্বর আছেন বলেই তো জানি। বিপ'খে' অনেক তর্কযুক্তি আছে তাও কিছু কিছু জানি। ভালো করে অতশত জানি নে। আরো জানি

যে বেশ কয়েকজন মহাপু(ষ আছেন। যীশু-বুদ্ধ-মহম্মদ এরকম ধর্মপ্রবর্তক ছাড়া ঐতিহাসিক মহামানবদের কথা বলছি। তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে গভীর ভাবনাচিন্তা ও পঠনপাঠন করেছেন। কেউ কেউ নাকি ঈশ্বরদর্শনও করেছেন। দূরের মানুষ নন তাঁরা। তাঁরা কে কী বলেন?

হ্যাঁ, এরকম দুচারজনের কথা একটু জানতে পারলে সাধারণের মতামত গড়তে বেশ সুবিধা হয়। নব্য বাংলার মহামানব বলতে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কথা মনে হবেই। ঈশ্বরগতপ্রাণ ছিলেন শ্রীরামকৃষ(। তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতসভায় হিন্দুধর্মের কথা এবং গু(রামকৃষে(র কথা প্রচার করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নানাদিকে প্রসারিত। সেই আধুনিক ঋষির দুচারকথা শুনতে হয়। আরেকজন ঋষির কথাও স্মরণ করতে হয় – তিনি শ্রীঅরবিন্দ।

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় তথা ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২।৭৪-১৮৩৩)। ব্রাহ্মণ হলেও পারস্য ও আরব্য ভাষা শি'খ'া করেছিলেন। ইসলাম ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। আবার তিনি সংস্কৃত ও ঐ ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থসকলও অধ্যয়ন করেন। ষোল বছর বয়সে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বি(দ্ধে পুস্তক রচনা করেছিলেন। ইউরোপীয়দের অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখে তাঁদের সম্পর্কে যে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তিনি তা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন। বিধবা রমণীর সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ করতে তিনি প্রবলভাবে হস্ত'খে'প করেন। ফলে তাঁর প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের বিদ্বেষ পুন(দ্দীপিত হয়। তিনি অবশ্য বলেছেন – 'সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আত্র(মণ করি নাই। উক্ত(নামে এখন যে বিকৃত ধর্ম এ(ণে প্রচলিত তাহাই আমার আত্র(মণের বিষয় ছিল।'

রামমোহন নানা শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। এমন কি তিনি ইউক্লিড-এরিস্টটলের গ্রন্থও পড়েছিলেন। নানা শাস্ত্রপাঠ করে এবং আলোচনা করে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তার ফলে তিনি উদারপন্থী একজন একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন। মুসলমান মৌলবীদের সংস্পর্শে এসে একেশ্বরবাদের প্রতি আসক্তি(জন্মেছিল। আর কাশীতে সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চা করে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হন। সংস্কৃতশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান আর মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ এই দুটি ভাবনা তাঁর ধর্মীয় মতামত গঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পরে ইংরেজী শি'খ'া লাভ করে যীশুখৃস্টের ধর্মীয় শি'খ'ার প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। কিন্তু তিনি আদ্যন্ত ছিলেন সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বি(দ্ধে। তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম হিন্দু বা খৃস্টান উভয়ের

কাছে বিষবৎ ছিল। উভয়ের দ্বারা তিনি নির্যাতিত হয়েছেন। সতীদাহ প্রথার বি(দ্ধে প্রবলভাবে (খে দাঁড়িয়েছিলেন। সহমরণ প্রথা তার ফলে নিষিদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ হয় গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জনের মতো প্রথাও। শি'খ্খা'বিস্তারে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। সমাজসংস্কারক হিসেবে তাঁর অনন্য ভূমিকা। কালে তিনি হয়ে পড়েছিলেন যেন এক নিঃসঙ্গ যোদ্ধা। সুদূর ব্রিটেনে তাঁর জীবনাবসান সেই নিঃসঙ্গতারই প্রতীক।

কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি আত্মীয়সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে বেদপাঠ হত। ব্রহ্মসঙ্গীত হত। কয়েকবছর পরে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইউনিটেরিয়ান খৃস্টান মতে ঈশ্বর উপাসনা হত। কিছুদিন রামমোহন সেই সভায় যাতায়ত করেন এবং খৃস্টধর্ম উপাসনা সম্পর্কে অবহিত হন। সকল ধর্ম যাচাই করে অবশেষে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মধর্ম। ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ। কি হত সেই ধর্মের উপাসনায়? সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় উপাসনাগৃহে সকলে সমবেত হতেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ-উপনিষদ পাঠ হত। বৈদিক (্লাকের ব্যাখ্যা হত। সবশেষে হত সঙ্গীত। আসলে এ ছিল উপনিষদের অদ্বৈত ভাবনার উপর ভিত্তি করে মানবধর্মের এক সাধনা।

ব্রাহ্মসমাজের উপাস্য দেবতা হল — ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনাদি-অনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমে(ের। তাঁর কথা আমরা উপনিষদে জেনেছি। অর্চনা হত এক ঈ(ের। আর কোন দেবতা নয়। সে ব্রহ্মের কোন আকার হয় না। তিনি নিরাকার, তিনি অরূপ। যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উপাসনা করতে পারেন। জাতি ধর্ম সম্প্রদায় সামাজিক পদ এ সবের বিচার করা হবে না। ঈশ্বর উপাসনায় সকলের সমান অধিকার। উপাসনার জন্য কোন ছবি প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি নেই। নৈবদ্য-বলিদান জাতীয় কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নেই। প্রাণীহিংসা হবে না। কোন প্রকার আহার পান হতে পারবে না। কোন জীব বা পদার্থ যদি কোন মানুষ বা সম্প্রদায়ের উপাস্য হয়, তবে সমাজের বক্ত্তার মধ্যে বা সঙ্গীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সঙ্গে তা উল্লিখিত হতে পারবে না। জগত-স্রষ্টা পরমে(ের ধ্যান-ধারণার উন্নতিকল্পে, প্রেম-দয়া-নীতি-ভক্তিসাধুতার উন্নতিতে এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্যবন্ধনে উপদেশ, প্রার্থনা, বক্ত্(তা ও সঙ্গীত হত এই সকল ব্রহ্ম উপাসনায়।

প্রচলিত আচার-সর্বস্ব হিন্দুপ্রথার বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এই ধর্ম। হিন্দুধর্মে নিরাকার-সাকার-শৈব-শাক্ত-বৈষ(ব-তান্ত্রিক নানা প্রকার পূজার্চনা ছিল এবং আছে। তার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা প্রতিষ্ঠা করা ছিল ব্রাহ্মধর্মের মূলকথা। মহাত্মা রামমোহন এই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেছেন। নানা ধর্ম থেকে কিছু ভাবনা ও আচরণ চয়ন করেছেন দেশাতীত বিশ্বধর্মের রূপকল্পে।

তিনি ঈশ্বর দর্শন করেন নি। কিন্তু জগতের জন্য একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তার

আছেন তা উপলব্ধি করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ঈশ্বরগতপ্রাণ মহামানব ছিলেন শ্রীরামকৃষ(পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬ খৃঃ)। তিনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন? তিনি কি ঈশ্বরের অবতার? ভক্ত-অনুগামীরা বলেন তিনি সা'খ্খা'ৎ অবতার ছিলেন। অন্যরা বলেন তিনি ঈশ্বর-দর্শন করেছিলেন।

গ্রাম্য কিশোর গদাধরের স্কুলের লেখাপড়া নয়, সাধুসঙ্গ করাই পছন্দ ছিল। গ্রামবাংলার যাত্রাগান পালাগান তাঁর ভাণ্ডারে অনেক রসদ যুগিয়েছে। দ'খি'ণেশ্বর কালীবাড়িতে দেবী ভবতারিণীর পূজা করতে করতে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা চলতে থাকে। মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে ভাবে বিভোর হয়ে 'মা দেখা দে' বলে প্রার্থনা জানাতে ও কাঁদতে দেখা যেত। তখনকার আকুলতার কথা পরে তিনি স্বামী সারদানন্দদের কাছে বলেছিলেন — 'মার দেখা বোধ হয় পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবন আবশ্যক নাই। মার ঘরে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে যে কি হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সা(াৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।' অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধির জন্য বাস্তব জগতের ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। আকুল ভাবনাই যথেষ্ট।

তীব্র ভক্তির আকুতিতে তাঁর ভয়ানক শারীরিক কষ্ট হত। অনিদ্রা গাত্রদাহ হত। বায়ুরোগগ্রস্ত মনে করে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসাও হয়েছিল। বারো বছর ধরে তাঁর সাধনা ব্যাপ্ত ছিল। তারই মধ্যে তিনবার শারীরিক বিকার দেখা দেয়। অবশেষে দুরারোগ্য গলার ক্যান্সারে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। ঈশ্বরের অবতার কিংবা ঐশী 'খ'মতাসম্পন্ন মানবের প'খ' এমনটা হওয়া অনুচিত ছিল, তা ভক্তরা যে ব্যাখ্যাই তুলে ধ(ন না কেন। মহামানব যীশুও পারেন নি নিজেকে র'খ'া করতে। তবুও তাঁরা মহামানব। অবতার না হলেও মহামানব কেননা মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়ে গিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়।

রামকৃষ(হিন্দুধর্ম ছাড়াও পীর ও খৃস্টের ভজনা করেছেন। তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন, ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে লোকশি'খ'ার আশ্চর্য কৃতিত্ব তৎকালীন অনেক মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিল। যেমন কেশব সেন, গিরীশ ঘোষ,

মহেন্দ্রলাল সরকার। বঙ্কিমচন্দ্রও একবার এসেছিলেন তাঁর কাছে। আজো সেই সরল হাস্যময় দরদী মানুষটি প্রবলভাবে আকর্ষণীয়। তাঁর মানবপ্রেম, পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা দুর্লভ। 'ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য।' তিনি সেই ঈশ্বরের যে প্রকার সাধনা করেছেন আর কোন সাধক তা করেন নি।

হিন্দু ধর্মই শ্রেষ্ঠ বাকী সব মিথ্যা – এমন কথা তিনি বলেন নি। সকল ধর্মই এক। সকল ঈশ্বরই এক। তাঁদের শুধু নামে তফাৎ। তাঁর অন্যতম উপলব্ধি – 'যত মত তত পথ।' আল্লা গড ব্রহ্ম কালী রাম হরি যীশু সব এক। আসলে স্রষ্টা একজনই।

'জ্ঞানীরা যাকে ব্রাহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তে(রা তাঁকেই ভগবান বলে। ... ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না(তিনি যে ব্যক্তি(তাও বলবার যো নাই। ... বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জীবজগৎ এ সব শক্তি(র খেলা। বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ(ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু(শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু। ... ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।... আদ্যাশক্তি লীলাময়ী(সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! ... একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ। ... তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ গড(কেউ বলছে ব্রহ্ম(কেউ কালী(কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।'

তিনটি পথ আছে। জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ আর ভক্তি(র পথ। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত একনিষ্ঠ ভক্ত। আকুল প্রার্থনা জানাতেন আরাধ্যাদেবীর কাছে – 'মা আমি জ্ঞান চাই না(এই নাও তোমার জ্ঞান(এই নাও তোমার অজ্ঞান(মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও।'

ঈশ্বর হয়তো নিরাকার হবেন। কিন্তু সাকার পূজায় তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি। 'এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস সেইটিই ধরে থাকবে।'

অন্যত্র বলেছেন – 'তুমি মাটির প্রতিমাপূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎ তিনিই এসব করেছেন – অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেছেন।'

সাকার-নিরাকার প্রশ্নে তিনি আরো বলেন – 'তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের প'খে' তিনি নিরাকার। ... জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা

যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই আর নাই। তাঁর আমি আর খুঁজে পান না।'

ঈশ্বর কি ব্যক্তি ?

ব্যক্তি কি না তা বলেন নি। বলেছেন যে জ্ঞান হলে ঈশ্বর ব্যক্তি কি না সে বোধ থাকে না কেননা বোধী তখন বোধহীন হয়ে যায়। অথচ ব্যক্তি বা দেহী হলেই তো তাঁর দর্শন হতে পারে। তিনি যদি শক্তি হন, তবে কি তাঁর দর্শন হয়? হয় না। শক্তি বড় জোর অনুভব করা যেতে পারে। আর অনুভবের আওতায় ভাবনাই প্রবল। বাস্তবতা ভাবনার ভিত্তির জন্য আবশ্যিক, পল্লবিত ভাবনার জন্য নয়।

ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় কি না মানুষের এই প্রশ্নে চিরন্তন। এর উত্তরে তিনি বলেছেন – 'হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস(তাঁর নাম গুণগান, বস্তুবিচার। এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়। ... খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ... ডাকার মত ডাকতে হয়। ... ব্যাকুলতা হলেই অ(ণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।'

দর্শন মানে কি মনশ্চ'খে' দর্শন?

তা যদি হয়, তবে ব্যাকুল ভাবনা তাঁর দর্শন করাতে পারে। মনোবিজ্ঞান সেরকমই বলে। ঈশ্বরদর্শন সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন – 'হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না।'

বলেছেন – 'ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়(যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্যি বলছি দর্শন হয়।'

সত্যিই কি তাঁর দর্শন হয়? তাঁর ব্যাকুল ভক্তরা দর্শন করেছেন?

ঈশ্বর লাভ করলে ব্যক্তির কি পরিবর্তন হয়? 'ঈশ্বরলাভ হলে ল'খ'ণ এই যে সে ব্যক্তি(খড়ো নারিকেলের মত হয়ে যায় – দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, সে ব্যক্তি(দেহের সুখ চায় না। ... যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে।'

কেন ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না? কারণ মায়া। 'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। ... যদি ঈশ্বরের কৃপায় আমি অকর্তা এই বোধ হয়ে গেল তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবমুক্ত হয়ে গেল। ... যদি গু(র কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।' অবশ্য 'কলিযুগে অন্নগত প্রাণ – দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের প'খে' ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ

করবে, কোন সন্দেহ নাই।'

'যারা বেদান্ত করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান? হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন।'

'অনন্ত পথ – তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি - যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। ... যোগ তিন প্রকার – জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ। ... কর্মযোগ বড় কঠিন ... জ্ঞানযোগও - এ যুগে ভারী কঠিন। ... কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযুগই যুগধর্ম।'

সেই সময়ের আরেকজন মহাপুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিন রামকৃষ্ণদেব উদ্যোগী হয়ে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে বললেন – 'আজ সাগরে এসে মিললাম'। সকৌতুকে রসসাগর বলেছিলেন – 'তবে নোনাজল খানিকটা খেয়ে যান।'

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা বলেছিলেন – বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁকে সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন। ব্রহ্ম কি তা নিয়েও কথা বলেছিলেন। গান গেয়েছিলেন। যাওয়ার সময় রাসমণির বাগানে যাওয়ার নিমন্ত্রণও করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনদিনই রামকৃষ্ণের কাছে যান নি। অথচ তিনি নাস্তিক ছিলেন না।

ব্যাপারটা রামকৃষ্ণের মনে ছিল। মহেন্দ্রনাথকে অনুযোগ করে বলেছিলেন – 'বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? .. সেদিন বললে এখানে আসবে কিন্তু এল না।' আরেকবার তাঁর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছেন – 'পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই।' রামকৃষ্ণের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই অনাগ্রহী হওয়া একটু আশ্চর্যজনক।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশপ্রাপ্ত প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২খৃঃ)। রামকৃষ্ণ-মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনায় আজ রামকৃষ্ণের বাণী দেশেবিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। গুরুর মতো তিনি বাল্যকালে একান্ত ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না বটে তবে মাতৃভক্ত ছিলেন এবং পরম আরাধ্যা মায়ের ঈশ্বরভক্তিও ছিল।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত মেধাবী ছিলেন এবং ছাত্রবয়সে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। মনঃসংযমের জন্য সহজে ধ্যানস্থ হতে পারতেন। কলেজ জীবনে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে তাঁর জ্ঞানের খিদে বেড়ে যায়। সত্যলাভের তীব্র আগ্রহ জন্মে। ধর্ম জিজ্ঞাসায় উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। সুবক্তা কেশবচন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করেন। মহর্ষির পরামর্শে ব্রহ্মচর্য পালন করতেও শুরু করেছিলেন। ক্রমশ বুঝলেন যে একজন সৎগুরু না হলে তাঁর

সাধনা সফল হবে না।

১৮৮০ সালে তাঁর সঙ্গে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো। চরিতকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন যে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে তিনি আপনভোলা রামকৃষ্ণের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিন বছর ধরে অনেক সংশয়ের নিরসন ও ভাব বিনিময়ের পরে তিনি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। বিবেকানন্দের সহজাত জ্ঞানতৃষ্ণা এবং ব্রাহ্মসংসর্গের পরে এই অসংস্কৃত গ্রাম্য মানুষের সংস্পর্শে এসে রূপান্তর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন – 'তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি! তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মতো যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাবো।'

এ কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ নাকি জলে ভরে উঠেছিল। ভাবপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। সহসা পরমহংস কৃতাঞ্জলি হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন – 'আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি, নররূপী নারায়ণ জীবের কল্যাণ কামনায় দেহধারণ করিয়াছ।' এমন উচ্চ প্রশংসায় নরেন্দ্রনাথের বিহ্বলতা অনুমান করা যায়।

ঠাকুরের অপূর্ব তাগ, শিশুর মতো অভিমানশূন্য সরল ব্যবহার, বিনয়-নম্র মধুর বাক্য, সর্বোপরি রহস্যময় নিষ্কাম ভালোবাসা – এ সব নরেন্দ্রনাথকে আপ্লুত করেছিল। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের নিরাকার ব্রহ্মের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাননি। ব্রাহ্মসমাজে যোগাযোগে নিষেধ করেন নি। বরংচ নরেন্দ্রনাথকে নিজের কাছে টেনে আনার জন্য তিনি তাঁকে সময় দিয়েছেন তৈরী হওয়ার জন্য। তিনি বুঝেছিলেন এই যুবকটি আর পাঁচটা যুবকের থেকে একেবারে আলাদা। তাঁর তুমুল প্রশংসা করে বলতেন – 'নরেনের মধ্যে আঠারোটা কেশব সেনের শক্তি আছে।'

ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতায় একদিন নরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন – 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?'

মহর্ষি হ্যাঁ বলতে পারেন নি।

একই প্রশ্ন তিনি রামকৃষ্ণকে করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন – 'বৎস! আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে দেখিয়াছি।'

আরো বলেছেন – 'তোমাকেও দেখাইতে পারি, যদি তুমি আমি যাহা বলি তদ্রূপ আচরণ কর।' এই গভীর প্রত্যয় গুরুর প্রতি আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

একদিন রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের জন্যই ব্রাহ্মসমাজে যান। সেদিন ঠাকুরের

প্রতি ব্রাহ্মসমাজের কর্তাদের শিষ্টাচারের অভাব ঘটেছিল। তা দেখে নরেন্দ্রনাথ মর্মান্তিক আঘাত পান। তারপর থেকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে দ'খি'ণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই পৌঁছে যান।

একদিন রামকৃষ(দেব আসন থেকে উঠে নরেন্দ্রনাথের কাঁধের উপর তাঁর ডান পাখানি রাখলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন – 'সহসা তাঁহার (নরেন্দ্রনাথের) অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার আশেপাশের দৃশ্যমান পদার্থনিচয় এক অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে(... ঠাকুর তাঁহার ব'খে' হস্তার্পণ করিবামাত্র তিনি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেখেন, অদ্ভুত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন।'

ভাবের ঘোর কাটলে নরেন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে বসেন – এ কি হিপনোটিজম?

পিতৃবিয়োগের পরে সাংসারিক যাতনায় উদ্বিগ্ন নরেন্দ্রনাথের সংসারত্যাগের ইচ্ছা হয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ(তখনকার মতো তাঁকে নিরস্ত করেন। দেবতার কৃপায় সাংসারিক কিছু সুবিধা হতে পারে মা-ভাইবোনদের দুটি খাওয়াপড়ার উপায় হতে পারে – এই ভেবে নরেন্দ্রনাথ একদিন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে – দেবীর কাছে যদি তিনি নরেনের হয়ে কিছু সুবিধে করে দেওয়ার কথা বলেন। রামকৃষ(তার উত্তরে বলেন – 'ওরে, আমি কোনদিন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবে তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, সেজন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।'

তারপর বললেন – 'আচ্ছা আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।'

সেদিন রাত এক প্রহরে সংশয়ান্বিত যুবক নরেন্দ্রনাথ কালীঘরে গেলেন। এ কালের এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক লিখেছেন – জ্ঞানমার্গী নবীন ভারত এগোতে লাগল ভক্তিবাদের উদ্দেশে। যুক্তি আত্মসমর্পণ করতে চলেছে বিশ্বাসের কাছে। অলৌকিক উপলব্ধির জন্য এক তীব্র আকূতি মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে বিচারবোধ।

কি দেখলেন বা কি বুঝলেন তা তিনিই জানেন। দেখা গেল তিনি কেবল ভক্তি -বিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করলেন – 'মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও! যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই তোমাকে দেখিতে পাই মা!' ঠাকুরের নির্দেশে পরপর আরো দুবার তিনি মন্দিরে গেলেন কিন্তু সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করতে পারলেন না। ঠাকুর অবশেষে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর মা-ভাইদের মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। নরেন্দ্র সংসারসুখ ত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হলেন।

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণে(র কালীমাতা বা অন্য দেবদেবীর পূজার্চনা নিয়ে মাতামাতি করেন নি। গু(এবং গু(পত্নী ছিল তাঁর কাছে আরাধ্য দেবতা।

শ্রীরামকৃষ্ণে(র বাণী প্রচারের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেদান্তের কথা দেশেবিদেশে প্রচার করেছেন। আর যা করেছেন সবই ত্যাগী মানুষের মানবধর্ম। তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলেছেন। দেশের মুক্তি(র কথা ভেবেছেন। মানবমুক্তির কথা বলেছেন। পরোপকার করা তাঁর ধর্ম। দেশের কাজ করা তাঁর ল'খ্য'।

১৮৯৫ সালে স্বামী রামকৃষ(ানন্দকে লিখেছেন – 'ঘন্টানাড়া সন্ন্যাসীর নহে ... আমি আজ যে ৬ বৎসর ঘন্টপাত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি তাতে কা(কান পাতা নাই। .. আমি একমাত্র কর্ম বুঝি – পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম।'

বলেছেন – 'আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি - সব ত্যাগ। জগতের কল্যাণ করা আচণ্ডালের কল্যাণ করা – এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।'

আমেরিকায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন – 'ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কি? প্রমাণ তাঁকে সরাসরি দেখতে পাওয়া, সরাসরি প্রত্য'খ' করা। এই দেওয়ালটা যে আছে তার প্রমাণ আমি একে দেখতে পাচ্ছি। ইতিপূর্বে সহস্র সাধক ঈশ্বরদর্শন করেছেন এবং এখনো যারা দর্শন করতে চান, তাঁরাও তাঁকে দর্শন করতে পারবেন। কিন্তু এই দর্শন ইন্দ্রিয়বোধের দর্শন নয়, এ দর্শন অতিন্দ্রিয়, অতিমানস।'

রামকৃষ(কি অবতার ছিলেন? মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকে গু(শ্রীরামকৃষ(প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দকে শেষবারের মতো জানিয়ে গিয়েছিলেন – 'যে রাম, যে কৃষ(, সেই এবার একাধারে রামকৃষ(– কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে তিনি অবতার, বেদান্তের দৃষ্টিতে নয়। বেদান্ত মতে তিনিও ব্রহ্মের অংশ।

তিনি অবতার হোন বা না হোন বিবেকানন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ(এমন এক গু(যার নির্দেশ সর্বদা শিরোধার্য। তাই তিনি স্বামী শিবানন্দকে বলেছেন – 'ভগবান শ্রীকৃষ(জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ(পরমহংস the latest and the most perfect – জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা উদারতার জমাট(.. আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপে(া অনেক বড়ো।'

'এখন সিদ্ধান্ত এই যে – রামকৃষ্ণে(র জুড়ি আর নাই, যে অপূর্ব সিদ্ধি, আর যে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, ... হয় তিনি অবতার – যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধমহাপু(ষ লোকহিতায় মুক্তে(াহগি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত মহাপু(য-প্রাণিদ্ধানাদ্বা।'

প্রমদা মিত্রকে লেখেন – 'তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা

গরমঞ্জুর করেন নাই – আমার ল'খ্খ' অপরাধ 'খ'মা করিয়াছেন – এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনো বাসেন নাই। ... বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান র'খ্খ'া কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি – কেহই উত্তর দেয় নাই – কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপু(ষ বা অবতার বা যাই হউক, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।'

'... আমি রামকৃষে(র গোলাম – তাঁহাকে দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিতু করিয়াছি। ... সেই মহাপু(ষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজী আছি।'

দর্শন-পড়ার জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে যুক্তিনিষ্ঠ বিবেকানন্দের মনে অনেকদিন ধরে নানা প্র্নে ছিল। তখন তিনি বরানগরে। প্রমদা মিত্র মহাশয়কে পত্র লেখেন তাঁর কিছু প্র্নের উত্তরের জন্য। যেমন 'শূদ্র যে বেদ পড়িবে না' তার প্রমাণ সম্বন্ধে। আরো লিখেছেন –

'বেদান্তসূত্রে বেদের কোন প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য পু(ষ-নিঃশ্বসিতম বলিয়া, ইহা কি পাশ্চাত্য ন্যায়ে যাহাকে argument in a circle বলে, সেই দোষে দুষ্ট নহে? ... ... বেদান্ত বলিলেন – বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সাংখ্যাদি অনুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্কজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মত স্থাপনেই পাগল? এত বড়ো সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ, তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না?

... ন্যায় মতে আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ(ঋষিরা আপ্ত এবং সর্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আ(প্ত কেন হইতেছেন? যাঁহারা বলেন - পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

... ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে যদি শুভাশুভ কর্মকে উপে'খ্খ'া করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? ... সত্য বটে, বহু বাক্য এক-আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা ... দুএকটি বাক্যের দ্বারা কেন নিহত

হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম ইত্যাদি বচনের সাফল্য কি?

... যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শোনা উচিৎ? পরের বিধি প্রবল না আগের বিধি? ... তন্ত্র বলেন – কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল(মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব? ... বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন - বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে – আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত(উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন(ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে , ... শুনিয়াছি বিনা সাধনায় শুদ্ধ যুক্ত্যোদি বলে এসকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণ আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক।'

প্রমদা মিত্র মহাশয় বুঝি এই রকম তর্কযুক্তি পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। স্বামীজীর পত্র থেকে তেমন মনে হয়। বিবেকানন্দ সে সব প্র্নের মীমাংসা করেছিলেন কি না জানা নেই। বোধ হয় করে উঠতে পারেন নি। এত অল্প জীবনকালে এত কিছু করণীয় ছিল যে সব করা হয়ে ওঠে নি। তবু তিনি এক মহামানব ছিলেন বলেই সমুদ্রমন্থন করেছিলেন।

সন্দেহ-প্রমাণ, বিশ্বাস-যুক্তি , সৃষ্টি-স্রষ্টা – দোলার দুটি প্রান্ত যেন। কখনো এ-প্রান্তে তো কখনো ও-প্রান্তে। আদিগন্ত জলরাশি(ভাবনার তরঙ্গদোলে ভেসে চলাই জীবন। কোথায় যাচ্ছি, কোন মাটি-পৃথিবীর টানে তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। অথবা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে কখন আমেরিকা আবিষ্কার হয়ে যায়। উনি বেশ বলেছেন – 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুটো সমান্তরাল সরলরেখা যাদের আদিও নেই, অন্তও নেই।'

উনিশ শতকের বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি বিদ্যার সাগর ছিলেন তাই বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি সরিয়ে তাঁর নাম। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন আর বিদ্যাসাগর করেছেন বিধবা বিবাহের জন্য। শি'খ্খ'ার প্রসারে এবং বিশেষ করে স্ত্রী-শি'খ্খ'া প্রসারে জোর দিয়েছেন। যার নামটাই হল ঈশ্বর, তিনি কি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন?

তাঁর কথা – 'আমি ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না।' অথচ স্বামী বিবেকানন্দ সে কথা মানতে রাজী নয়। 'ঈশ্বরের বিষয় যে বোঝেনি, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? ... যে একটা বোঝে সে সব বোঝে।'

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন – 'এই দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি। নিজে যেমন বুঝি তেমনি চলি। কেউ পীড়াপীড়ি করলে বলব, এর বেশী বুঝতে

পারিনি। কিন্তু এ-পথে না গিয়ে ও-পথে গেলেই স্বর্গে যেতে পারব, তাঁর প্রিয় হব, এসব বুঝিও না, কাউকে বোঝানোরও চেষ্টা করি না।' অন্যত্র বলেছেন – 'ধর্ম বড়ো জটিল জিনিস। আমি এ-বিষয়ে বড়ো কিছু বুঝতে পারি না।' পরোপকারই বিদ্যাসাগরের ধর্ম। বলেছেন – 'ধর্মশাস্ত্রাদিতে আত্মা সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা আছে কিন্তু আমি সেসব বিষয়ের মর্মোদঘাটন করতে পারি না।'

কেউ ভাবতেন তিনি নাস্তিক, কারো মতে অজ্ঞেয়বাদী। চিঠির উপরে অবশ্য লিখতেন – 'শ্রীশ্রী হরিঃ সহায়ঃ', 'শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং' ইত্যাদি। তাঁর কাছে পিতাই বিশ্বেশ্বর এবং মাতাই অন্নপূর্ণা। কাল্পনিক দেবদেবতার প্রতি বিশেষ ভক্তি বা শ্রদ্ধা করতেন না। তিনি কারো কাছে মন্ত্রদী'খ্খ'া নেননি। সন্ধ্যা-আহি(ক করতে দেখা যায় নি। শ্রাদ্ধাদি ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রীয় আচার পালন করেন নি।

বোধোদয় পুস্তকে ঈশ্বর রচনায় লেখা হয় – 'ঈশ্বর চেতন কি অচেতন কি উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না(কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান(আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু(তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও র'খ্খ'াকর্তা।'

কবিগু(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারায় লালিত। তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) উপনিষদের ভাবনায় প্রাণিত বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ছিলেন। অন্ধ শাস্ত্রচর্চা নয়, যুক্তি আর অন্তর্যামীর নির্দেশে কর্তব্য নির্ণয় করতে হবে। বিশ্বকবি সাধারণ দেবদেবী পূজার্চনা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। কিন্তু জগতসংসারের একজন স্রষ্টা আছেন, একজন নিয়ন্তা আছেন – এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁকে বলেছেন বিশ্বমানব, বিশ্ব মানবাত্মা, পরমাত্মা। তিনি 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন – 'বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদযশঃ। তাঁর মহদযশই তাঁর নাম, তাঁর কীর্তিতেই তিনি সত্য।'

'আমাদের অন্তরে এমন একজন আছেন যিনি মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। ... সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা

মহাত্মা'।'

'এই জগৎকে জানি আপনবোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব পরমাত্মা ... ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।' এ ভাবে ব্যক্তির আত্মা বিশ্বপরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম। ঋগ্বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলা হয়েছে। তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকী বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে।

সোহহম্ বলতে আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বুঝি - আমিই সেই ব্রহ্মের অংশ। কবিগু(র ভাষায় বলতে হয় – 'আমাদের শাস্ত্রে সোহহম্ বলে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যতো বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয় নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। ... যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। ... মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোহহম্-উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।'

অন্যত্র বলেছেন – 'আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহহম্।'

দেহী মানুষের চেতনায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে বিধৃত আছে ভাবনা – একটি ভাব। সেই ভাবের স্রষ্টা ভাবা হয় মানুষের অরূপ আত্মাকে। তা কবির বাণীতে জরামৃত্যুশোক-'খু'ধাতৃষ(ার অতীত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প। মানুষের সেই ভাবটি একা নয় তা সমাজবিশ্বের সামগ্রিক ভাবের অংশ। তাই ব্যক্তিমানবের আত্মার মধ্যে একান্ত সংযোগ বিশ্বমানবাত্মার।

অগ্নিযুগের বিপ্-বী ঋষি অরবিন্দ (১৮৭০-১৯৫০) কারাবরণের পরে রাজনীতির পথ ত্যাগ করে ঈশ্বর-নিবেদিত হয়ে পড়েন। তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? ঈশ্বরদর্শন করেছেন একথা তিনি বলেন নি। কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশ অন্তরে বারবার অনুভব করেছেন – এ কথা বলেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়। পরে যোগসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। যোগসাধনা করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তিনি উত্তরপাড়ায় এক সভায় তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন।

আলিপুর জেলে যাওয়ার আগে তিনি অন্তরে নির্দেশ পান নির্জনে ঈশ্বরসাধনার

জন্য। জেলের মধ্যে বসে তিনি ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করেন। তাঁর মনে হয় – এ সবই বাসুদেব, ছায়া দান করছে যে গাছটা, সে শ্রীকৃষ(। যে পাহারা দিচ্ছে, সে নারায়ণ। জেলের শয্যাকে তাঁর মনে হতে থাকে শ্রীকৃষে(র আশ্রয়। আদালতের জজকে মনে হল বাসুদেব। বেঞ্চিতে যারা বসে তারা নারায়ণ। ফরিয়াদী প(ের উকিল যেন শ্রীকৃষ(। অরবিন্দের প(সওয়াল করতে এসেছেন শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরস্বামী বলে উঠল – মামলার ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ দেওয়ার আছে তা তিনিই বলবেন যিনি তাঁর অন্তরে বসে আছেন।

যোগসাধনায় তাঁর কাছে দুবার আদেশ আসে। আদেশ হয় – জেল থেকে মুক্তি পাবার পরে দেশের মুক্তিসংগ্রামের পথ থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। আর দ্বিতীয় আদেশ হল – হিন্দু ধর্মই সমগ্র মানবসমাজের সনাতন ধর্ম, এবং তাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা সেই সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতঃপর বিপ-বী অরবিন্দ ভারতে ও সমগ্র জগতে সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

ঋষি অরবিন্দ ঈশ্বর দর্শন করেন নি। তিনি ঈশ্বরের ডাক শুনেছিলেন। অবশ্য সেও এক রকমের ঈশ্বরদর্শন।

আধুনিক যুগে আরো অনেক খ্যাতিমান ও মহান মানুষ জন্মেছেন। এঁদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খৃঃ) আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সত্যপূজারী মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খৃঃ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫? খৃঃ) বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। এঁই সকল মহামানবেরা প্রধানতঃ সমাজসেবা করেছেন, ধর্মসাধনা নয়। সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন।

ঈশ্বরবিশ্বাসী আরো অনেক সাধক আছেন – সির্দির সাঁইবাবা, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রাম ঠাকুর, অনুকূল ঠাকুর। এঁদের অনেক শিষ্য ততোধিক ভক্ত। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেউ সিদ্ধপু(ষ। কেউ নয়।

এত সবের মধ্যে আবার দেখা মেলে কিছু সন্ন্যাসীর – আচার্য রজনীশ, সত্য সাঁইবাবা, মহেশ যোগী, চন্দ্রস্বামী। এঁদের দেশে বিদেশে অনেক ভক্ত অনেক অনুরাগী। কর্মকাণ্ড বৃহৎ এবং ভয়ানক চোখধাঁধানো। এই সব গু(বৃন্দ কি ঈশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন? কোথায় যেন ব্যবসার সুগন্ধ আছে। যাদু আছে, ভেলকি আছে। আরো আছে অজস্র জ্যোতিষী, রত্নবিচারক, কোষ্ঠীবিচারক, মাদুলী-বিতরক। মানুষের দুঃখদুর্দশা আশাআকাঙখা নিয়ে ব্যবসা করতে 'বিজ্ঞানসম্মত' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে

অর্থাগমে বসে পড়েছে। সহজে লাভের লোভে ভক্তের ও প্রার্থীর অভাব হচ্ছে না।

এরা কারা?

এরা ঈশ্বরবিশ্বাসী? ঈশ্বরসাধনা করেন?

সাধারণ মানুষজন সোজাসাপটা রাস্তায় চলতে চান। বৌদ্ধিক ঈশ্বর নয়, চান কার্যকরী দেবতা যিনি মানুষের সব রকমের প্রার্থনা পূরণ করতে স'খ্খ'ম। চান লৌকিক ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতিনিধি। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর জন্য চাই সহজলভ্য সংযোগকারী পুরোহিত এবং গুর.। যুক্তিটুক্তি বেশ কঠিন কাজ, ওসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় কোথা? সামর্থ্যও যথেষ্ট নয়। মেড-ইজি হল গুর.র নির্দেশ। গুর. কে হবেন? যে গুর.র অলৌকিক 'খ'মতা আছে, খবর পেলে ভক্তরা দলে দলে ছোটেন তাঁর কাছে। সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো সোজা। চতুর ব্যবসায়ী গুর. ভেলকি দেখান আখের গুছোতে।

এই দেখুন না বিংশ শতকের শেষ দশকেও গণেশ ঠাকুর চামচ চামচ দুধ খাচ্ছেন হঠাৎ দুনিয়ায় চাউর হয়ে গেল। আর তা পরী'খ্খ' করে নির'খ'র-সাধারণ থেকে উচ্চশি'খি'ত কত মানুষ কত অক্লেশে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন অলৌকিকতা পৃথিবীতে এখনো আছে বলে! সত্যযুগ এসে গেল বলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন!

আরেকবার একজন মৃত ব্রহ্মচারী ফের বেঁচে উঠবেন, নির্বিকল্প সমাধি থেকে জেগে উঠবেন – তাঁর দর্শনের আশায় কাতারে কাতারে মানুষজন ছুটেছিল। পুলিস পাঠিয়ে অবশেষে দেহসংস্কার করতে হয়।

খঞ্জ-বিকলাঙ্গ মন্ত্রবলে স্বাভাবিক হবে আমেরিকা থেকে আসা এক খৃস্টানের চমৎকার প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ ভিড় জমিয়েছিল ময়দানে।

এ সব হয়! হতে পারে?

যুক্তির পরিশ্রমসাধ্য রাস্তায় না হেঁটে চটজলদি লাভের লোভে দৌড়ে মরে সাধারণ মানুষ। বিশ্বাসের ঝুলি কাঁধে তুলে নেওয়া খুব সহজ। মুক্তিলাভ করতে হবে – এই অস্বচ্ছ ও কাল্পনিক ভাবনায় ভাবিত বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর ও দেবতার শরণাপন্ন হন সংসারে প্রার্থিত সাফল্য লাভ করতে নয়তো কৃতকর্ম করে পাপবোধ থেকে রেহাই পেতে । এসব কাজে তাদের উদ্ধার করার জন্য আছেন নানা ধর্মগু(, আছে জ্যোতিষ-তাগা-তাবিজ। সেখানে দেবতা নেই। ঈশ্বর নেই।

পাশ্চাত্যজগতেও ঈশ্বর-ভাবিত অনেক মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আমরা দুজন চিন্তাবিদের কথা তুলে ধরব। তাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাসের স্বপ'খে' জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। ইতালির টমাস একুইনাস (আঃ ১২২৫-১২৭৪খৃঃ) মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বরের

অস্তিত্বের পাঁচটি যুক্তিপ্রমাণ হাজির করেছিলেন।

প্রথম যুক্তি হল – জগতের সকল বস্তু নিয়ত গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। কিছুই স্থির নয় – সবই গতিসম্পন্ন। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। চঞ্চল বাতাস আর প্রবহমান সমুদ্রস্রোত। সূর্য-চন্দ্র-ন'খ'ত্র ঘুরছে। এই সব গতি কোথা থেকে উদ্ভূত হল? নিশ্চয়ই তা কোন উৎস থেকে উৎসারিত। মানে কেউ তাদের গতিশীল করে রেখেছে। কেননা সকল গতির পিছনে কারণ আছে। অসংখ্যপ্রকার গতি ও পরিবর্তনের জন্য অসংখ্যপ্রকার কারণ থাকার কথা। কারণেরও কারণ থাকে। অসংখ্য কারণের পিছনে না ছুটে আদি একটা কারণের খোঁজ করাই যুক্তিযুক্ত। সেই আদি কারণই হল ঈশ্বর।

দ্বিতীয় যুক্তি কার্যকারণ সম্বন্ধ থেকে জাত। কার্য হয় কারণের জন্য। কারণেরও কারণ থাকে। তো এইভাবে কারণের কারণ খুঁজতে খুঁজতে শু(র কারণে পৌঁছে যাওয়া যায়। শু(র কারণটা অবশ্যই কারণহীন কেননা তা হল ঈশ্বর। ফার্স্ট কজ।

তৃতীয় যুক্তি অনুসারে জগতে রয়েছে অনেক সাপে'খ্খ' ও শর্তাধীন বস্তু। সে সবকিছু প্রয়োজনীয় নয়। যেমন মানুষ। আরেক ধরণের অস্তিত্ব আছে যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর হলেন তেমন এক প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব। মানুষ কেন এই জগতে বিদ্যমান তার ব্যাখ্যা হয়। কী করে মানুষ জন্মাল, তার উত্তর পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই জগতে এমন কিছু বিদ্যমান যা মানুষকে অস্তিত্বময় করে তুলেছে। ফলে মানুষের অস্তিত্বের অন্য কারণ বর্তমান। অন্যভাবে মানুষ নানা কারণের ফলশ্রুতি। তাই বলা উচিৎ, আদি যে কারণ তিনি ঈশ্বর, যার অস্তিত্ব আবশ্যিক, তিনি ঈশ্বর।

জগতে আসীন আশ্চর্য কিছু নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। যেমন সত্য, ন্যায় কিংবা মহত্ত্ব। এই নীতিরাজি কোথা থেকে জন্মাল? এ সবের উৎস কোথায়? নিশ্চয়ই এমন কিছু থেকে জন্মেছে যা এই সদগুণাবলীর আধার। সেই আধার আর কিছু নয় স্বয়ং ঈশ্বর। এই হল চতুর্থ যুক্তি।

পঞ্চম এবং শেষ যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে সবথেকে জোরালো যুক্তি জাল। পরিকল্পনার যুক্তি। ডিজাইন বা টেলিওলজিকাল আর্গুমেন্ট। জগতের চারদিক ভালো করে দেখলে সহজেই চোখে পড়বে যে এর গঠনে রয়েছে নিশ্চিত এক বুদ্ধির ছাপ। সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অন্তর্লীন এক উদ্দেশ্য। সবকিছুর মধ্যে প্রস্ফুটিত এক পরিকল্পনা। পরিকল্পনা আছে বলেই এই সমস্ত বস্তু বিদ্যমান। জড় বস্তু কি নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে? পারে না। সুতরাং একজন মহান পরিকল্পনাকারী আছেন। তিনিই সবকিছু গড়েছেন। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই পরিকল্পনাকারী হলেন ঈশ্বর।

উইলিয়াম প্যালি (১৭৪৩-১৮০৫ খৃঃ) ১৮০২ সালে প্রকাশ করেছেন একটি সাড়া জাগানা গ্রন্থ। স্যর নিউটনের গতিবিদ্যা পড়ে প্রভাবিত হয়ে তিনি জগতকে এক বিশাল যন্ত্র হিসেবে ভাবতে বসেন। সুনিয়ন্ত্রিত এক পরিকল্পনা দিয়ে এই বিশ্বসংসার গঠিত। সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীতে বাঁধা।

ধ(ন, আমরা এক বিজন প্রান্তর পার হতে গিয়ে পথে কুড়িয়ে পেলাম একটি সুদৃশ্য ঘড়ি। কেউ কোথাও নেই সেখানে, না ঘড়ির কারখানা, না কোন ঘড়িনির্মাতা। একটা পাথরখণ্ড পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। কিন্তু ঘড়ি মানে তো তা নয়। সে যে অনেক কথা। ঘড়ি মানে বিশেষভাবে তৈরী কিছু যন্ত্রাংশ। সেই যন্ত্রাংশের নিপুণ সমাবেশ। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। তো যন্ত্রংশগুলো নিজেরা নিজেদের নিশ্চয়ই তৈরী করতে পারবে না। অথবা নিজেদের তৈরী করে কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের জড়ো করতে পারবে না। তাহলে ঘড়িটা হাতে পেয়ে আমরা কি ভাবতে বসব? আমরা কি ভাবব না যে ঘড়ি যখন আছে তখন দেখা না পেলেও একজন ঘড়িনির্মাতাও আছে? নির্জন প্রান্তরে তার দেখা পেলাম না বটে তবে তার বানানো ঘড়িটা পেয়েছি এবং সেটাই ঘোষণা করছে নির্মাতার অস্তিত্ব।

জগতটা ঠিক তেমনি এক যন্ত্র – বিশাল এবং আরো জটিল। দেখুন মানুষের হৃদয়যন্ত্রটা। অলিন্দ-নিলয়-কপাটিকা দিয়ে কি আশ্চর্য গঠন তার। নিপুণভাবে কাজ করে চলেছে। দেখুন মানুষের শ্রবণযন্ত্র কি সূক্ষ্ম কারিগরি বিদ্যা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। দুটি নয়নের কথা ভাবুন। ভাবুন সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর কথা। সর্বত্র বিরাজ করছে ঘড়ির থেকেও অনেক উন্নত এক বিশাল পরিকল্পনার ছাপ। প্রকৃতির এই মহতী যন্ত্রসম ব্যবস্থায় আমরা যে ঘড়িনির্মাতার আভাষ পাই, তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ঈশ্বর।

এই অকাট্য যুক্তিজাল ভেদ করা নিরীশ্বরবাদীদের প'খে'ও সহজ নয়। দুশো বছর পরেও মানুষ এই যুক্তিতেই কুপোকাত।

বিপ'খে' অষ্টাদশ শতকের স্কট দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬)-এর যুক্তিটা একটু শুনি।

তিনি বলছেন – জগতের পরিকল্পনা থেকে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের প্রত্য'খ্খ' সংযোগসাধন অসম্ভব। পরিকল্পনা থেকে পরিকল্পনা-রচয়িতার অনুমান করা এক জিনিস আর সেই পরিকল্পনার স্রষ্টা এমন দাবী করা অন্য জিনিস। এই অনুমান ও দাবীর মধ্যে জড়ানো যুক্তিটা বেশ দুর্বল। দ্বিতীয়ত, অসীম প্রত্যাবৃত্তি (রিগ্রেসন) দোষ থেকেও তা মুক্ত নয়। কেননা প্র্ন তো উঠতেই পারে যে পরিকল্পনাকারীকে কে

পরিকল্পনা করেন? তৃতীয়ত যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে এই যে পরিকল্পনা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটা মুস্কিল আছে। তা হল এই যে তুলনা করা হল এমন একটা বস্তুর সঙ্গে যা সত্যিই মানুষের পরিকল্পনা-মাফিক তৈরী। ঘড়ি না হয়ে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কি হয়? যেমন গাছ কিংবা পতঙ্গ কিংবা পৃথিবী? তাহলে যুক্তিটা একই রকমে টেকে কি?

অধুনাকালের বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক রিচার্ড ডকিনস ঘড়ির কথা মাথায় রেখেই পরবর্তীকালে লিখেছিলেন 'দি ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার'। প্রকৃতি জগতের নির্মাণশিল্পে যদি কাউকে নির্মাতা বলতে হয় তো ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনকেই বলতে হবে। এর কোন মন নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই, নেই ভবিষ্যতের জন্য কোন আগাম পরিকল্পনা। এ এক অন্ধ, অচেতন ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যা প্রকৃতিজগতে প্রাণের এত বৈচিত্র্যময় রূপ গড়েছে। শ্যাওলা থেকে শিমূল পর্যন্ত, শামুক থেকে ডলফিন, কিংবা ফড়িং থেকে ফিঙ্গে। জীবজগতে ঘড়িনির্মাতা ঈশ্বর নন। জড়জগতে?

ঈশ্বর আছেন মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসে।

বিজ্ঞানে কোন ঈশ্বর নেই।

ঈশ্বরচর্চা অবশ্য আছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। বিজ্ঞান বস্তুর চর্চা করে — বাস্তব বস্তুর চর্চা। আর সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টিত হয়।

ধর্মবিশ্বাসে জগৎসৃষ্টির যে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল, তা আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। সেসব ছিল তৎকালীন বস্তুজ্ঞানের পুঁজির ওপর ভিত্তি করে কিছু কল্পনা। আজ বিজ্ঞান তা নাকচ করে দিয়েছে। জগতসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। যে বাস্তবতা বা বস্তুগত জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানের কাজকারবার তাতে ঈশ্বর থাকতে পারেন না।

একদিকে বস্তুগত বাস্তবতা এবং বিজ্ঞান যা অস্বীকার করা যায় না যা প্রতিদিনের জীবনযাপনে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে তা প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অন্য দিকে অনেক দিনের লালিত সংস্কার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি যা প্রাক-বিজ্ঞানের যুগে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছিল, তাও একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। যুক্তি আর বিশ্বাসের এ এক টানাপোড়েন।

আমরা একদা নানা দেবতা ও অনেক ঈশ্বর নিয়ে বেশ সুখেই ছিলাম। একজন ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক আছেন, একজন মহান দ্রষ্টা আছেন, একজন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন, তিনি ইহলোকে না হলেও অবশ্যই পরলোকে মানুষের অন্যায়ের শাস্তি বিধান করবেন কিংবা ন্যায়ের পুরস্কার দেবেন — এ ভাবনা কত সুখের ছিল। সবটা সুখের ছিল কি? না বোধ হয়। ধর্ম নিয়েও অনেক দুর্নীতি হয়েছে, অপব্যাখ্যা

হয়েছে, লোক-ঠকানো হয়েছে। এখনো হচ্ছে। সেসবের ফলে ধর্মের নৈতিক শাসন শিথিল হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বাসীরা বলেন — তিনি আছেন। এবং সে কথা বিশ্বাস করতে বলেন।

বিশ্বাসীরা আরো বলেন — দেবতা আছেন, আত্মা আছে, পরলোক আছে, স্বর্গ-নরক আছে। এবং সেসব কথা বিশ্বাস করতে বলেন।

অথচ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন লোক নেই, যেখানে তা থাকা সম্ভব। যা আছে, তা ন'খ্খ'ত্র, ন'খ'ত্রমালা, কিছু ন'খ্খ'ত্রের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহ, মহাজাগতিক মেঘপুঞ্জ, আর মহাশূন্যতায় ভরা দেশকাল (স্পেস-টাইম)।

অনেকে বলেন — ঈশ্বর নেই এ কথা কি বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পেরেছে?

তারা ভালো করে না ভেবে এই প্র্ন তোলেন। বিজ্ঞানচর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের উপর কি এই প্রমাণের দায়িত্ব বর্তায়? বিশ্বাস কোন কিছু প্রমাণ করে না।

আবার প্রমাণাদি ব্যাপারে ধর্মের কিছু করার নেই। তারা অনুমান করে বা অনুভব করে। তারা বলে এসেছিল — ঈশ্বর আছেন, তো আছেন। বিজ্ঞান যদি তা প্রমাণ না করতে পারে তবে ব্যর্থতার দায় কার? দায়টা কি বিজ্ঞানের হয়?

বিচার করলে দেখা যায় — ঈশ্বর আছেন কিনা তা বিজ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ই নয়।

যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে ঈশ্বর আছেন এবং তিনি বস্তু নয়, অবস্তু অর্থাৎ ভাবনা বা ঐশী শক্তি, তাহলে তা বিজ্ঞানের চর্চার বিষয় হতে পারে না।

ঐশী শক্তির বস্তুধর্ম নেই। তা বিজ্ঞানের দ্বারা পরী'খ'ণীয় নয়।

দ্বিতীয়ত ঈশ্বর নেই এ বিষয়টা কোন প্রমাণযোগ্য উপস্থাপনা হতে পারে না। যার অস্তিত্ব আছে কেবলমাত্র তার অস্তিত্বই প্রমাণযোগ্য। নেই ব্যাপারটা প্রত্য'খ্খ' প্রমাণের বিষয় নয়। তা পরো'খ্খ'ভাবে সিদ্ধ হয়।

টেবিলে চায়ের কাপ থাকলে তবে চোখে দেখে বা হাতে স্পর্শ করে প্রমাণ করা যায় যে কাপটা আছে। কাপটা টেবিলে নেই — প্রত্য'খ্খ'ভাবে প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণ করা হয় পরো'খ্খ'ভাবে। যদি কাপটা থাকত, তাহলে চোখে পড়ত বা হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন তার অর্থ কাপটা নেই।

এইরকম পরো'খ্খ' প্রমাণে নিশ্চয়তা কম। জটিলতর ে'খ'ত্রে তা খুব বিতর্কিত ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ঐশী শক্তি(বা ঈশ্বর আছে কি নেই এমন প্র্নে পরো'খ্খ' মীমাংসার যুক্তি কার্যকর নয়।

তৃতীয়ত এ যাবৎ ধর্ম যেভাবে বস্তুজগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেছে যেমন ওলড টেসটামেন্টে বা উপনিষদে-পুরাণে, তা বর্তমানে বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে আদপেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আমরা বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত ঘটনা ও ব্যাখ্যাই মেনে নেব। ধর্মবিশ্বাসীরাও তা মেনে চলেন। এই সকল প্রশ্নে ধর্মের ব্যাখ্যা এখন অচল। ফলে বস্তুজগতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানই একমাত্র চর্চা যার দ্বারা সত্য নিরূপণ হয়। বরংচ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি এখন প্রাচীন ধারণা নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে কিংবা বর্জন করে। বস্তুজগতের প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাখ্যা চক্ষুষ্মান আর কেউ মানে না।

পঞ্চমত, আমরা কি দেখছি না যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান? উল্টেটা নয়।

খৃস্টপূর্ব ৩০০০ সালে প্রাচীন সভ্যতার পর্বে মানুষ যতটা জ্ঞানার্জন করেছে, ক্রমশ তা বেড়েছে। খৃস্টপূর্ব ৬০০ সালে তা আরো বিকশিত হয়েছে। আরো উন্নত হয়েছে দ্বাদশ শতকে কিংবা ষোড়শ শতকে। উন্নতি ক্রমান্বয়ে ঘটেই চলেছে। অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকে বেশি। ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকে আরো বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যা ছিল পরে তার চেয়ে বেশি। তাহলে পরবর্তী কালের জ্ঞানগম্যি আগেকার জ্ঞানগম্যি ছাপিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। অনেকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন যে আগেকার সময়ের মুনিঋষিরা এখনকার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনেক বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ কথা ঠিক নয়।

ষষ্ঠত, বিজ্ঞানচর্চা থেকে সম্ভূত জ্ঞান, ধর্মীয় এবং দার্শনিক ভাবনা থেকে জাত জ্ঞানের থেকে অধিকতর বাস্তব ও সত্য। কেননা বিজ্ঞানের জ্ঞান হল যুক্তিপ্রমাণ-নির্ভর, পর্যবেক্ষণ-তত্ত্ব-পরীক্ষা-নির্ভর। ফলে তা অবশ্যই অধিকতর সত্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্য। ধর্মভাবনা বিশ্বাসনির্ভর। তা মধুর ও প্রীতিপ্রদ হতে পারে কিন্তু যুক্তি-প্রমাণের বিচারে বিজ্ঞানের সমক্ষ ও বাস্তব নয়। অবশ্য ধর্ম নিয়ে আলোচনায়ও অনেক ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক যুক্তিতর্ক তুলে ধরা হয়েছে। তা মানবসমাজকে উন্নত করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে বিজ্ঞান প্রমাণ করেনি যে ঈশ্বর নেই। আর অন্যদিকে এ কথাও প্রমাণিত হয়নি যে তিনি আছেন।

বিজ্ঞান যেখানে যেখানে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরতে এখনো ব্যর্থ, সেখানে ধর্ম ও দর্শনের চিন্তা আজো মানুষকে আচ্ছন্ন করে। সমাজ-সংস্কৃতির বাতাবরণে আমাদের লালনপালন এবং আমাদের বেড়ে ওঠা। ফলে তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে আমাদের চিন্তার প্রবণতায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষাবিহীন ও নিতান্ত ভাবনাজাত হলেও ধর্ম-দর্শনের সেই সকল চিন্তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা কঠিন। কেননা ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্তব্য-অকর্তব্য, নীতিবোধ, আচার-আচরণ প্রণালী। তা বর্জন করে জীবনধারণ করা যায় না। সেই সঙ্গে স্রষ্টার আসনে ঈশ্বরকে বসালে সৃষ্টির ব্যাখ্যা

দাঁড় করানো বেশ সহজ হয়।

ঐতিহ্য প্রাচীনবিশ্বাস ত্যাগ করা শক্ত। অঢেল তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের সঙ্গে পরিচিত না হলে, তা আরো শক্ত।

অনেকে প্রশ্ন রাখেন — বিজ্ঞান পারেনি ঈশ্বর আছে কি নেই তা প্রমাণ করতে। সুতরাং ধর্ম যা বলছে তাই ঠিক ধরে নেওয়া যাক। এ কথা বললে কি নির্দ্বিধায় ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়?

এক পক্ষের ব্যর্থতা অন্যপক্ষের যাথার্থ্য প্রমাণ করে না। বিজ্ঞান কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তা শুধু বিজ্ঞানের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। ধর্ম সে সবের সঠিক উত্তর দিয়েছে এমন প্রমাণ হয় না। একজনের ব্যর্থতা অন্যকে সঠিক করে না।

বিজ্ঞান কি সৃষ্টির সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছে? না, তা সে পারে নি। তা পেরেছে বলে দাবীও করে নি। সব প্রশ্নের মীমাংসা দূর অস্ত, সব প্রশ্নই করে উঠতে পারে নি। প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন জন্মে। সব প্রশ্ন এক সঙ্গে জন্মাবে কি করে? এ রকম দাবী করার অর্থ হল প্রশ্নেরই সঠিক মূল্যায়ন না করতে পারা।

বিজ্ঞানের জানার পদ্ধতি ধর্মবিশ্বাসের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে একজন সর্বশক্তিমানকে স্রষ্টার আসনে এনে বসিয়ে সৃষ্টির ঘটনা তাঁর অজ্ঞাত ইচ্ছা ও অসীম ‘ক্ষ’মতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। সে ব্যাখ্যা সৃষ্টির গভীরে যায় না। বস্তুর গঠন, উপাদান, নানা বস্তুর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এত সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আপাত পর্যবেক্ষণটুকুই সম্বল।

বিজ্ঞানের কাজকারবার এত সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। খালি চোখে পর্যবেক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। যন্ত্রের চোখে আরো সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে। দেখতে হয়েছে। একটা তত্ত্ব খাড়া করে তা পরীক্ষা করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ব্যাপক ও গভীর করা হয়েছে। তত্ত্ব ক্রমশ ব্যাপকতর ও গভীরতর হয়েছে। আরো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এভাবে এক জানা থেকে অন্য জানায় উত্তরণ হয়েছে। জানা থেকে অজানার খবর মিলেছে আরো বেশি। সত্য আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক লহমায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানের শৈলী নয়। তা দিতে পারা যায় না।

আবার আজ যা অজানা, তা যে কাল অজানা থাকবে এমনও তো নয়। আমরা সমাধান করেছি, প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। তার সমাধান করেছি এবং নতুন করে প্রশ্ন করতে শিখেছি। এভাবে কালে কালে অজানা জানা হয়েছে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। জ্ঞানের অগ্রগতির পদ্ধতিটা এমনি এবং এটাই সঠিক পথ। বিজ্ঞানের আজকের কিছু প্রশ্নের ব্যর্থতা শেষ কথা নয়। আদপে তা

কোন কথাই নয়।

অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ঈশ্বরবিশ্বাসী। যেমন জোহানেস কেপলার, আইজাক নিউটন। নিউটন বলতেন – 'সূর্য, গ্রহরাজি কিংবা ধূমকেতুদের এই যে সুন্দর রাজ্য তা পরিচালিত হতে পারে কেবল প্রচণ্ড মেধাবী এবং 'খ'মতাবান এক সত্ত্বার হুকুমে।'

নিয়তিবাদের প্রবক্তা ফরাসী বিজ্ঞানী-দার্শনিক লাপ-াস (১৭৪৯-১৮২৭ খৃঃ) মহাজাগতিক বলবিদ্যার উপর বই লিখে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে উপহার দেন। নেপোলিয়ন বই পড়ে বললেন – 'বিশ্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন, কই বিশ্বের স্রষ্টার কথা তো লেখেন নি।' লাপ-াস উত্তরে বলেন – 'না সে রকম কোন প্রকল্পের প্রয়োজন বোধ করিনি।' ঈশ্বর কি প্রকল্প?

কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা শ্রোয়েডিংগার (১৮৮৭-১৯৬১ খৃঃ) বিজ্ঞানের কুখ্যাত নাস্তিকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন – 'ব্যক্তিভিত্তিক সব কিছুকে পরিত্যাগ করে যে জগৎ চিত্রের প্রতিরূপ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে সেখানে কোন ব্যক্তিরূপ ঈশ্বরের স্থান থাকতে পারে না। আমরা জানি ঈশ্বর অনুভূতির অভিজ্ঞতা প্রত্য'খ্য' ইন্দ্রিয়ানুভূতির মত বা মানুষের ব্যক্তিত্বের মতো একটা বাস্তব ঘটনা। দেশকালের চিত্রে তার স্থান নেই। আমি দেশকালের কোথাও ঈশ্বর পাই না – এই কথাই একজন সৎ প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলবেন।'

হাল আমলে অনেক বিশ্বাসী বিজ্ঞানীও আছেন, যেমন, পল ডেভিস, জন ব্যারো, জন পোলকিংহর্ন, ফ্রিজফ কাপরা।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন এক বৌদ্ধিক ঈশ্বরে। তিনি বলেছেন – 'আমি বিশ্বাস করি স্পিনোজার দেবতায়। সেই ঈশ্বর যিনি প্রতিভাত হয়েছেন বিশ্বসংসারের শৃঙ্খলায়। যে ভগবান স্থির করেন মানুষের ভাগ্য, তাতে আমার আস্থা নেই।'

স্টিফেন হকিং আইনস্টাইনের মতো। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত নিয়মই ঈশ্বর। তিনি বলেছেন জগতের নিয়ম যদি জানা যায় তবে 'মানুষের যুক্তির চূড়ান্ত জয় হবে কেননা তখন আমরা ঈ(রের মন বুঝতে পারব।' অতি সম্প্রতি (২০১০ সালে) তিনি পূর্ব ধারণা থেকে সরে এসে বলেছেন – না ঈশ্বরের ....

কার্ল সাগান ঠিক বিশ্বাসী নন। আবার ঘোর অবিশ্বাসী তাও বলা যায় না।

যদি বলা হয় ভগবান স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন, অমনি স্টিফেন ওয়েনবার্গ বলে বসবেন – 'কেউ দেখেছে কি সেটা?'

ভারতের বিজ্ঞানী সি ভি রমন (১৮৮৮-১৯৭০) মনে করতেন – 'এ জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি(জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর ভৌতবিজ্ঞানের আবিষ্কার তা প্রমাণ করছে।'

আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫) মনে করতেন – 'ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি(মানুষের সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি।'

জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স-এর কাছে ঘড়ির যন্ত্রকুশলতা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। জীবজগতে বিবর্তনের ঈশ্বর হল প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্ধ।

এই ব্যাপারটা অনেককে ভাবায়। কেননা যারা বিজ্ঞানচর্চা করেন তারাই যদি ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে স্বস্তি বোধ করেন তবে সাধারণ মানুষের আর দোষ কি! শুধু ধর্মবিশ্বাস হলেও না হয় কথা ছিল। অনেকেই নানা কুসংস্কার, তামা-তাবিজ-মাদুলি-আংটি, জ্যোতিষ, এমন কি ভূতেও ভরসা রাখেন। বিজ্ঞানী হওয়া আর বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া বুঝি এককথা নয়।

কয়েক বছর আগে এক সাংবাদিক বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে খোঁজখবর করেছিলেন। মাত্র একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন –'প্রকৃত বিজ্ঞানী অবশ্যই বিজ্ঞানমনস্ক হবেন, অন্যথায় তিনি বিজ্ঞানের কারিগর।' বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

বলবেন তো বিজ্ঞানীরাও মানুষ। বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার আগে সমকালীন সমাজ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তাদের মগজের গড়ন ও ভাবনাচিন্তার ভিত্তি গঠিত হয়েছে। সমাজের প্রবলতর ধারণা তাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। জন্ম থেকে লালিত যে সংস্কৃতির মধ্যে তাঁদের বিকাশ হয়, তা তাঁদের মস্তিষ্কেও গাঁথা হয়ে যায়। প্রবণতা তৈরী হয় সে রকম করেই। বহুল প্রচলিত বিশ্বাস থেকে মুক্তি পাওয়া আজকের প্রচুর তথ্য-সমৃদ্ধ দিনে যদি বা সম্ভব, অতীতে তা আরো অসম্ভব ছিল। সুতরাং তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে পড়ার মধ্যে বিস্ময় নেই। আবার সকলে সমস্ত ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠবেন, তাও এক শতাব্দীর মধ্যে এতটা বোধ হয় আশা করা অনুচিত।

তাছাড়া, বিজ্ঞানীর ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া থেকে এটা তো প্রমাণ হয় না যে বিজ্ঞানের যুক্তিজালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে তথ্য ও আবিষ্কার লভ্য হয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের প্রচুর। আগের যুগের বিজ্ঞানীর কাছে এত তথ্য ছিল না। তাঁরা নি(পায় ছিলেন বলা যায়।

অনেকের কাছে হয়তো বিজ্ঞান নেহাৎ এক জীবিকা, জীবনধারণের মাধ্যম। সত্যসন্ধানের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আত্মস্থ না করে বিজ্ঞানচর্চা তাঁদের। জীবনের অন্যান্য ে'খ'ত্রে তাঁরা সেই চিন্তাধারার প্রয়োগ এড়িয়ে চলেন। একটা স্ববিরোধী দ্বৈত চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করেন।

কিংবা সমাজসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব গভীরতর হওয়ার জন্য এক এক সময় যুক্তিকে বলি দেন। যেমন – গ্রহণের সময়ে অনেকে চা পান করতে চান না, আঙুল

থেকে আঙটি খুলতে চান না, বা রাহু-কেতুকে ভয় না করে পারেন না। বলেন – জানি তো কিন্তু কি দরকার।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে জীবনযাপনের সামগ্রিক ভাবনার সামঞ্জস্য বিধান করতে অপারগ হন। মানুষের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া ও মগজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত, যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রক্রি(য়া কিভাবে কাজ করে তা না জানা পর্যন্ত, এই রকম স্ববিরোধী হওয়া-না-হওয়ার সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

একজন অতিসাধারণ মানুষ ভাবনাচিন্তায় দ্বিচারিতার সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছিল। সে বলেছিল – 'ভাই, ইয়ে অলগ অউর উয় অলগ। দেবতার পূজার সময়ে আমি হৃদয়বান সৎ মানুষ, অন্তর দিয়ে দেবতাকে ডাকি(আর জীবিকার পোষাক পরলে তখন অন্য মানুষ হই - তখন ঘুষ নিই, ঘুষ দিই, মিথ্যাচরণ করি, মারদাঙ্গা করি।' স্ববিরোধ থাকলে আছে। এ নিয়ে তার কোন ভাবান্তর নেই, কোন অস্বস্তি নেই। মনের মধ্যে দুটো সৎ-অসৎ কামরা নিয়ে বেঁচে থাকা তার। এক কামরায় প্রবেশ করলে অন্য কামরার কথা ভাবে না। কখনো যুক্তি(তে কখনো বিশ্বাসে অনায়াস বিচরণ তার। এই দ্বিচারিতা এখন যথেষ্ট সুলভ। আদ্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ থাকা সে ভারী কঠিন কাজ।

তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন – এই ভাবনাটা সত্যিই স্বস্তিকর। সাধারণ মানুষের কাছে এই ভাবনার মূল্য অপরিসীম। মিথ্যা হলেও। দুঃসময়ে মানুষের ওই এক অগাধ জোরের জায়গা। কেবলমাত্র ওই বিশ্বাস প্রচুর বলভরসা ও সাহস যোগাতে স'খ্খ'ম। এমনটা আর কেউ পারে না, এমনটা আর কিছু দিয়ে হয় না। ভগবানই তাদের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। দরিদ্র নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য একমাত্র ভরসা। এমন কি যাদের অর্থবল লোকবল অস্ত্রবল আছে, তাদেরও দুঃসময়ে দুর্বিপাকে বিপর্যয়ে ঈশ্বরই হলেন শেষ আশ্রয়। তাঁরই দ্বারস্থ হয় সকলে। এই যে ঈশ্বর আছেন ধারণা মাত্র সম্বল করে সাহসটুকু ফিরে পাওয়া এই বা কি কম কথা! ঈশ্বর থাক বা না থাক তাঁর মহিমময় ভাবনার জয়গান গাইতে হয়।

সত্যসন্ধানীর ('খে'ত্রে এই যুক্তিটা অচল। সেখানে সত্যের প্রতি তীব্র আগ্রহ একমাত্র নিয়ন্তা, বিজ্ঞানীর মানসিক শক্তির একমাত্র পটভূমি। প্রকৃত নির্মোহ জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা শুধু ভরসা। যুক্তিপ্রমাণ, তথ্য ও তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানের বদলে অপ্রমাণিত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানসিক দুর্বলতা। তা সত্যানুসন্ধানের পরিপন্থী।

সৃষ্টি থেকেই হয়ে চলেছে স্রষ্টার ব্যাখ্যার চেষ্টা। বিজ্ঞান সৃষ্টির নিপুণ ও নিখুঁত ব্যাখা নিয়ে মশগুল থাকে। কার্যকারণ সম্পর্ক ধরে প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তুর অনেক গভীরে চলে যায়। সৃষ্টির যে প্রকাশ প্রতীয়মান ধর্ম তার গভীর ব্যাখ্যায় যেতে পারে

না। সৃষ্টির অনন্ত প্রকাশে আর অপার রহস্যে আপ্-ুত ও অভিভূত হয়ে মহান স্রষ্টার কাছে পৌঁছোনোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সর্বশক্তি(মান এক স্রষ্টার কল্পনা করে নেয়। একবার সেই ঈশ্বরের অনুমান করে নিলে তারপর সৃষ্টির অগভীর ব্যাখ্যা করা সহজ। অনেকটা উত্তর মিলিয়ে যুক্তি আবিষ্কার করার মতো। সে আর এমন কি কঠিন কাজ! যুক্তি(র অভাব বোধ করলে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের লীলা, এই চরম অস্ত্র প্রয়োগ করে ব্যাখ্যার উর্ধ্বে ওঠা যায়।

কিন্তু যখন সৃষ্টির গভীর ভাবনা থেকেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপন করতে দেখা যায় জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের তখন সমস্যা গম্ভীর। বিজ্ঞানে সৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় নি। ওদিকে বিস্মিত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের যুক্তিজালে সবটুকু ধরা পড়ছে না বলে সৃষ্টির ভাবনা ছেড়ে দিতেও রাজি নন। তাঁরা তখন বিজ্ঞানের বাইরে পা ফেলে একটা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। তথাকথিত ঈশ্বর না হোক, বৌদ্ধিক স্তরে এক স্রষ্টার কথা ভাবেন। সেই স্রষ্টা ঈশ্বর অবশ্যই শরীরী নন – রক্ত(মাংস দিয়ে গড়া ব্যক্তি নন, বা কাঠ-পাথরে-ধাতু দিয়ে গড়া সাকার কিছু নন। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তি নন দেহী নন। তিনি নিরাকার অশরীরী এক ঐশী শক্তি । বস্তুধর্মবিহীন। শক্তি অবশ্য বিজ্ঞানের চর্চার বিষয় কেননা তা বস্তুগুণসম্পন্ন। আমরা প্রকৃতিতে যে কয়েক রকমের শক্তির কথা জানি, ঈশ্বর তেমন কোন শক্তি নন। তিনি এক আশ্চর্য ঐশী শক্তি । তবে কি, তা বলা যায় না। তাছাড়া ঈশ্বরকে আরো হতে হবে শ্রেষ্ঠ চেতনার বিকাশে বিকশিত। চেতনা সম্পন্ন এক শক্তি । আমাদের জানা শক্তির কোন চেতনা নেই। বস্তু ও শক্তির যৌথ প্রয়োগে জাত হতে পেরেছে শুধু উন্নত এক চেতনাসম্পন্ন জীব মানুষ।

জগতসৃষ্টির বুঝি তিনটি সম্ভাব্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়। জগৎ অনন্ত অথবা জগৎ স্রষ্টানির্মিত – এ রকম দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। তৃতীয় সম্ভাবনা হল জগৎ নিজেই নিজের স্রষ্টা অর্থাৎ জগতকে স্বয়ম্ভু ভেবে নেওয়া।

জগৎ অনন্ত বললে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না কেননা সৃষ্টিই হয় না। প'খ্খ'ান্তরে সৃষ্টির ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং মানুষের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। সীমাবদ্ধতা আছে এ তো সত্য এবং বর্তমানের বাস্তবতায় সৃষ্টি প্রায় অনন্তই প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্য ('খে'ত্রই যখন বিবেচ্য তখন অনন্ত বলে জগতের ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়া বাতিল করতে হবে। সৃষ্টির সাহসী ব্যাখ্যা হতে পারে কেবলমাত্র অন্য দুটি উপায় দ্বারা। হয় তা স্রষ্টার দ্বারা নির্মিত অথবা নিজের দ্বারা।

ঈশ্বরবিশ্বাসীরা জগতকে স্রষ্টানির্মিত বলেছেন। তবে সৃষ্টিকার্যের পর্যায় ও রূপান্তর সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা সত্যি নয়। বরংচ বলা ভালো ঠিক মতো

ভাবনাই করতে পারেননি। অবশ্য পারার কথাও নয়। এদিকে বিজ্ঞানও আদি ও প্রথম সৃষ্টি ব্যাখ্যা করার মতো উপযুক্ত কোন তত্ত্ব খাঁড়া করতে পারে নি এখনো। কিন্তু একবার কোনভাবে সৃষ্টির পর জগত কিভাবে সরল বস্তুময় কেন্দ্রীনকণা-পরমাণু-বিকীরণের রূপ থেকে বিবর্তিত হয়ে ত্র(মে গ্রহ-ন'খ'ত্র-অজৈববস্তু-জৈববস্তু-প্রাণকোষ ইত্যাদি হল এবং বর্তমান রূপে পৌঁছতে পারল তার সম্ভাব্য একটা তথ্যনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরতে পারছে। কিছু অস্পষ্টতা থাকলেও সামগ্রিক একটা ছবির আদল এসে যাচ্ছে।

যত'খ্খ'ণ আদিম সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা না মেলে তত'খ্খ'ণ ঈশ্বর আছেন কি নেই সে প্রশ্নের উত্তর শেষ বিচারে অজানাই থেকে যাবে। বিজ্ঞান ঈশ্বরকে ছুঁতে পারবে না সে বরংচ পারে শূন্য থেকে বস্তুনির্মাণের সম্ভাবনা আছে কি না তা যাচাই করতে। যদি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়, তবেই প্রকৃতি হবে স্বয়ম্ভু। কোন স্রষ্টার প্রয়োজন হবে না। নচেৎ ঈশ্বর আছেন। ততদিন আমরা ঈশ্বরের কথা ভাবব, বিশ্বাস করব বা অবিশ্বাস করব। নিশ্চিতরূপে জানতে পারব না।

সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব হলে তবেই তা নিশ্চিতরূপে জানা যাবে। আর কোন ব্যাখ্যা থেকে নয়। হয় জানা যাবে যে প্রকৃতি স্বয়ম্ভু — নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে, নয়তো একজন ঈশ্বর আছেন যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যত'খ্খ'ণ তা না হচ্ছে তত(ণ বিজ্ঞান নি(ত্তর থাকবে। তত'খ্খ'ণ প্রশ্নটা উত্তরের উপযুক্ত নয়।

তত'খ্খ'ণ আমরা কি অন্তহীন জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে চুপ করে থাকব? থাকতে পারব?

এতদিন ধরে আমরা নানা দেশে নানা কালে অনেক দেবতা অনেক ঈশ্বরের বন্দনা করে এসেছি। এত'খ্খ'ণ সেই সব দেবতা ও ঈশ্বরের অল্পবিস্তর খোঁজখবর করেছি। যেখানে যেভাবে জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, তা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সৃষ্টির ব্যাখ্যা যেভাবে নানা ধর্মে ও নানা বিশ্বাসে বলা হয়েছিল সেভাবে আজ আর মানা যায় না, কেউ মানে না। অবশ্য অন্ধকূপে সমাহিত তথ্যহীন যুক্তিহীন মানুষ হলে অন্য কথা।

জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা একমাত্র গ্রহণযোগ্য। আর দেশকাল ভেদে ঈশ্বর-দেবতার এই নানাত্ব প্রশ্নময়।

অনেক দেবতা আজ মহাকালের গর্ভে বিলীন। এই বিলীন হওয়া ঐশ্বরিক গুণের পর(হানিকর।

তাহলে কে শ্রেষ্ঠ? কোন দেবতা পূজ্য? কোন ঈশ্বর আমাদের আরাধ্য?

বুঝতে উদ্যোগী হলে আমরা বিভ্রান্ত হই। কে ঈশ্বর দর্শন করেছেন?

ঈশ্বরদর্শন করা আর ঈশ্বরের উপলব্ধি করা আলাদা ব্যাপার। গভীর ধ্যানে মহামানবদের অন্তরে অনেক ভাবনাচিন্তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। উঠতে পারে। তেমন করে যদি ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় তবে কি তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়?

একটা কথা না মেনে বুঝি উপায় নেই যে ঈশ্বর থাকলেও তিনি ইহুদীর জন্য জিহোভা, খৃস্টানের জন্য গড, ইসলামের জন্য আল্লাহ, কিংবা হিন্দুর ব্রহ্মা-বিষু(-মহেশ্বর অথবা রাম বা কৃষ(হয়ে নেই। নামহীন একজন স্রষ্টা হয়েই আছেন। এবং তা সমগ্র মানবসমাজের জন্য। গোটা বিশ্বের জন্য।

আর ওই কোটি কোটি দেবদেবী-আত্মা-মহাত্মা এক এক জাতির জন্য এক এক গোষ্ঠী? এসব কল্পনা।

স্বর্গ-নরক-মরলোক নেই। ব্রহ্মলোক বা দেবলোক নেই। নেই এই সৌরজগতে, অথবা দুগ্ধসরণী তারামণ্ডলে বা এই ব্রহ্মাণ্ডে।

মৃত্যুর পরপারেও কিছু নেই।

দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ঈশ্বরের দেখা পেলে নাকি নির্ঘাৎ বলতেন — ছিলেনই যদি তাহলে আপনার অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিলেন না কেন?

এ প্রশ্ন আমাদের অনেকের — মহান ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি নিজেকে কেন এত রহস্যময় রাখলেন!

বিশ্বাসীরা বলেন এ তাঁর লীলা। লীলা মানে কি খেয়াল? কারণহীন কার্য বা বোধাতীত কার্য?

তিনি তো কত সহজে তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারতেন। তাঁর সৃষ্টি তাহলে আরো সুন্দর হত। জগত সুন্দর হত। মানুষ সুন্দর হত। সমাজ সুন্দর হত। এত যুদ্ধ হত না। মানুষ মানুষকে এত হত্যা করত না। ধনী-দরিদ্র, শোষণ-নিপীড়ন হত না। দাঙ্গা হত না। চুরি-ছিনতাই-বোমা হত না। অথচ তিনি তা করলেন না। কেন? করতে পারলেন না বলে নাকি করবেন না বলে?

তিনি যদি এই সৃষ্টি করে থাকেন তবে তা এমনভাবে করেছেন যে তাঁর সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে গিয়েছে। একবার সৃষ্টি করে তিনি কি উদাসীন হয়ে গিয়েছেন?

তাঁর মতো সর্বশক্তিমানের সৃজন কেন যে এত সুন্দর-অসুন্দরের মিশ্রণ হবে! ন্যায়-অন্যায়ের জগত হবে কে জানে!

এই সকল দেবদেবতার থাকা-না-থাকা এখন মানুষের শি'খ্খা'দী'খ্খা (চি সংস্কৃতি ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে বসে আছে।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টা হিসেবে একজন ঈশ্বর আসলে প্রমাণিত নন। আবার তিনি অপ্রমাণিতও হন নি।

বিশ্বাস-ধর্ম এবং যুক্তি-বিজ্ঞানের ভূমিতলে দাঁড়িয়ে সুধী পাঠক পাঠিকা অতঃপর স্বয়ং বিবেচনা করবেন যে তিনি স্রষ্টাকে গ্রহণ করবেন নাকি তাঁকে বাতিল করবেন।

যুক্তি-বিজ্ঞানে তিনি নেই বা তাঁর খোঁজ নিরর্থক।

বিশ্বাস-ধর্মে তিনি আছেন কেননা হিসেব মেলাতে চাইলে এ ছাড়া আর কোন হিসেব মেলে না।

তাই যার যেমন বিবেচনা তার তেমন উত্তর লাভ।

মহামানব বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় যখন শায়িত হন, তখন উৎকণ্ঠিত শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন — আত্মদীপো বিহরথ অত্তশরণা অনএ(এ(সরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনএ(এ(সরণা। তোমরা নিজেরাই নিজের দীপ(নিজেরাই নিজেদের শরণ হয়ে বিহার কর(অন্য কারো শরণ নিও না।

তাঁর প্রথম কথাটা বেশ। আত্মদীপ হও। আত্মদীপো বিহরথ।

তথ্য ও জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তার আলোয় নিজের বিচারবোধ দ্বারা চালিত হওয়া ভালো।

এর বেশি কিছু বলা আর শোভন নয় ।

।। পুস্তকপঞ্জী ।।

- উপনিষদ - সম্পাদনা স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা।
- উপনিষদ (২ খণ্ড) - হরফ প্রকাশন।
- ঋক বেদসংহিতা (২ খণ্ড) - হরফ প্রকাশন।
- এ সর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্‌স্ - সৈয়দ আমির আলী।
- ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ(ও স্বামী বিবেকানন্দ - অমলেশ ত্রিপাঠী।
- ক(ণাসাগর বিদ্যাসাগর - ইন্দ্র মিত্র।
- কোরআন শরীফ - হরফ প্রকাশন।
- জীব বিবর্তনের ইতিহাস - প্রমোদ রঞ্জন রায় ও আনন্দ ঘোষহাজরা।
- ধর্ম - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ধম্মপদ - হরফ প্রকাশন।
- পশ্চিমবঙ্গ রামমোহন সংখ্যা।
- পৃথিবীর ইতিহাস - দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রামকৃষ(মৈত্র।
- প্রথম আলো - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
- প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা - কুশ দাশগুপ্ত।
- প্রাণ অপ্রাণের সীমান্তে - দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।
- বিবেকানন্দ চরিত - সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
- বিবেকানন্দ রচনাবলী - রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ।
- বিষ্ণু(পুরাণ - সুবোধ কুমার চত্র(বর্তী।
- বি(েকোষ (২৩ খণ্ড) - সা(রতা প্রকাশন।
- বি(েপ্রকৃতি ও মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা - পার্থ ঘোষ।
- ভারতীয় দর্শন - দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
- মানুষের ধর্ম - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মহাভারত - কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত।
- মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত - নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
- মহাবি(ে মহাকাশে - গৌরীপ্রসাদ ঘোষ।
- যীশুচরিত - তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
- রামমোহন রচনাবলী - হরফ প্রকাশন।
- শ্রীমদ্ভাগবত - হরফ প্রকাশন।
- শ্রীম কথিত পরমপু(ষ রামকৃষ(।
- শ্রীশ্রীরামকৃষ(লীলা প্রসঙ্গে - স্বামী সারদানন্দ।

■ হিন্দুদের দেবদেবী - হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।
■ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত - অরূপরতন ভট্টাচার্যের 'বিজ্ঞানীরা কতটা বিজ্ঞানমনস্ক' (২১.৬.৯২), আশিষ ঘোষের 'যুক্তি কোথায় গেল', সত্যব্রত আচার্যের 'ভগবানের মর্তে আগমন', অলকেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'ধর্মের জাদুকর', বিশ্বজিত রায়ের 'টেকসাসের যীশু অথবা নরকের অবতার', অতনু বন্দোপাধ্যায়ের 'জেটযুগের যোগী', তাপস সিংহের 'এক-এ চন্দ্র' (২৮.৫.৯৩), আশীষ লাহিড়ীর 'বিজ্ঞানীর ঈশ্বর' (৩.৯.৯৫) ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীর 'তর্ক বহুদূর' (২১.১০.৯৫)।
■ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হৃষিকেশ সেনের 'বিজ্ঞান ও ভগবান' (২২.৪.৯৫), অমিয় কুমার মজুমদারের 'বিশ্বাস ও যুক্তি' (২০.৪.৯৬) এবং দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানীর ধর্ম' (১৩.৭.৯৬)।

■ A History of Western Philosophy - Bertrand Russell.
■ A Lion Handbook of The World Religion.
■ Asimov's New Guide to Science - I. Asimov.
■ Cosmos - Carl Sagan.
■ Encyclopedia Britannica
■ History of Religion - Sergei Tokarey
■ Human Evolution - Alan Bilsborough.
■ In Search of the Big Bang - John Gribbin.
■ Solar System Evolution - Stuart Ross Taylor.
■ The Bible - by The Gideons International Press.
■ The First Three Minutes - Stephen Weinberg.
■ The Life of Sri Aurobindo - A. B. Purani.
■ The Missing Link - John Reader.
■ The Primeval Universe - J.V. Narliker.
■ The Structure of the Universe - J.V. Narliker.
■ The World of Nature - (unpublished) by B.K.Saha.
■ The World's Religions - Ninian Smart.